উত্তরঙ্গ

সমরেশ বসু

বুক ওয়ার্ল্ড
লিমিটেড
কলিকাতা-৪

বুক ওয়ার্ল্ড লিঃ

প্রকাশক :—
সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার
৫, হেষ্টিংস্ ষ্ট্রিট, কলিকাতা—১

মুদ্রাকর :
প্রতিভা আর্ট প্রেস
১১৫ এ, আমহার্স্ট ষ্ট্রিট, কলিকাতা—

প্রচ্ছদশিল্পী :
অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

ব্লক নির্মাণ :
কমার্শিয়াল রিপ্রোডাকসন লিঃ

বাঁধাই :
স্বদেশী বাইণ্ডিং এণ্ড কোং

সাড়ে তিন টাকা

সেকালের এবং একালের বন্ধু

শ্রীনবকুমার ঘোষ

ও

কবি সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

করকমলে

া কথা না বললে সুরু করা যায় না, সে কথা কয়টি নিই।

য উপাখ্যান আমি রচনা করেছি, তা উপাখ্যান হলেও বৃত্তও বটে। অবশ্য উপাখ্যানের উল্লিখিত প্রত্যেকটি ও পরিবার লেখকেরই নিজের সৃষ্টি। তার মধ্যে যদি কেউ দের অভিজ্ঞতার কোন মিল খুঁজে পান, সেটা আকস্মিক লই ধরে নেবেন। জগদ্দল নগরের কথার যেমন শেষ নেই, নি শেষ নেই তার বিস্তারের জটিলতা, এ উপন্যাসও তেমনি সম্পূর্ণ হলেও স্বয়ংসমাপ্ত নয়। এ শুধু তার ভূমিকা মাত্র।

পকথায় শুনেছি, বিপদে পড়লে তেমাথার কাছে যাবে। ই এ উপাখ্যান লিখতে অনেকের দ্বারস্থ হয়েছি কিন্তু ভুলতে রনে সেই দুই হাঁটুতে মাথা ঠেকানো প্রায় নব্বুই বছরের নবকুমার ঘোষকে। চোদ্দ বছর বয়সে তাঁর জীবন সুরু ছিল গাড়ুলিয়ার চটকলে। বিপদে পড়ে নয়, গুরু ত্ববোধেও বৃদ্ধের প্রাণের টানে বার বার তাঁর কাছে গিয়েছি। তিনি তাঁর স্মৃতির পাণ্ডুলিপি থেকে প্রতিদিন মাকে শুনিয়েছেন এই চটকলের কাহিনী।

আর যিনি বাংলা সাহিত্যের সে-যুগ ও এ-যুগের সেতু হয়ে জও আমাদের উৎসাহের অফুরন্ত উৎস হয়ে আছেন, সেই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহায়তার কথা উল্লেখ করতে রে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।

প্রচ্ছদশিল্পী অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়কে এই প্রসঙ্গে অশেষ ধন্যবাদ নিয়ে রাখি।

লিখেছি তাড়াতাড়ি, ছাপা হয়েছে তার চেয়েও অনেক ড়াতাড়ি, সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও যদি বইটি পাঠকের সমাদর পায় হলেই আমি নিজকে সার্থক মনে ক'রব।

—লেখক

আঠারো শো ষা[illegible]র এক রাত্রি।............

পুঞ্জীভূত অন্ধকার[illegible]য়ে ঘুমন্ত রাতের নিস্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে একটা নাকাড়া[illegible] উঠল···ড্যাম্, ড্যাম্, ড্যাম্, ড্যাম্······। তারপর আর [illegible]রও একটা, আরও আরও। ছোট ফরাসী অধিকৃত যেন শত শত নাকাড়ার শব্দে কেঁপে উঠল, দুলে উঠল [illegible]লয়ের মহাক্ষণে প্রকম্পিত ফরাসীভূমি। দিক হতে দিগন্তে[illegible] আকাশে, বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল সেই শব্দ।··· ব[illegible]রের বুক থেকে উঠে আসা চৈত্র রাতের উদাস হাওয়া মুহু[illegible] নাকাড়ার প্রলয় শব্দে যেন দিগ্‌বিদিকে এলোমেলো হয়ে[illegible]

ফরাসডাঙ্গা [illegible] হয়ে দীনেমারডাঙ্গার গড়ে ঢেউ খেয়ে সে শব্দ আছড়ে প[illegible]ণের ইংরেজ এলাকায়। ছড়াল উত্তরে[illegible] জোয়ার-ভরা গ[illegible]া ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছিটকে পড়ল সে শব্দ ওপারে পূবের মা[illegible]

এ যেন ন[illegible]ার্য রাজপুত্রের রাজ্যাভিষেকের নরবলি উৎসবের পবিত্র [illegible]দ্দাম পটহ-পিটন। কাছ থেকে দূরে, আরও দূরে বহু দূরে স[illegible]কাড়ার শব্দে খান্ খান্ হয়ে গেল রাতের নিস্তব্ধতা, দমব[illegible] ছটফট করে উঠল। খট্ খট্ শব্দ উঠল ঘোড়ার খুরের।[illegible] উত্তেজিত সাবধানী উচ্চ গলা হেঁকে উঠল...

পিস্তলের শব্দ গর্জ্জন করে উঠল কিন্তু তার মৃত্যু-যন্ত্রণার কাতর-ধ্বনি শোনা গেল না। গঙ্গার ঢালু তটে জাগা ফরাসী প্রহরীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জ্বলে উঠল সন্ধানী শ্বাপদের মত। মুঘলের লুট করা সেই মান্ধাতার আমলের বন্দুক বা ব্রাউন্‌বেস নয়, যুক্ত টোটা দাঁতে কেটে লহমায় নতুন রাইফেলের মধ্যে ভরে, তাক করে তা বাগিয়ে ধরল। বুঝি বা একবার মনে পড়ল, বহুদূরে ফেলে আসা জন্মভূমি ফ্রান্সের কথা, দ্রাক্ষাকুঞ্জে ছাওয়া, আঙুরে ভরা গাঁয়ের কথা, প্রেয়সীর রাঙ্গা ঠোঁট, বিদায়ক্ষণে বিচ্ছেদ নীলচোখে ঘন মেঘের অশ্রু, সুডৌল বুকের হৃদয়স্পন্দন। আজ সিপাহীর ক্রোধবহ্নির আগুন নির্বাপিত হলেও হিন্দুস্থানের দিকে দিকে বিভীষিকার ঢেউ। নিশ্চিন্ত ফরাসীভূমিতে দাঁড়িয়েও মনে হয় এ অন্ধকারে হাওয়ায় হাওয়ায় মৃত্যুষড়যন্ত্রের ফিসফিসানি। দাঁতে দাঁত কষা টেপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে নাকাড়ার বজ্রশব্দে অস্ফুট ধ্বনি হয়ে গেল, ক্রাইষ্ট!

নাকাড়ার বুকে বাদকের ঘাম ঝরানো বা অনর্গল আঘাতে আঘাতে তার টান করা টনটনে চামড়ার দ্যাম্‌ দ্যাম শব্দ তখন বাজছে ঢ্যাপ্‌ ঢ্যাপ্‌ ঢ্যাপ্‌ ঢ্যাপ্‌......।

ফরাসডাঙ্গায় শত্রু প্রবেশের এ হল সঙ্কেতধ্বনি। নতুন অচেনা মানুষ, খুনী কি ডাকাত, বিদ্রোহী কি গুপ্তঘাতক, যে-ই হোক্‌ এত রাত্রে নগরের পথে বেরুবার বা প্রবেশ করার অধিকার নেই কারুর। কিন্তু সে আইন লঙ্ঘন করেছে কেউ, রুদ্ধ নগরে প্রবেশ করেছে কেউ, শান্তিভঙ্গ করেছে। তাই থানা থেকে থানায় আর এক থানায় নাকাড়া বেজে চলল। জাগিয়ে সচকিত করে তুলল নগরকে।

কিন্তু ফরাসী প্রহরী দেখতে পেল না তার দশ হাত দূরে অন্ধকারে

এক দীর্ঘ বলিষ্ঠ মূর্তি গঙ্গার জোয়ার তরঙ্গে নিঃশব্দে নিজেকে ভাসিয়ে দিল। ঢেউয়ের বুকে দুলে দুলে, জোয়ারের স্রোতে এক খণ্ড আবর্জনার স্তূপের মত মূর্তির মাথা ভেসে চলল। দীনেমারগড়ের ধারের ঘূর্ণী কাটিয়ে, বলিষ্ঠ হাতে জোয়ারের স্রোত কেটে মূর্তি ওপারের পূবের জমির ঝাপ্‌সা রেখা দেখে ডুব দিল। বিশাল জলচর জন্তুর মত জোয়ারের তীব্র ধাক্কাকে মাথার গোঁত্তা দিয়ে তলে তলে তীরবেগে সে এগুল পূবের ডাঙ্গার দিকে।

বৃথাই দীনেমার গড়ের বাতি জ্বলল। ফরাসী অশ্বারোহী প্রহরীর ঘোড়ার খুরের ধ্বনি গঙ্গার খাড়া ধারে এসে আচম্বিতে থেমে গিয়ে বিলীন হয়ে গেল জলের ছল্‌ছল্‌ শব্দে। শান্ত হয়ে এল বন্দুকধারী প্রহরীর অস্থিরতা। কেবল নাকাড়ার ক্লান্ত চম্‌কানো চামড়ায় বাজতে লাগল ঢ্যাপ্‌ ঢ্যাপ্‌ ঢ্যাপ্‌ ঢ্যাপ্‌......।

ওপারের মানুষদের কাছে শুধু পূবের ঐ শব্দ নাম কিনল ঢ্যাবা ঢ্যাবের ঘাট বলে।

সে তখনও নিঃসাড়ে স্রোত কেটে কেটে চলেছে। তার খেয়াল নেই বন্দুকের রেঞ্জের সীমা সে অতিক্রম করতে পেরেছে কি না। মাথা ডোবাবার ক্ষমতা আর নেই। অতিদ্রুত নিঃশ্বাস যেন ক্রমাগত নিজের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, অবশ হয়ে আসছে হাত পা, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। জোয়ারের দুরন্ত টানকে, উদ্ধত ঢেউকে দাঁতে দাঁত চেপে ক্লান্ত হাতে সে যেন চাব্‌কে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, ভেঙ্গে ফেলতে চাইছে খান্‌ খান্‌ করে। কারা যেন জলের তলে তার দুই পা ধরে পাতালে টেনে নিতে চাইছে, কার সহস্র থাবা তাকে নিষ্ঠুর ঝাপটায় ঝাপটায় অবশ করে দিতে চাইছে। কোথায় ডাঙ্গা!

ডাঙ্গা ডাঙ্গা ডাঙ্গা! এত নগর এত গ্রাম এত পথ পাহাড় ডিঙ্গিয়ে শেষে চিরআরাধ্যা সুরেশ্বরীর বুকে চিরদিনের জন্য তলিয়ে যেতে হবে! কানের সমস্ত শিরা উপশিরা ব্যথায় টাটিয়ে উঠল, নাকের ভেতর ঝলকে জল ঢুকে চোখ জ্বালা করে ঝিম্ ধরে গেল মাথা। খালি পেটে জল ঢুকে উদ্গার উঠতে লাগল আপনাআপনি। শিথিল হয়ে এল হাঁটু; স্রোতের বুকে গোঁজড়ানো মুখে ভেঙ্গে পড়ল ঢেউ। জমি জমি, মায়ের বুকের মত এক ফোঁটা মাটি। হায়, মাটি কি নেই এ পৃথিবীতে! মৃত্যু হোক্, তবু হাতের মুঠোয় ধরা দিক এক খামচা মাটি।

সে চেঁচিয়ে উঠতে চাইল, জয় হোক হিন্দ্ সিপাহীরা! বরবাদ হোক কোম্পানী! শক্ত করে বাঁধা কোমরের কাপড়ের দিকে হাত নামিয়ে নিল সে। মহান্ বিদ্রোহী নেতার দেওয়া গুপ্ত চিহ্নের ছিন্ন টুকরা কোম্পানীর বিভীষিকা তার নেতার দেওয়া হিন্দুস্থানে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকামী বীর সেনাপতি তাঁতিয়া টোপি! বিদায় দাও তোমার বীর সিপাহীকে, তোমার বিশ্বস্তবন্ধুকে, তোমার পদাশ্রিত বেরিলীর সহযোদ্ধাকে।

কটিদেশে বাঁধা বিদ্রোহী সেনাপতির গুপ্তচিহ্ন খুঁজতে লাগল সে কোমর হাতড়ে। অন্য হাতে জোয়ার তরঙ্গকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করল। সব অবশ হয়ে আসছে। হাত পা ঠোঁট। বুঁজে আসছে চোখের পাতা, ভারী হয়ে আসছে শরীর, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ঢুকছে জল, ছিঁড়ে যেতে চাইছে কানের পর্দা। একটু মাটি মাটি মাটি!

হঠাৎ গঙ্গা যেন স্থির হয়ে গেল, স্তব্ধ নিঃসাড়। কে যেন তার দুরন্তপনাকে বলিষ্ঠ দুই হাতে বেষ্টন করে ধরেছে। হাওয়া হয়ে এল শান্ত, একটানা মৃদুমন্দ। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ল যেন সর্বচরাচর। বাতি

নিভে গেল দীনেমার গড়ের। ফিরে গেছে অশ্বারোহী। নতুন প্রহরী এসে পুরনো প্রহরী চলে গেছে। স্তিমিত হয়ে আসছে নাকাড়ার শব্দ।

জলে ভাসা মূর্তি উত্তর থেকে আবার দক্ষিণে ভাসল। ভাঁটা পড়ছে। প্রায় জ্ঞানশূন্য, অবশ শরীর তার। সে শুধু তলিয়ে চলেছে। কিন্তু কী যেন ঠেকল হাতে! ঠাণ্ডা, কর্দ্দমাক্ত। বুঝি মাটি! হ্যাঁ মাটি! ....আবার যেন জ্ঞান ফিরে এল। মাটি নয়, মায়ের বুক। দু' হাতে সাপটে ধরল সে মাটি। আঁকড়ে খামচে ধরল, ঘা-খাওয়া জন্তুর মত জোয়ারে ভেজা নরম মাটিতে মাথা ঠুকে ঠুকে গর্ত করে উঠে আসতে চাইল। তারপর এক সময় নিঃসাড় হতচেতন হয়ে হাত দিয়ে আর মুখ দিয়ে মাটিতে পড়ে রইল সে।

শুকতারা যেন বড় বেশী দপ্ দপ্ করে উঠল নিভে যাওয়ার আগে। পূবের আকাশে দিনের আভাস দেখে আগামী দিনের খবর ছড়াল আলো প্রত্যাশী।

* * *

ফরাসডাঙ্গা থেকে বুড়ো পাটনি ছেলে চূড়ামণিকে নিয়ে দো-মাল্লাই মাঝারি নৌকাখানি ভাসিয়ে দিল।

পূর্বদিগন্ত লাল হয়ে উঠেছে। চৈত্র প্রভাতের উজ্জ্বল নীল আকাশ। হাওয়া মত্ত নয় তবু যেন মাতাল করে। দু চোখ আরামে বুঁজে আসতে চায়। পাখীর আনাগোনা চলেছে এপারে ওপারে। রাত না পোহাতেই দিন যেন উদাস হয়ে উঠল কোকিলের গানে। গান নয়, সুর করে কান্নার এ শব্দ স্ফটিকের মত আকাশ, সমুদ্রোত্থিত হাওয়ার কাছে যেন জিজ্ঞেস করছে, এ ঝরা পাতার মর্মর ধ্বনিতে হাহাকার ভরা চৈত্রের দীর্ঘ দিন কেমন করে কাটবে।

বুড়ো পাটনি নৌকার মুখ উত্তর দিকে ঘুরিয়ে বৈঠা ধরল। জলের টান এখন দক্ষিণে সাগরের দিকে। ওপারে যেতে হলে উত্তরে খানিক উজান না গেলে ঠিক জায়গায় ভেড়ানো যাবে না। সমুদ্র কাছে বলে জোয়ারের সময় জলের যে স্বচ্ছতা চোখে পড়ে এখন আর তা নেই। জোয়ার যা নিয়ে এসেছিল, শুধু তাই নয়, যা নিয়ে আসেনি তাও নিয়ে চলেছে। নদীর দুধারে গ্রাম ও জনপদের ফেলাছড়া আবর্জনা কাঠকুটা ঝরাপাতা কত কি চোখে পড়ে। এ সবই মিশে যাবে সাগরের নীলাম্বুধি অন্ধকারে। শুধু কি আবর্জনা কাঠকুটাই। শেষ রাতের সুখস্বপ্নের কথা জলের কাছে বলে গেলে স্বপ্ন সার্থক হয়। কত নরনারী গঙ্গাকে তার স্বপ্নের সাক্ষী রেখেছে, এ জলই তার হিসাব জানে। গঙ্গা গিয়ে সাগরের কানে সে কথা ঢেলে দিয়েছে, সাগর তার অতল রহস্যে সে কথা নিয়ে কি কারবার করেছে বুঝি গঙ্গার কাছেও তা রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। হয় তো স্বপ্ন সার্থক হয়েছে কিংবা হয়নি। সে সুখ বা দুঃখ দু'তরফেরই অশ্রু নিয়ে গঙ্গা বহু জনপদ উজান গিয়ে আবার সাগরের কোলে দিয়ে এসেছে।······

জল এখন অনেকখানি নেমে এসেছে, পলিছড়ানো পাড় জেগে উঠেছে অনেকটা। কাঁথার বুকে টানা সুতোর ছোট ছোট ফোঁড়ের মত ছোট ছোট ঢেউ যেন কচি পাখীর কাঁচা পাখসাটের মত দক্ষিণ মুখে উড়াল দিয়েছে। কুচো কাঁকড়া দু পাড় জুড়ে কিলবিল করছে, ভেজা মাটিতে বুক দিয়ে চলে চলে শামুক খাচ্ছে মাটি। তাই পাড়ে বকের ভিড়। গাঙচিলের উপর নিচে এত ওঠানামা।

চূড়ামণি কোঁচড় থেকে এক গাল মুড়ি মুখে পুরে পাড়ের ফরাসী প্রহরীর নীল কোর্তা বারেক দেখল। তারপর চোখ বড় বড় করে

বাপকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভোর রাতে মস্ত এক ডাকাতের দল ধরা পড়েছে, জান বাবা ?'

বুড়ো পাটনি তখন বাঁ হাতে হাল ধরে ডান হাতে গাঁজার কলকে বেড দেওয়ার ন্যাকড়াটা ভাল করে ধুয়ে নিচ্ছে। ছেলের কথায় একবার 'হুঁ' দিয়ে এক মুখ থুথু ফেলে বৈঠাটা শক্ত হাতে বারকয়েক চাড় দিল। গলুইয়ের দক্ষিণ মুখ আবার পূব পানে ফিরল।

চিবানো মুড়ির দলাটা গিলে চূড়ামণি আবার বলল, 'হুঁ লয় গো, বদ্যিদের আর্দালি খুড়ো নিজের চোখে দেখে এয়েছে।'

সে কথার জবাব না দিয়ে বুড়ো পাটনি বলল, 'তোর ও মুড়োর পাটাতনের নিচে থেকে আগুনের মালসাটা দে দিকিনি এ দিকে।' বলে আবার বারকয়েক চাড় দিয়ে বৈঠাটা বগলে চেপে ধরে হাতের চেটোয় গাঁজা ডলতে লাগল সে।

চূড়ামণি সে আদেশ পালন করল কিন্তু গতকালের ডাকাতদলের কথাটা বুড়ো বাপ এরকম হুঁ হাঁ দিয়ে লোমহর্ষণকারী গল্পটাকে নষ্ট করে দেবে এটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। আগুনের মালসা তুলতে তুলতেই সে আবার বলল, 'তুমি খবর পেয়ে গেছ আগেই খুড়োর কাছ থেকে ?' মালসাটা বাপের সামনে রেখে বলল, 'জল-ডাকাত দুটো হার্মানি ফিরিঙ্গি সায়েবও বুঝি ধরা পড়েছে ?' বাপকে নিরুত্তর দেখে কিশোর চূড়ামণির মুখ রাগে আর অভিমানে থমথমিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই কী যেন মনে পড়তেই মুড়ি মুখে পুরতে গিয়ে থেমে বলল, 'সায়েব দুটোর কপালেও ডাকাতকালীর সিঁদুর মাখা ছেল ?'

'আরে ধ্যাৎ তোর সায়েব ডাকাত,' বুড়ো পাটনি এবার খিঁচিয়ে উঠে কটমট করে ছেলের দিকে তাকাল। সকাল বেলায় পয়লা

ছিলিম না টেনে সে কথা বলতে পারে না, একথা জেনে শুনেও ছেলেটা এরকম ঠেটামো করছে কেন? কোমরের গেঁজে থেকে গাঁজার কল্‌কেটা বের করে, গাঁজা সাজিয়ে বিরক্ত মুখে বলল, 'নে হালটা ধর।'

কিন্তু চূড়ামণি ধমক খেয়ে গোঁজ হয়ে রইল। অভিমানক্ষুব্ধ মুখে ফুটে উঠল কান্নার অভিব্যক্তি। বুড়ো বয়সের ছেলেপুলে হলে এরকম ছিচকাঁদুনেই হয়। বুড়ো পাটনি অবশ্য তাতে গলল না। প্রথম ছিলিমটা না হলে স্বয়ং মহাদেব এসেও বোধ হয় তার রাতের জড়তা কাটাতে পারবে না। বলল, 'দেখবি, দেবো পিঠে দু' ঘা?'

এর পরও যখন দু'ঘার কথা বলছে তখন চূড়ামণি আর অবাধ্যতা করতে সাহস করল না। তার ছোট ছোট নরম কচি হাতে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে হাল বাগিয়ে ধরল সে। ভবিষ্যতে খেয়াঘাটের ভার চূড়ামণিকেই তো নিতে হবে। তাই এখন থেকেই শক্ত করে না নিলে চলবে কেন? আজ বাদে কালই তো বুড়ো চোখ বুঁজতে পারে। বয়স তো আর কম হল না!···কল্‌কেয় আগুন তুলে কপালে ঠেকিয়ে বারকয়েক মহাদেবের নাম নিল সে। অদূরে দক্ষিণে শ্যামনগরের কালীবাড়ীর কোল ঘেঁসে গঙ্গা বাঁক ফিরে গারুলিয়ার ওগুনো জমির নীলখেতের কোল বেয়ে নবাবগঞ্জের বুকে যেন ঠেকে গেছে, তার পরে আর নেই। এখান থেকে গঙ্গাকে তাই মনে হয়, যেন হঠাৎ হারিয়ে গেছে। বাঁকের মুখে খাড়া পাড়ের উপর ঘন গাছের মাথা ডিঙ্গিয়ে উঠেছে কালী মন্দিরের চুড়ো আর সারিবদ্ধ শিবমন্দিরের ত্রিশূলের ছুঁচলো মাথা।

বুড়ো পাটনি সেদিকে চেয়ে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে মিনিটখানেক

নিশ্চুপ রইলো। তারপর বারকয়েক ছোট ছোট টানে কল্‌কে অভ্যর্থনা করে প্রাণপণ শক্তিতে মারল টান। পাঁজরের হাড়গুলো যেন আচমকা ভেতরে ঠেলা খেয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল, থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল নাভিস্থলের চারপাশ, কপালের শিরাউপশিরাগুলো। এ টানের কেরামতি চূড়ামণি রোজই নিবিষ্ট মনে সপ্রশংস চোখে দেখে। আজও দেখল অভিমান ভুলে। তারপর খানিকক্ষণ দম আটকে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ে বুড়ো পাটনি। চূড়ামণিরও একটা নিঃশ্বাস পড়ে।

নৌকা তখন প্রায় পাড়ে ভিড়ছে। বুড়ো পাটনি চোখ খুলে শান্ত মোটা গলায় বলল, হাঁ, ডাকাতের কথা কী বলছিলি বাপ, বল্ দি নি এবার?

এই মুহূর্তটির জন্যই চূড়ামণি এতক্ষণ চুপ করে ছিল। কোন কথা না বলে প্রাণপণে বৈঠার শেষ চাড় দিয়ে খস্ করে নৌকো ঠেকিয়ে দিল পাড়ে। দুমদাম শব্দে নেমে দড়িতে বাঁধা লোহার খুঁটি চেপে বসিয়ে দিল মাটিতে।

বুড়ো পাটনি বলল, 'হার্মনি ফিরিঙ্গির কথা বল্‌ছিলি। ডাকাতে কালীর বয়ে গেছে ওদের কপালে সিঁদুর মেখে দিতে। তবে হাঁ, কাল রাতে গোটা পঞ্চাশ ডাকাত ধরা পড়েছে আর সব কটাকে বড় সায়েবের কুঠির উঠানে খুঁটিতে বেঁধে রেখেছে।'

সব ভুলে কিশোর চূড়ামণির দু'চোখ বিস্ময়ে ঝিলিক দিয়ে উঠল। 'পঞ্চাশ-জন? সে ক'শো হবে গো বাবা?'

'আরে ধ্-র দামড়া কোথাকার। ক'শো আবার। শ'য়ের আদ্ধেকখানিক তো পঞ্চাশ রে ব্যাটাছেলে!'

'আর ওরা সব ডাকত-কালীর সিঁদুর মেখে খাঁড়া নিয়ে এয়েছিল ?'

না, খাঁড়া একটা ছেল, আর সব লাঠি সড়কি।' বলতে বলতে বুড়ো পটনি কাছা খুলে কোমরে গুঁজল।

'ডাকাতদের মেলাই সোনাদানা না গো বাপ ? সেগুলো মাকালীর মন্দিরেই রয়েছে ?'

'তা নয় তো কি।' বুড়ো নৌকা থেকে নেমে এল।

'সেগুলো কারা পাবে ?'

'তোর শউর, বলদ কোথাকার। আমি আসছি কেউ এলে বসতে বলিস। বলে বুড়ো পটনি জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

একটানা নয়, গঙ্গার ধারে কোথাও কোথাও চাষ হচ্ছে। যশোরের চাষরার রাজাদের আতপুরের বাড়ীর বিরাট অট্টালিকা আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। আতপুরের মধ্যে এত বড় ইমারাৎ আর একখানিও নেই। প্রায় গঙ্গার কাছটাতে এসে শেষ প্রাচীর উঠেছে। প্রাচীরের নিচেই খানিক ঢালু জমি, তারপর আগাছা জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মাঝখানদিয়ে হাঁটা পথ এঁকেবেকে দক্ষিণে চলে গেছে শ্যামনগর কালীবাড়ীর দিকে, উত্তরে সেনপাড়া জগদ্দল, আরও দূরে ভাটপাড়া কাঁটালপাড়া। এ জঙ্গলের পায়ে হাঁটা আঁকাবাঁকা সরু পথ দিয়ে গঙ্গার ধারে ধারে তুমি নাকি হিমালয়ে পৌছতে পার। বড় সোজা নয় এ পথ।

মুড়ি চিবুতে চিবুতে উত্তর দিকে খানিক এগুতেই চূড়ামণি আঁতকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাটিতে চিৎ হয়ে মস্ত এক মানুষ পড়ে আছে। জীবন্ত কি মৃত কিছু বোঝবার যো নেই। দানো প্রেত কি না সে বিষয়ে তর্কের সুযোগ থাকলেও অশরীরী মাহাত্ম্য

কিছু যে আছে নিঃসময়ে' চূড়ামণি তা বিশ্বাস করল। হুগলির নীলকুঠি থেকে, গারুলিয়ার নীলকুঠির কুঁড়ে থেকে নাকি মেয়েপুরুষ ডাক-ডাকিনী গঙ্গার দু'পাড় জুড়ে এরকম পড়ে থাকে, কাজ মিটে গেলে আবার গঙ্গায় ডুব দিয়ে সরে পড়ে। বুকে গাদাখানেক থুথু ছিটিয়ে চূড়ামণি চীৎকার করে উঠল, 'হেই গো বাপ, বাপ গো এখানে একটা.........

......এর বেশী সে উচ্চারণ করতে পারল না।

তার সেই চীৎকারই বোধ হয় মাটিতে পড়ে থাকা মূর্তি একটু নড়েচড়ে উঠল। চূড়ামণি কয়েক পা পিছিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে দাঁড়াল যেন ওর নিঃশ্বাসে ঝপ্ করে মাটিতে না পড়ে যায়। পড়ে গেলেই তো তৎক্ষণাৎ ঘাড় মট্‌কে শেষ করে দেবে। সে দেখল অদূরে সেনপাড়ার কাছাকাছি মঠের চাষীরা চাষ করছে। আতপুড়ের রাজবাড়ীর হাতীর গলার ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে, ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্। ওপারে ফরাসডাঙ্গার কোল ঘেঁসে তেরঙ্গা নিশান উড়িয়ে চলেছে একখানা মস্ত ফরাসী ভাউলে।

সে আবার চীৎকার করে ডাকল, 'হই বাবা গো! এই এদিকে, ঝপ্ করে এস।'

জঙ্গল থেকে জবাব এল, 'কেন রে, কী হল?'

জবাব দিল সে, 'এই মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে এটা......'

'কী?'

চূড়ামণি নিরুত্তর। ভয়ে আড়ষ্ট কাঠ হয়ে সে দেখল মাটিতে পড়ে থাকা মূর্তি মুখভরা গোঁফদাড়ি নিয়ে অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সারা গায়ে তার মাটি, গোঁফদাড়িতে কাদা লেপা

ছোট ছোট চোখ দুটোতে তারা আছে কিনা ঠাহর করা যায় না। আর কী বিশাল মূর্তি!⋯মুখে তার রোদ পড়েছে, তাতে যেন চোখ মেলতে তার কষ্ট হচ্ছে। এদেশী লম্বা ফতুয়ার মত তার গায়ের জামাটা ছিঁড়ে গেছে, কাদায় তার রং চেনা ভার। অবসন্ন শরীরটাকে কোনরকমে ঠেলে তুলে বসল সে।

'চূড়ামণি আরও অবাক হয়ে দেখল মূর্তিটার ছায়া পড়েছে মাটীতে। বাপকে ডাকতে গিয়েও সে থেমে গেল। মূর্ত্তিটা নীলকুঠির দানো কিনা সে বিষয়ে সংশয় হল তার মনে। দানো হলে ছায়া পড়বে কেন? কাদামাখা জামা আর গোঁফদাড়িতে কুচো কাঁকড়া গুর গুর করছে কেন। গাছপালাতো থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েনি। দক্ষিণ হাওয়ার দোল খেয়ে কেমন নাচছে। ছুটে এল ঘুর্ণি হাওয়া, উঠল না ধুলোর ঝড়, অন্ধকারে ছেয়ে গেল না আকাশ মাটী। তবে কি দস্যির মত ওই মূর্তি মানুষ। সে মূর্তি ক্লান্ত। হাত তুলে কী যেন ইসারা করল। বুঝি কাছে ডাকল চূড়ামণিকে।

চূড়ামণি আরও কয়েক পা পেছিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ কী মনে করে একটা মাটির ড্যালা তুলে ছুড়ে মারল সেই মূর্তির দিকে। দানো যদি হয় তো নির্ঘাৎ এবার হাওয়ায় মিশে যাবে। বুকের মধ্যে দুরন্ত ধুকপুকুনি নিয়ে ঢিল মেরে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু না, বারেক কটমটিয়ে সেই মূর্তি দেখল চূড়ামণির দিকে তারপর নিঃশব্দে হেসে উঠল। না হাসি তো নয়, দত্যির মত। মস্ত মানুষটা কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে। মুখ ঢেকে ফেলেছে দু হাতে।

'পাগল নাকি!' চূড়ামণি এবার চেঁচিয়ে উঠল।' 'ওগো ও কত্তা বাড়ী কোথা তোমার?'

'কে র‍্যা?' বলতে বলতে পেছন থেকে বুড়ো পাটনি এসে হাজির হল।

চূড়ামণি বলল, 'ছাখো না কে কাঁদতে নেগেছে।'

মূর্তি এবার বুড়ো মানুষের গলা পেয়ে মুখ তুলল। হাত তুলে ডাকল বুড়ো পাটনিকে, 'ইধার আও।'

কথাটা বুঝল না, ডাকটা বুঝল। বাপ ব্যাটা একবার চোখাচোখি করে এক মুহূর্ত থমকে বুড়ো পাটনি এক পা এক পা করে এগুল এগিয়েও বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে বলল, 'কী বলছ বল। কোত্থেকে এয়েছ, পড়ে আছ কেন অমন করে?'

বোঝা গেল সে পাটনির কথা কিছুই বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, 'ইয়ে হ্যায় কৌন্ মুলুক্, কৌন্ জিলা, ক্যা নাম হ্যায় গাঁওকে?'

চূড়ামণিও ততক্ষণে সন্তর্পণে বাপের পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে এবং পরম বিস্ময়ে এ বিচিত্র মানুষের বিচিত্র ভাষা শুনতে লাগল। বুড়ো পাটনি হাত মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল, সে তার কথার বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারেনি। বলল, 'বাংলায় বল মিয়া, বাংলায়, ওসব ইঞ্জিরী ফারসী আমরা বুঝিনে।'

'মিয়া' শব্দটা ঠাহর করতে সে বলল, 'হম্ হিন্দু হ্যায়।'

'তুমি হিন্দু?'

সে ঘাড় নাড়ল।

'বাড়ি কোথা, বাড়ি? ঘরবাড়ি গো, ঘরবাড়ি।'

ঘর? সে মূর্তি অলসভাবে শূন্যে তাকিয়ে রইল। কোথায় তার ঘর? চোখের সামনে ভেসে উঠল বালু ছড়ানো উঁচুনীচু বিস্তৃত প্রান্তর, তার ফাঁকে ফাঁকে ঝলসানো সবুজের পাঁশুটে গ্রাম। সেই পাঁশুটে সবুজই মা লক্ষ্মীর রং সেখানে। সেই বালু-ছড়ানো কঠিন জমিনে ইতস্তত ছড়ানো যব ভুট্টার ক্ষেত, সোনালি গমের ঢেউ দোলানি। ইঁদারায় ইঁদারায় মাথায় কলসী নিয়ে আওরতের ভিড়, কঙ্কনের মিঠা আওয়াজ, মধুর কলহাস্যে মুখরিত ইঁদারার রোয়াক। অকারণ ঘোমটার ফাঁকে বিশাল নয়নে নয়নে নীরব কথার আদান প্রদান, কাঁচুলি-বেষ্টিত বুকে উত্তাল ঢেউ ওঠে অকারণ বেদনায়। মরুভূমির উত্তাপের জ্বালায় বুঝি বা কোন আওরৎ কাঁচুলির বেষ্টনী খুলে ইঁদারার ঠাণ্ডা জলে নিটোল বুক ধুয়ে নেয়, অবহেলিত জটবাঁধা চুলে জল ঢালে, জ্বালাধরা চোখে ছিটা দেয়। দিয়ে বসে থাকে জল ঢালা ঠাণ্ডা রোয়াকে; অবিন্যস্ত বিস্রস্ত। উষর মরুতাপে দগ্ধ সোনার নথ বুঝি কেঁপে কেঁপে ওঠে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে হয়তো, বিদ্রোহী সিপাহীর লড়াই, কামান বন্দুক গুলি, খুন জখম রক্ত আর মৃত্যুর আর্তনাদ। তারপর উন্মুক্ত বুক ঠাণ্ডা রোয়াকে চেপে মুখ গুঁজে হয়তো বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে! এ বালুভরা প্রান্তরই তার জীবন, কোন চাষীর সুতীক্ষ্ণ লাঙ্গলের ফালা মাটি তুলে সেখানে মরূদ্যান তৈরী করবে না।

......মূর্তি হাসল, বিচিত্র শান্ত হাসি। কোথায় তার ঘর? ঘর নেই। মাথা নাড়ল সে। ছন্নছাড়া, জঙ্গল-ছাড়া পাহাড়পর্বত নদীনালা ডিঙ্গানো, ধাবিত নেকড়ের জীবন, জোড়া জোড়া মৃত্যুবর্ষী বন্দুকের নল তার পিছে পিছে ছুটছে। মাস দিনের হিসাব নেই,

হিসাব নেই জীবনের। কখনো সূর্য উঠেছে, কখনো মেঘ ঝড় শিলা-বৃষ্টি। কখনো অন্ধকার, শুভ্র চন্দ্রালোক কখনো বা আঘাটায় আশ্রয়হীন পলায়মান উধ্বর্শ্বাস জোয়ানের বুকে মাতন লাগিয়ে দিয়েছে। ঘোমটা-খসা মাথায় অবহেলায় এলানো টিকুলি দুলেছে চোখের উপর, চাঁদের আলোয় ঠাণ্ডা বালুময় প্রান্তরের গন্ধ আকুল নাসারন্ধ্র উঠেছে ফুলে ফুলে। সে তো ক্ষণিকের! ছোটার বিরাম নেই। পেছনের সমস্তটাই ক্ষণিক, ফেলে আসা একটা স্মৃতি মাত্র। না না, তার ঘর নেই, অতীতেও থাকবার মধ্যে আছে শুধু এক বিজাতীয় ক্রোধ, তীব্র বিদ্বেষ, গোলার আগুনে ধোঁয়ার রক্তে আচ্ছন্ন যুদ্ধক্ষেত্র সারা হিন্দুস্থান, আর অসহ্য পরাজয়ের জ্বালা। আর আছে সেনাপতির মূর্তি আঁকা বুকে, যে সেনাপতির কপালে সে দেখেছিল রাজটিকা, স্বপ্ন দেখেছিল সেই বীর-মূর্তি দিল্লীর স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসনে সম্রাটের সাজে আসীন, সহস্র বর্ষের পুনরধিকৃত হিন্দুসাম্রাজ্য, সে হল তার এক বীর সেনা, যার মাথার উষ্ণীষ প্রতিমুহূর্তে সম্রাটের সম্মানস্পর্শে গরীয়ান।

সে বার বার মাথা নাড়াল। না, তার কিছু নেই। কিছু নেই! দুর্ধর্ষ শত্রু-তাড়িত ক্লান্ত নেকড়ের জীবন।

পাটনি বাপ ছেলে আবার চোখাচোখি করল। বুড়ো পাটনি বলল, 'তবে কি হাওয়ায় ভেসে এলে? ঘর বাড়ি তো শেয়ালেরও থাকে, তোমার কি মাথা গোঁজবার ঠাঁই ছেল না কোথাও?'

সে পাটনির কথা বুঝল না, চুপ করে রইল। চূড়ামণির তো বিস্ময়ের শেষ নেই। এ আবার কেমন মানুষ, যার ঘর বাড়ি নেই, দেশ নেই, বাপভাই কেউ নেই! তবে কি কাদার ভেতর থেকে

আপনা আপনি গজিয়ে উঠেছে মানুষটা! আর একবার বুকে থুথু ছিটিয়ে দিল সে।

মাথাখারাপ পাগল ভেবেই বুড়ো পাটনি আবার জিজ্ঞেস করল, 'যাবে কোথায়? ঠাঁই নিশানা আছে কিছু? দেখে তো মনে হচ্ছে কতকাল খাওয়া বিনা ধুঁকছ।'

' সে আবার আপন মনে মাথা নাড়ল। তারপর হঠাৎ বলল,' ঔর মেরা তাগদ্ হ্যায় নহি, ঔর কাঁহি যা-না মুঝে মুস্কিল।'

বুড়ো পাটনির গঞ্জিকার ধোঁয়াতপ্ত লাল চোখে একটু যেন আশা দেখা দিল। অর্থাৎ কথা খানিক ঠাহর করতে পারছে সে। বলল, 'মুস্কিল তো বুঝলাম, দুটো মুড়ি গুড় খাবে তো বল, এনে দেই। ওই লোকোর মধ্যেই আছে।' বলে সে চুড়ামণিকে ইসারা করতেই বাপের ভাগের ন্যাকড়ায় বাঁধা মস্ত একটা মুড়ির পুঁটলি নিয়ে এল।

পুঁটলি দেখে সে বিস্মিত আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। খাবার! ও হো, কতদিন পেটে দানা পড়েনি। পেটের মধ্যে শূন্য কোষ্ঠে কতগুলো সরীসৃপ যেন কিলবিল করে উঠল, জিভটা ভিজে উঠল জলে। মৃত্যুর মধ্যে জীবনের সঙ্কেত যেন। সে জিজ্ঞেস করল, 'কেয়া হ্যায়?'

বুড়ো পাটনি বলল, 'কেয়া জুঁই টুই কিছুই নয় বাবা লখীন্দর, সে পাবে তুমি হুই স্নানপাড়া কেরেস্তাম বাবুদের বাগানে। এগুলো মুড়ি, চুড়োর মা বেরবার সময় দিয়েছে। ওই খেয়ে খানিক জল খাও, পনটা একটু ঠাণ্ডা হবে।' এবং যথেষ্ট বুদ্ধি খাটিয়ে হাত মুখ দেখিয়ে বলল, 'পানি দিয়ে এস এট্টু মুখে চোখে। কি ভাবে বাবা, মা মনসা তোমার ভ্যালা নে এখানেই রেখে গেছে, কিন্তু পানটা তো ফিরে

পেয়েছ!' বলে সে দুহাত তুলে নমস্কার করল শ্যামনগরের কালী বাড়ীর দিকে মুখ করে।

চূড়ামণি তো বাপের কাণ্ডকারখানা দেখে বিস্ময়ে ফেটে যাওয়ার যোগাড়। পাটনির কথা লখীন্দর ভাবে বুঝে গঙ্গায় নামল হাত মুখ ধুতে।

চূড়ামণি বলল, 'ও লখীন্দর হল কেমন করে গো বাবা? চিনে ফেলে দিয়েছ?'

পাটনি বলল ভীষণ গম্ভীর হয়ে, 'তা বেহুলাই না হয় নেই, এ তো চাঁদরাজার লখায়ের বিত্তান্তই ঘটল।' বলে কপাল টেনে ভ্রূ তুলে বলল, 'বুঝলিনে? মানুষটা সাপে-কাটা-মরা, মা-বাপ ভেলায় ভাসিয়ে দিয়েছে যদি মা মনসা দয়া করে আবার বিষ তুলে নেয়। হাঁ কপাল বটে! মনসার দয়া আছে ওর উপর। তবে এ কালের মানুষ কি-না, তাই আগের জন্মের কথা সব ভুলে গেছে।'

বলে সে আবার কপালে হাত দিল। বিস্ময়ে ভয়েভক্তিতে বিচিত্র মুখভঙ্গিতে চূড়ামনিও বাপের দেখাদেখি নমস্কার করল। মরা মানুষ ফের জ্যান্ত হয়েছে! মনসার আশীর্বাদ-প্রাপ্ত পুত্রের দেহের প্রতিটি অঙ্গ সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। কল্পনায় সে স্পষ্টই দেখতে পেল, ভেলায় ভাসা নীল মড়াকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে মা মনসা, বিরাট ফণা তুলে জিভ দিয়ে বিষ তুলে নিচ্ছে। কিন্তু দেখা তো দিতে পারে না, ততখানি পুণ্যি নিশ্চয়ই করেনি মানুষটা। তাই বিষ তুলে পাড়ে রেখে দিয়ে গেছে।

কাদার থেকে উঠে এসে সে শুকনো মাটিতে বসল। পাটনি তার হাতে তুলে দিল মুড়ির পুঁটলি।

ইতিমধ্যে জগদ্দলের আর আতপুরের দু-চারজন এসে ভিড় করেছে ফরাসডাঙ্গার খেয়া পেরুবার জন্য। মদন কৈবর্ত জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারখানা কি গো পাটনি খুড়ো, কে এল ?'

বলতে বলতে তারা সকলেই পাটনির কাছে এসে হাজির হল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল বিড়ম্বিত মানুষটাকে। গোঁফ দাঁড়ি ভরা মুখ, শতচ্ছিন্ন জামা-কাপড় কাদায় মাখামাখি। চেহারা বটে, যেন বিভীষণ, কিন্তু মুখখানি শিশুর মত কোমল। মুড়ি খেতে খেতে এক একবার মুখ তুলে সে অনুসন্ধিৎসু চোখে সবাইকে দেখছে, চেষ্টা করছে হাসবার। থেকে থেকে একটা ভয়চকিত সন্দেহের ছায়া পড়ছে তার চোখে। এ মানুষগুলোকে অবশ্য তার ভয় নেই। আতপুরের রাজপ্রাসাদ, জগদ্দল সেনপাড়ার যে ইমারৎ গাছের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারছে সেগুলোই তার ভয়ের উদ্রেক করছে বেশি। গোরা কোম্পানির সঙ্গে সমঝাওতা হয়ে গেছে হিন্দুস্থানের, দোস্ত-ইয়ার পেয়েছে মেলাই। ওই সব বড় আদমিরা গোরাদের সহায়। যদি তারা তাকে ধরিয়ে দেয় ? তুলে দেয় যদি কোম্পানির কামানের মুখে। হায় রাম ! এভাবে কত দিন সে জিন্দিগি বহন করবে ? আর তো তার চলার ক্ষমতা নেই। সমস্ত শক্তি নিঃশেষ। আর ওই ঢোল ড্যামডেমিয়া সর্বনেশে মুলুক। সে ফরাসডাঙ্গার দিকে ফিরে তাকাল। যেন একটা শিকারীকুকুর তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

শ্যাম বাগদী বলল, 'চুপ করে রইলে যে খুড়ো ? বিত্তান্ত কি, লোকটা এল কোথেকে ?'

পাটনি বুড়ো চূড়ামণিকে বলা বৃত্তান্ত সবাইকে ফিসফিসিয়ে চোখ বড় বড় করে বলল। খানিক দক্ষিণে আতপুরের কানাচে জঙ্গলপীরের

দহ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ওইখানের মা মনসা ওকে দয়া করে এখানে দিয়ে গেছে। হ্যাঁ, ও তোমার দিন্নু, হারু (দিনেমার হার্মানি অর্থাৎ আর্মানি) য্যাতই ভোল পালটে দিক, ভগমানের নীলা থাকবে চেরকাল ধরে। তা, এখন আমাদেরই এটা কিছু করতে হবে তো!'

বুড়ো পাটনির এ কাহিনীকে সকলেই মেনে নিল শুধু নয়, জঙ্গলপীরের দহের দিকে তাকিয়ে সকলেরই বুকের মধ্যে ছমছম্ করে উঠল। শুধু মা মনসা বলে কথা নয়, সমস্ত রুষ্ট আর ক্রুদ্ধ দেবদেবীর আস্তানা হল জঙ্গলপীরের দহ। দেখতে পাও না না পাও, আতপুর ও শ্যামনগরের মধ্যখানে ওই জঙ্গলপীরের বড় বড় গাছের ঝুপসিঝাড়ের মাথার উপরে দেবদেবীর শ্যেনদৃষ্টি প্রতিমুহূর্তে এই গাঁয়ের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও একটু অনাচার করেছ কি আর রেহাই নেই। রাগে ফোঁসা নিঃশ্বাসের ঝোড়ো ঝাপটাতেই তোমাকে আছড়ে ফেলবে ওখান থেকে। তাই জঙ্গল-পীরের দহে পূজো লেগেই থাকে। জগদ্দল-আতপুরের মানুষরা যেতে আসতে মাথা নোয়ায়।

শ্যাম বাগদী বলল, 'তা হলে ব্যবস্থাটাবস্থা এটা কর। সেন-পাড়ায় পাইটে ছ্যাও, হিল্লে এট্টা ক'রে দেবেখন কর্তারা।'

মদন কৈবর্ত একটু বোকাসোকা মানুষ। কথার আগঢাক বোঝে না সবসময়। কথায় কথায় তার রসিকতা। বলল, 'বলি তা'হলে এট্টা কথা। মায়ের পেটে ছাওয়াল জন্মায় বিঘৎখানেক, তা এত বড়টারে নিয়ে কী শেখাবে তোমরা? বলছ যখন, মরা মানুষ ফের জন্মো নিয়েছে?'

তার চেয়ে যে অনেক ছোট কিশোর চূড়ামণি, সেও পর্যন্ত মদনকে বোকা ঠাউরে জবাব দিল, 'মায়ের পেটে তো কবেই জন্মেছে, কিন্তু একবার মরে যে আবার বেঁচে এল সেটা বুঝছ না?'

মদন বুঝবে কি, হেসেই গড়িয়ে পড়ল। বলল, 'শিবের দিব্যি দিয়ে বলছি, এমন অবাক কাণ্ড আর দেখিনি।'

শ্যাম ধমকে উঠল, 'থাম থাম। সব কথায় অমন খ্যাল খ্যাল করে হাসিসনে, মাকড়া কোথাকার।'

'মাকড়া না মাকড়া।' রাগে দম আটকে গিয়ে বুড়ো পাটনির হাড়পাঁজর যেন রুখে উঠল। তার নিয়ত গোলাপী চোখ জবার মত লাল করে বলল, 'জন্মালি তো সেদিন, দেখলি আর কতখানি যে শিবের দিব্যি গালছিস্?'

জগদ্দলের মুসলমান পাড়ার গনি মিয়া বলল, 'পীর আর ওর মাথায় নেই। ফরাসডাঙ্গার পাদরী সাহেবরা পেয়ার করে ওকে মাডুন বলে ডাকে, ডাব খাইয়ে বকশিশ পায়, ধর্মে কি আর ওর মতিগতি আছে?'

চুপ করে গেল মদন।

শ্যাম খানিকটা দ্বিধা করে হঠাৎ বলল, 'তা খুড়ো, এক কথা বলি। আমাদের বংশটাতে মা মনসার বড় কোপ রয়েছে। বড় ছেলেটাকে সাপে কাটল গেল সনের আগের সনে। পুজো-আচ্চা তো দিলুম মেলাই কিন্তু এ্যাই সেদিনে আমার ভাই লারানটা মজুমদারদের দেউড়ি পিলের কোলে একটা সাপকে শুধু ঢিল মারলে। একেবারে মারতেও পারল না। এখন বল তো, ঘা খাওয়া সে বেটি কি ছেড়ে দেবে ওকে?'

সকলেই সর্বনাসের গন্ধ পেল। বুড়ো পাটনি ঠোঁট নেড়ে কি যেন বলল বিড় বিড় করে। চূড়ামণি এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাইছে

এসব আলোচনা থেকে। কিন্তু ঐ মানুষগুলোকে আজ পেয়ে বসেছে এসব মৃত্যু আর অমঙ্গলের সাংঘাতিক কথায়। নড়ে চড়ে নৌকায় গিয়ে বসে যে মুড়ি চিবোবে সেটুকু মনের জোরও তার নেই। জঙ্গল-পীরের দিকে আড়চোখে দেখতে লাগল সে।

গনি মিয়া বলল শ্যামকে, 'তা এক কাজ করতে পার। জঙ্গলপীরের খানে মানত করে রাখ।'

পলাতক সিপাহী এ মানুষগুলোর কোন কথাই বুঝল না। কেনই বা এরা কপালে হাত তুলছে আর শঙ্কায় থমথমিয়ে উঠছে এদের মুখ, কী এমন দুর্ঘটনা ঘটল কিছুই সে বুঝতে পারল না। ইতিমধ্যে মুড়ির পুঁটলিটা সাবাড় করে চুপ করে বসে রইল সে।

শ্যাম বলল, শঙ্কিত গম্ভীর গলায়, 'এই সেদিন ছোঁড়ার বে দিয়ে বউ আনলুম, সেই ফূর্তিতেই ছোঁড়া বাঁচে না। এসব ভাবলে আমার আর ভাল লাগে না কিছু বাপু। বাপ-মা হাইরেছি সেই কবে। বড় ছেলেটা ম'ল আবার যদি কোন বেপদ আপদ হয়, কী গতি হবে এ সংসারের?'

সকলেই চুপচাপ। কেবল মদন বলল, 'ওদিকে হাটবাজার গুটোবার সময় হল গো খুড়ো।'

বেশ খানিকক্ষণ চিন্তার পর শ্যাম যেন স্থির বিশ্বাসে এবার বলল, 'খুড়ো, এট্টা মতলব দাও দিনি। তোমার এ লখাই মা মনসার বর-পাওয়া-মানুষ। একে আমার ঘরে নিয়ে তুললে মায়ের কিপা হবে না?'

বুড়ো পাটনি একবাক্যে সায় দিল। বলল, 'ঠিক বলেছিস শ্যামা। বলতে গেলে মানুষটা তো মনসার কোলের পুত্তুর। ও যেখানেই

থাক, মা আমার সেথানেই। অমঙ্গলের নিশ্বেস ফেলে সব্বোনাস করতে পারবে না। তবে ...’

‘তবে ?’

‘না, কিছু লয়। জাতবেজাতের কথা বলছিলাম। তা হিঁদু তো বটে। নাম ধাম ঘর কুলের কোন কিনারা আর হবে কি করে! ওই লখাই বলেই ডাকবে, থাকবে। মা নক্ষীর কিপায় তোমার তো আর অনটনের সংসার লয়।’

ইতিমধ্যে বেলা বেড়ে উঠেছে। জোয়ার এসেছে আবার। শান্ত হাওয়া জোর হয়েছে। গলা ফাটিয়ে একটা কোকিল ডাকছে। কোম্পানির নিশান উড়িয়ে দুখানা মস্ত ভাউলে উত্তরে চলছিল ধিকিয়ে। জোয়ার পেয়ে তার গতি বেড়ে গেল।

বুড়ো পাটনি বলল, ‘কই গো লখাই, যাও বাবা, এখেনে আর কতক্ষণ থাকবে। শ্যামের সঙ্গে ঘরে যাও।’

সিপাহী উঠে দাড়াল। বলল, ‘কেয়া করেঙ্গে হম্, কাঁহা যানা হ্যায় ?’

‘হ্যায় ট্যায় নয় রে বাপু, গতি তো এট্টা করতে হবে তোমার ?’ বুড়ো পাঁটনি বলল, শ্যামকে দেখিয়ে, ‘যাও, এর ঘরে যাও।’ বলে সে আবার গাঁজার কলকেটা বার করল।

সিপাহার মনে সংশয় এলেও এটা সে বুঝেছিল, এরা তার আসল পরিচয় জানে না, এরা তার প্রতি নির্দয় নয়, এরা তাকে কোন বিপদে ফেলবার ষড়যন্ত্র করছে না। তা ছাড়া এ দুর্বিষহ জীবনের অবসান চায় সে। সে জানে না যে, কোন্ মুলুকে এসেছে, এ অপরিচিত মানুষ ও পরিবেশ এসবই তার জীবনে আর অস্বাভাবিক নয়। জীবনের

কোন নির্দিষ্ট গতি তার কাছে নেই, সে শুধু পলায়মান ভীত ত্রস্ত অসহ্য জীবনের গণ্ডির বাইরে যেতে চায়। সে আবার সকলের মুখের দিকে দেখল, দেখল শ্যামের আগ্রহ ও কৌতূহলভরা মুখের দিকে। ফিরে দেখল ফরাসডাঙ্গার দিকে, তারপর কাছে ঘেঁষে এল শ্যামের। তার অতীত বলে কিছু নেই। যে পথ সে পেছনে ফেলে এসেছে, সে পথ থাকুক পেছনেই। পেছনেই থাকুক বেরিলির যুদ্ধক্ষেত্র, মনের মধ্যে হারিয়ে যাক তার অশান্ত ক্রোধ, বিরাট আকাঙ্খা। মানসপট থেকে যা উপড়ে ফেলা যাবে না তা হল বীর তাঁতিয়াটোপির উদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল, উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে সিপাহীর পথদ্রষ্টা সেই তেজস্বী মূর্তি! আর ···, না আর কিছু নেই। সামনে শুধু আছে অপরিচিত ভবিষ্যৎ, নতুন জীবনের আশা ও সংশয়। কে জানে তার শেষ কোথায়।

ধামা বগলে শ্যাম চলল আগে আগে নারকেল আর আমবাগানের ভেতর দিয়ে, পায়ে চলা আঁকাবাঁকা পথে। নীরবে চোখের দৃষ্টি দিয়ে বুড়োপাটনি ও চূড়ামণির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাদের মা মনসার বরপুত্র লখীন্দর বিশাল শরীর নিয়ে শ্যামের পেছন পেছন চলল। তাদের চলার শব্দ চৈত্রের ঝরা পাতায় মর্মরিত হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল সেন পাড়ার আমবাগানের ধারে ধারে বিশাল বনস্পতির আড়ালে।

কেবল মদন বলল, 'কই গো খুড়ো, দেও তা হলে একটু বুত করে বানিয়ে নিই।'

বুড়ো পাটনি ট্যাঁক থেকে গাঁজার ড্যালাটা তুলে মদনের হাতে দিল। কিশোর চূড়ামণি খুঁটি তুলে ভাসাল নৌকা।

২

গঙ্গায় জোয়ার-ভাটা আসে, চোরাবানে আচমকা কখনো দু'কূল ডুবিয়ে বেড়ে ওঠে, আবার নেমে যায়। প্রতিমুহূর্তে চলমান, মৃত্যুহীন। অম্বুবুচি আসে, ঋতুস্রাবে চিরযৌবনা গঙ্গার অথৈ লাল জল দু'কূল প্লাবিত করে বয়ে চলে কখনো হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগরে, কখনো নিস্তরঙ্গ ক্লান্ত, সমুদ্রের নীল জলের ধারায় স্বচ্ছ টলটলে। বয়ে চলার বিরাম নেই।

বিরাম নেই রাত্রি আসার, দিন যাওয়ার। মাস যায় আসে নতুন বছর। আবার যায় আবার আসে। কিন্তু যা যায় তা আসে না। নতুন মানুষ আসে, কিশোর যুবক হয়, যুবক বৃদ্ধ হয়। সে দিনের আঁচল-চাপা মেয়ের গর্ভে আসে সন্তান, নতুন বকনা গাই বিয়োয় বাছুর। ঘাস জ্বলে কোথাও মাটি হয় বন্ধ্যা, নতুন ঘাস গজায় কোথাও, কোথাও মাটি রসসিক্ত উর্বরা হয়ে ওঠে।

জঙ্গলপীরের দহ থেকে গঙ্গা সড়ে। ফরাসডাঙ্গার চ্যাপচ্যাপে ঘাটের কোল কিঞ্চিৎ বঙ্কিম হয়ে ওঠে। ঐতিহ্য নিভে আসে দীনেমার গড়ের। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে একবার ফরাসডাঙ্গার থানায় থানায় বেজে ওঠে নাকাড়ার শব্দ। ঢিমে তালের চ্যাপচ্যাপে সেই শব্দ। বিদেশীর শাসনের চাপে ভেঙ্গে পড়ে আগের সমাজ-ব্যবস্থা, মানুষ তার লেনদেনে পর হয়, পরস্পর কেবলি দূরে যায়।

জগদ্দলের সেনেরা কোম্পানির দেওয়ানির চোগা-চাপকান পরে লাখ থেকে দু লাখ, তারপর লাখ লাখ মোহর টাকায় সিন্দুক ভরে তোলে। সোনাদানায় ভরাভরতি ভাঁড়ারে রক্তের দাগ লেগে থাকে,

ছাতা পড়ে। চরণাশ্রিত দেওয়ানের দুর্দ্ধর্ষ..লাঠিয়ালেরা মাসে মাসে হিসাব কষে, কোন্ অভিযানে কত টাকা এল, কি ক্ষয় ক্ষতি হল। দেওয়ান না বাঘ, বাঘ না দেওয়ান কিংবা সেনেরা সিংহ তারা বাঘ, শক্তি ও হিংস্রতার এ হিসাব মেলানো মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে পড়ে তাদের পক্ষে। তবে তার দরকার নেই খুব। নীল রক্তের আবর্তে সাদা ফেনার মত শুভ্র পবিত্র। প্রভুভক্তিতে উজ্জ্বল তারা। রক্ত পিপাসার্ত জীবনে মাঝে মাঝে ঝিমুনি এসেছে, দেওয়ানী অভিজানের বিশ্রাম সেটা। কিন্তু সেনেদের আস্তাবলের ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি ও পা ঠোকার খুরের শব্দে আচমকা ঝিমুনি কেটে গেছে, রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক গতি যেন ফিরে পেয়েছে। জীবনের এই তো পথ। গড়া নয়, দেওয়া নয়, গ্রাম জনপদ শুধু রক্তগঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া, কালো বিশাল দেহ নিয়ে শক্ত বাঁশের লাঠির ঝাপটায় ঝড়ের বেগে উড়ে যাওয়া। কিন্তু হ্রেষাধ্বনির জবাবে হয় তো ঝঙ্কার পড়েছে বীণার তারে, সুললিত কণ্ঠে প্রাণ রাঙানো রাগিণী উঠেছে প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠে। বিশ্রাম শেষ হয়নি এখনো। নয় তো দেওয়ানী অভিযান নয়, চওড়া সড়কের বুকের উপর দিয়ে ধুলো উড়িয়ে কেশর ফুলিয়ে অশ্ব সওয়ার নিয়ে ছুটে গেছে দক্ষিণে আতপুর রাজপ্রাসাদের খিলানে শব্দ তুলে, শ্যামনগর পেরিয়ে, গাড়ুলিয়ার নীলকুঠিতে কিংবা গঙ্গার বুকে ভাউলের দাঁড় সন্তর্পণে ককিয়ে উঠেছে, ফরাসডাঙ্গার আকাশে ডুবন্ত সূর্যের লাল আলোয় চকচকিয়ে উঠেছে ইংরেজী বুটজুতা ভাউলের ছাতে-বসা যাত্রী দেওয়ানের। দেওয়ানী বিলাস-ভ্রমণ।

কখনো কয়েদখানা থেকে ভেসে আসে কয়েদীর আর্তনাদ, শিকলের

ঝনাৎকার, বাগদীসিপাহীর হুঙ্কার। সেনেদের কয়েদখানাও আছে। কোম্পানি তাদের এ অধিকার দিয়েছে, পনর দিন পর্যন্ত কয়েদ করবার অধিকার আছে তার অপরাধীদের। কিন্তু সবই তো কটাক্ষের ব্যাপার। যার উপর কোপকটাক্ষ পড়েছে তার কত পক্ষকালই কেটে যায়, যার উপর দয়া আছে সে দুদিনেই পাপের প্রয়াশ্চিত্ত করতে পারে। এ বে-আইনের খবর কোম্পানিকে দেওয়ার সাহস কারুর নেই, কোম্পানিরই বা অবসর কোথায় সে খবর নেওয়ার।

দরবারের সরকার কায়স্থের রক্তে দেওয়ানী-সুরা যেন ঐশ্বর্যের গৌরবে মত্ত করে তুলেছে। জগদ্দল বলে লাভ কি? সেনপাড়া বলাই ভাল। ওই নামের মহিমা আর সব নামই তো গ্রাস করেছে।

তা ছাড়া আছে দান ধ্যান। আশ্রিত মানুষেরা এদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির কামনা করে ভগবানের কাছে। পালা পার্বণে নতুন গামলা ভরতি মিষ্টি, মাটির হাঁড়ি ভরতি তেল, চাকর-বাকরদের সংসার তো পরিপূর্ণ। কথায় কথা আমদানি হয়। দেওয়ান গৌরীসেনের নামে মুখে মুখে কথা ছড়ায়, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। সেনেদের কল্যাণে স্নানপাড়ায় দুঃখ নেই, অভাব নেই, গাঁয়ের বাসিন্দারা নামের গরিমায় গর্বিত।

আগুরীপাড়ার ঘাটে বসে বুড়ো কালো দুলে গল্প করে, 'কি আর দেখলে বাছা তোমরা? আমরা যা দেখেছি খেইয়াছি পেইয়াছি, এখন তো তার আদ্ধেকখানেক দেখেছ তোমরা? কত দূর দেশ থেকে মানুষ এয়েছে সেনেদের কাছে অভাবে দুঃখে। বিমুখ তো দূরের কথা, যা পেয়েছে তা নিয়ে যেতে পথেঘাটে বেপদ-আপদের ভয়ে সঙ্গে দিয়েছে লেঠেল পাইকে। ··· হ্যাঁ, আমার বড় ব্যাটা অই মতি তখন পেটে..

সোহাগ করে বউ বলল নাক তুলে, তার একখানা নাকছাবি চাই। ···
বড় কত্তা চেরকালই বড় ভালবাসতেন আমাকে। গেনু তার কাছে পায়ে পায়ে। যাওয়া এক কথা, সামনে গে মুখখোলা বড় চাড্ডিখানি নয়। গিয়ে গড় করনু। কত্তা একবার মুখ তুলে খালি বলল, 'কী চাই কালো?' বাবারে বাবা! গলা কাঠ হয়ে গেল, মুখে রা ফোটে না। কেমন করে বলি, পোয়াতি মাগ আমার সাধ করে কিছু খেতে চায়নি, চেয়েছে নাকছাবি! ওদিকে দরজার আড়ালে চুড়ি বেজে উঠল ঝুন ঝুন করে। কত্তা দাঁইড়ে পড়ে বললেন, 'কিছু তো বললি না কালো, কোন আপদ-বিপদ হয়নি তো?'

বলে ফেলনু, 'তা বেপদই কত্তা, লইলে পোয়াতি বউ খেতে না চেয়ে নাকছাবি চায়?

কত্তা হো হো করে হেসে উঠলেন, 'এই কথা?' কিন্তু তার আগেই দরজার আড়াল থেকে রানীমা বেরিয়ে এলেন। হীরে বসানো নাকছাবি টুক করে নিজের নাক থেকে খুলে বললেন, 'সেদিন দেখেছি তোমার বউকে। নাকছাবি লাগাবার মতই নাক বটে। এটা নিয়ে গে পইরে দেও।'

কত্তার হাতের কাছে রূপোর বাটায় কিছু মোহর ছেল। কারুর হয় তো আসবার কথা ছেল। বাটা শুদ্ধ আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'পঞ্চামৃতের খরচের জন্য এটা নিয়ে যাও। আর ছেলে হলে সোনার মল ঝিনুক আর বাটি নিয়ে যেও, মেয়ে হলে সবই রূপোর পাবে।'

ওমা! এদিকে দপাস্ করে রানীমার চোখ দুটো যেন জ্বলে গেল। গলা থেকে সোনার চাঁদহার খুলে দিল সেই

মোহর দেওয়া রুপোর বাটায়। বলল, 'মেয়ে হলে গলায় পরিয়ে দিও। আর ছেলে হলে তোমার বউকে দিও।'

কত্তা তো হো হো করে হেসে উঠলেন, 'যে মা ছেলে প্রসব করে, রানীমা তাকেই গলার চাঁদহার পুরস্কার দেয়, বুঝলি কালো। এবার তুই যা।' আমি তো কিছু বুঝলুম না। সব যেন আঁধার মনে হল, ভয়ে ময়ে কান্না পেল আমার। রানীমার মুখ তো নয় যেন লকলকে আগুনের শিষ। যাবার জন্য পেছন ফিরনু, রানীমার ভারী গলা শুনতে পেনু, 'নিশ্চয়, মেয়েমানুষ না হলে ছেলে প্রসব করবে কে? পুরস্কার যা তা মেয়েরই প্রাপ্য। সব পুরুষই তাদের গর্ভে জন্ম নেয়।

দরজার কাছখানে এসে পড়েছি, শুনমু কত্তার কথা, 'আর সেটা পুরুষেরই ঔরসে।'

—ব্যস্! কোঁচড়ে ঢেকে ঢুকে তো সে হার মোহর ঘরে নে এনু। সেদিনই শুনমু, কত্তা দিল্লীর গাইয়ে মেরজা ওস্তাদকে সঙ্গে নে মা রানীকে বজরায় করে গঙ্গায় হাওয়া খেতে গেছেন। আর রাতভর জেগে রইনু আমি আর মতির মা। আকাশে এ্যাই মস্ত চাঁদ, আলোর যেন বান ডেকেছে। মতির মার নাকে সেই নাকছাবি, কি যাতনই লাগল আমার বুকে। কিন্তু মনটা বড় দমে গেইছেল কত্তা আর রানীমার কাণ্ড দেখে। মতির মা কানে কানে বলল আমাকে, 'মিন্‌সে তুমি ঠাওর পাও না, ওসব হল কত্তা আর রানীমা'র খুলমুটি খেলা। পীরিত বোঝ না!'

—বুঝনু, কিন্তু অনেক পরে। যখন মতির জম্মো হল তখন কত্তা-রানীর দুজনের আমোদ দেখে। সে বছরই রানীমা গর্ভবতী হলেন।—'

জগদ্দলের জোয়ানেরা আগুরীপাড়ার ঘাটে বসে স্তব্ধ বিস্ময়ে সে সব কথা শোনে। ফোঁস্ করে নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে চেয়ে দেখে গঙ্গার জোয়ার-ভাটা। গঙ্গা ছোট হয়ে আসছে ধীরে ধীরে, ঠাহর করা ভার। তেমনি ভেঙ্গে আসছে সেনেরাও। কথায় কথায় সোনা-মোহর নেই আর, আছে গামলা ভরতি মিষ্ট, তেল ভরতি হাঁড়ি। এও কি আর চেরকাল থাকবে?

কিন্তু কালো দুলে থামতে পারে না। আগুরীপাড়া ঘাটের হাওয়ায় গলা মিলিয়ে বলে, 'এতবড় কি আর চেরকালই ছিল স্যানেরা। না, তা নয়। তবে বলি শোন, কোম্পানির সঙ্গে পাঞ্জাবে না রেঙ্গুনে ত্যাখন যুদ্ধ চলছে। শীতকাল। স্যানেদের এক কত্তা রোদপোয়াতে গিয়ে গঙ্গার ধারে ঘুমো পড়েছে। কোম্পানির সেপাইয়ের নৌকা চলেছে গঙ্গার উপর দে। সেপাইদের সঙ্গে যে সায়েব ছেল, সে ভেড়াল নৌকো পাড়ে, অনেক ইডিংমিডিং করে কি সব জিকেসাবাদ করল কত্তাকে। কত্তারা তো বরাবরই খুব চরকো। জবাব দিলে চটপট। অমনি সায়েব ধরে বসল, 'বাবু, তোমাকে যেতে হবে আমার সাথে নড়ুই করতে।' কত্তা তো ভেবে মেবে রাজী হল। কিন্তু বায়না ধরল, যেতে হলে সাহেবকে কিছু টাকা দিতে হবে তার মাকে দে যাওয়ার জন্যে। সায়েব তাতেই রাজী। মাকে টাকাপয়সা দে কত্তা বেরিয়ে পড়ল। দিন গেল, মাস গেল অ্যানেক, কোম্পানির জিত হল সে যুদ্ধে। আর জিত হলেই তো লুটপাট। সায়েব বলল, 'বাবু, তুমিও লুট কর। বাবু তো বাগদী-কেওরের মত বন্দুক কাঁধে লুট করবে না! তিনি গে দখল করল এক বাড়ি, তার এক ঘরে শুধু ন' লক্ষ টাকার পয়সা। কত্তা বলল, 'সায়েব, এত আমি নিয়েই বা যাব কি করে, আর তুমিই

দেবে কেন? কিন্তু তখনকার ফিরিঙ্গিরা ছেল ভাল নোক, এখনকার মত ছোঁচা ছেল না। বলল, এ সবই তোমার, নে যাওয়ার সব বন্দবস্ত হবে। সেই থেকেই ···

কিন্তু কেউ কেউ বাধা দেয় কালো ভুলের কথায়। বলে, 'তবে যে শুনি বেধবা মেয়েকে দেখে—?'

'হাঁ, সেটাও কথা বটে।' কালো ভুলে অমনি বলে ওঠে; তবে সেটা হল ইজ্জতের কথা। কত্তারা স্বীকার পায় না, আর আমরাও চোখে দেখিনি। তবে ঘরে ঘরে খুব ফিসফাস হয়েছিল। ···তখন ভরা বর্ষা, ভরাভরতি গঙ্গা। স্যানেদের এক মেয়ে অকালে বেধবা হয়ে বাপ-ভায়ের ঘরে ছেল। আর সে কি রূপ। আপসরীও হার মানে তার রূপের কাছে। সে গেছে একা গঙ্গা নাইতে। তখন এক ফিরিঙ্গি যাচ্ছিল দক্ষিণে তাদের গোবিন্দপুরের কেল্লাতে। তার চোখে পড়ল সেই মেয়েকে। বজরা ভেড়ালে সায়েব ঘাটে, বললে সে মেয়ের পায়ের কাছে বসে, সুন্দরী, তোমার রূপে আমার পরান ভুলেছে, তুমি আমার সঙ্গে চল। কি জানি সে মেয়ে গোরার মনোহর রূপ দেখে ভুলেছেল কি না। সে মেয়ে পাইলে গেল না, চুলের গোছায় মুখ ঢেকে আড়চোখে সায়েবকে দেখল, কি কথা হল। সে থেকেই এ দেওয়ানি।'

সবাই চুপ করে শোনে, শুনেও চুপ করেই থাকে। কালো ভুলের কথার রেশ টেনে চলে অবিরত বয়ে চলা গঙ্গার ছলছলানি। সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের আগ্রহ নেই। শুধু শুনেই খালাস। শেষ নেই শুধু সেকাল আর একালের। যুগে যুগে কবলি সেকাল যায়, একাল আসে।

আতপুরস্থিত চাষরার রাজবাড়ীর হাতিগুলোর বয়স বাড়ে। চঞ্চল ঘণ্টার শব্দ হয়ে আসে ধীর মন্থর। দুই হাতি—পবন পেয়ারী আর লক্ষ্মীপেয়ারী। বিশাল দুই গাব গাছে বাঁধা থাকে। নতুন দুটো চারা এনে লাগানো হয়েছে আসামের কামাখ্যা পাহাড়ের কোল থেকে। বেড়ে উঠলে হাতি বাঁধা হবে ওই গাছেই।

রাজা বরোদাকান্তর মা ভাটা-পড়া বয়সে যশোর থেকে গঙ্গাস্নানের ও অবিরত গঙ্গাদর্শনের আকাঙ্খা প্রকাশ করেছিলেন ছেলের কাছে। তাই আতপুরের এ প্রাসাদ তৈরি হয়েছিল। তবু ছেলেরা মাকে ছেড়ে বড় একটা থাকতেন না। তা ছাড়া, বিদেশী হলেও আতপুরের লোকেরা তাদের পর মনে করেনি, উপযুক্ত সম্মান দিয়েছে। মা কালীর বরপুত্র হিসাবে তারা বরাবরই বিখ্যাত। ধর্মাচরণে তাঁরা সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বড়কর্তা আর ন' মশাই অর্থাৎ জ্ঞানদা ও বরোদাকান্ত প্রথমবারে গঙ্গাস্নান করতে এসে পরপর দুখানি মন্দির তৈরি করালেন। তা ছাড়া, কালীপূজো, গানবাজনা ভোজ উৎসব বারোমাস লেগেই থাকে। পশ্চিম থেকে বজরায় করে আসে ইহুদি-বাঈজী। বিচিত্র বিদেশী মিঠা বুলি ও চোখের চাউনি ও নাচের ছন্দে আশপাশের সমস্ত চাকলা যেন মাতাল হয়ে ওঠে। ময়দার পাহাড় ওঠে, ঘিয়ের গন্ধে বুঝি সারা চব্বিশপরগণাই মাতোয়ারা। ঝাড় লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত রাজপ্রাসাদ।

সবাই এসে সেখানে ভিড় করে। জগদ্দল সেনপাড়ার লোকেরা আসে। দুলে বাগদী ডোম বামুন কায়েত বদ্যি। নিমন্ত্রণ দেওয়াই আছে। বিশেষ নিমন্ত্রণ যায় বিশেষ বিশেষ বাড়ীতে। কেবল সেনপাড়ার পিরলী বামুনেরা নিমন্ত্রণের অংশ গ্রহণে সব সময় এগিয়ে আসেন না,

তাঁদের কাছে সব সময় নিমন্ত্রণ যায়ও না। হালদার, মজুমদার, চক্রবর্তী জগদ্দলের এসব পরিবারই প্রায় পিরুলী বামুন। সাধারণ ভাবে এরা কেরেস্তান বলেই গন্য। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে এলোমেলো সুতোর জটের মত এরা প্রায় সকলেই না হোক, দু-এক ঘর জড়িত। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সম্পর্কহীন।

ইংরেজের দরবারে সকলেই প্রায় কোন না কোন উচ্চপদে এঁরা অধিষ্ঠিত। শিক্ষায় দীক্ষায় অগ্রগ্রামী এঁরা সাধারণত। সেনপাড়া থেকে বাউলে ভাসিয়ে কলকাতায় যান চাকরি করতে।

আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ সেনপাড়া জগদ্দল চেহারা পালটায় বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তবে তার ধাক্কাটা ধনী-জনদের ঘরে যত সুস্পষ্ট, বাকি জনপদে তার ছায়া তত চোখে পড়ে না।

শুধু উত্তর থেকে দক্ষিণের দীর্ঘ চওড়া সড়কটা তেমনি নির্জন ঝিমিয়ে পড়ে থাকে। বর্ষায় নতুন খানাখন্দ হয়, গরুর গাড়ী চলে. কোথাও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। পথটা বুড়ো হয়ে গেছে. বুড়ো বট অশথ দেবদারুর সঙ্গে বার্ধক্যের মিতালীতে একসঙ্গে যেন ঝিমোয় সারা দিনরাত্রি ধরে। পথের ধারে কাছে যারা থাকে তারা কখনো মাটি দিয়ে খাল গর্ত বুজিয়ে দেয়, বউ-ঝিয়েরা ঝাঁটা বুলিয়ে সাফ করে রাখে খানিক জায়গা। তবু আবার ধুলো জমে, পথ ভাঙ্গে।

•

পূবের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। এখুনি সে আকাশ ফুঁড়ে বেরুবে সূর্য। গাছের নতুন পাতায় হাওয়ার মাতন। পাখি ডেকে ডেকে অস্থির। জোয়ারের ছলছলানিতে গল্প জুড়েছে গঙ্গা।

বুড়ো পাটনির পুরনো নৌকায় ছেলে চূড়ামণি বসে বসে হাতের চেটোয় গাঁজা ডলে। আপন মনে গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে হাসে আর থেকে থেকে ওপাড়ের ঢ্যাপঢ্যাপে ঘাটের ঝুপসিঝাড়ের দিকে চোখ তুলে কী যেন খোঁজে। নিরাশ হয়ে চওড়া বুকটা ফুলে উঠে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। তারপর হঠাৎ নজরে পড়ে নৌকার গলুইয়ের কাছে মস্ত এক শ্যামাকান্তী, জোয়ান তার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে নীরবে। 'কে লখাই দাদা নাকি গো? এস, বস'সে।'

সেই বুড়ো পাটনির লখীন্দর, শ্যাম বাগদীর ঘরে তোলা মা মনসার বরপুত্র সেই গোঁফদাড়ি-ভরা বিড়ম্বিত পলাতক সিপাহী। যেদিন ছিল একুশ বছরের তরুণ, জীবনের সমস্ত দুর্যোগে চেহারা ছিল ঢাকা। আজ গোঁফদাড়ি কামানো ছত্রিশ বছরের মস্ত জোয়ান। যেন তার যৌবনের এটাই শুরু। তার সিপাহী ব্যারাকের ও মরুভূমির রুক্ষ চোখমুখে এক শান্ত ছাপ পড়েছে, কটা চামড়া খানিক শ্যামল হয়েছে, মসৃণ হয়েছে শক্ত সুঠাম শরীরের ত্বক। তবু চোখ দুটো যেন তেমনিই আছে। সেই নবজন্মলব্ধ শিশুর মত বিস্ময়ে ভরপুর। শ্যাম বাগদী জোর করেই তার মাথায় বাবরি চুল রাখিয়েছে। তাইতেই যেন তার মস্ত শরীরটার পুরো রূপটুকু খুলেছে। নবজন্মই বটে। সে মানুষটাই আর নেই। আজ সে এ দেশের ভাষা বুঝতে পারে। বলতে পারে। শ্যামের বউ কালী তাকে শিখিয়েছে মাছ খাওয়া। মচ্‌লি তো সে খেত না আগে। বাগদীঘরে সে আজ হয়েছে লখাই বাগদী। পড়ে-পাওয়া মা মনসার বর-পাওয়া ছেলে। তার লখীন্দর হওয়ার কাহিনী আজ সেও জানে। জেনে শুনেই সে লখাই হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম কত কথা। দুলে বাগদী ডোম

পাড়ায় পাড়ায় শুধু এক কথা—শ্যামের ঘরে নাকি লখীন্দর। আতপুর শ্যামনগর থেকে তাকে দেখতে এসেছিল লোকেরা।

কিন্তু কেউ কেউ ছড়াল বিষ। শ্যামের বউ কালীর নামে দিল কলঙ্ক। কি ভাগ্যি, নারানের বউ কাঞ্চন তখন ডেঙ্গোডাঁটার নরম ডাঁটির মত একহারা লম্বা একটি বালিকা মাত্র। নইলে সেও হয় তো রেহাই পেত না। শেষে ব্যাপারটা ছড়াতে ছড়াতে গেল সেনবাবুদের কানে। বিচার বল, শাস্তি বল সব তো তাঁরাই করবেন। বসল পঞ্চায়েতে, বিচার করলেন স্থানকর্তা। শ্যামবাগদী চিরকাল সেনেদের অনুগত বলেই হোক বা ব্যাপারটা মিথ্যে ভেবেই হোক কিংবা লখীন্দরের চেহারা দেখে ভুলেই হোক কর্তারা রায় দিলেন শ্যামের পক্ষে। যারা দুর্নাম রটিয়েছিল, তারা অপরাধ স্বীকার করল। কেবল জরিমানা হল দু-জনের। হরি কানা আর দাশু মালার। হরি কানা কানা নয়। ওদের বংশের এই নাম। জরিমানা হল এক একজনের দু'ধামা চাল আর দু'গণ্ডা করে ডাব আর চারগণ্ডা করে পয়সা। পরে অবশ্য ঐ চারগণ্ডা পায়সা অনেক কাকুতি মিনতি করে মাপ হয়েছিল। বৈশাখের পয়লা দিনে সকলের মিলিত ধর্মপূজোয় জরিমানার দ্রব্য দিতে হয়েছিল তাদের, আর লখায়ের বিরাট শরীর সুন্দর স্বাস্থ্যের সম্মান দিয়ে বাবুরা তাকে প্রহরী নিযুক্ত করেছিল অন্তঃপুরে প্রবেশের বাইরের দালানে। শ্যামের জীবনে নতুন সৌভাগ্য। মা মনসার বরপুত্রকে ঘরে তুলেছে যে সে!

সে কথাও আজ জগদ্দল সেনপাড়ার মানুষেরা ভুলতে বসেছে। আস্তে আস্তে একথাও কালো দুলের গল্পের ঝুলিতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। ওপাড়ের সিরাজী পীরের দিকে তাকিয়ে আগুরী

পাড়ার ঘাটে বসে তাকে বলতে শোনা যায়, 'হাঁ গো, নিজের চোখে দেখেছি লখায়ের সারা গায়ে মা মনসার পেঁচিয়ে জড়িয়ে ধরার দাগ। জোয়ারের মুখে হুই জঙ্গলপীরে আটকে বিষহারিণী বিষ তুলে ভাটার টানে এই তো দে গেল রাজবাড়ীর ঘাটের ধারে।' একটা নয়, অনেক জগদ্দলের মানুষরা লখাইকে ভয়ও পেত। মা মনসা নিয়ে কথা! হয়ত মা-কে সে কখন কার উপর লেলিয়ে দেবে। কে বলতে পারে! আর সেনেদের বাড়ীতে তাকে যে কাজে নিল তাতে সকলেই ব্যাপারটা বুঝে নিজেদের মধ্যে একচোট মাথা নাড়ল। অর্থাৎ বাগদী গ্রাম বুঝুক বা না বুঝুক, তারা বুঝেছে, কত্তারা মনসার ছেলেকে ইচ্ছে করেই ঘরে নিয়ে তুলল। এমনি করে কারণে-অকারণে লখাইকে চেনে সবাই। জগদ্দল, আতপুর, শ্যামনগর।

একে তো নবজন্মই বলে। নাম গোত্র পরিচয়, সবই ঢাকা রইল, নতুন ঘরে নতুন মানুষ হয়ে সে জন্মাল। আজ সে লখাই বাগদী, স্যানেদের প্রহরী। ··· তবু মাঝে মাঝে তাকে দেখা যায়, প্রহরী অবস্থায় বড় পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ঝাড়লণ্ঠনের দিকে চেয়ে থাকে, নয়ত শ্যামের ঘরের দাওয়ায় গালে হাত দিয়ে বসে কি যেন ভাবে। ডাকলে সাড়া নেই, খাওয়া ভুলে যায়, নাওয়া ভুলে যায়। সবাই বলে, মায়ের সঙ্গে কথা বলছে। ··· না, কথা সে বলে না। কয়েকটা ছবির ছেঁড়াছোঁড়া টুকরো অংশ মাসে মাসে আচমকা তার চোখের উপর ভেসে ওঠে। সে ছবির কোথাও ভয়াবহ যুদ্ধ, কামানের ছুটন্ত গোলার অগ্নিকণা, মাত্র একবার দেখা বিদ্রোহী সেনাপতির বীরত্ব-ব্যঞ্জক মুখ। তারপর পরাজিত বিচ্ছিন্ন এক পলাতক সিপাহী হাওয়ার আগে ধুলোর ঝড়ে জনপদের ধারে ধারে জঙ্গল মাঠ পাহাড় ভেঙ্গে ছুটে

চলেছে। আর দীর্ঘ সময় বয়ে যাওয়ার প্রহর গোণার ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত চোখের সামনে দোলে একখানি সোনার টিকলি।

কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে সেই দোলানি থেমে গিয়ে সোনার টিকলি থেকে থেকে কাঁচপাকার একখানি টিপ হয়ে জ্বলে জ্বলে ওঠে।

চূড়ামণির ডাকে লখাই গিয়ে বসল তার কাছে পাটাতনের ওপর। চূড়ামণি কল্‌কেতে গাঁজা সাজিয়ে মাল্‌সা থেকে আগুন তুলে বলল, 'এতখানি সকালেই এদিকে কী মনে করে গো লখাইদাদা? কাজে যাওনি?'

লখাই বলল, 'রাতভর তো পাহারা জেগে এলাম। এয়েছিলাম হেই বাগানে নারকেল পাড়াতে আর দু'কাঁদি কলা। কালীবাড়ী যেতে হবে একবার দুই বউকে নে। তা তুমি চ্যাব্‌চেবিয়ার দিকে কাকে খুঁজছিলে?'

বলে সে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। চূড়ামণি সরবে হেসে কল্‌কেটা এগিয়ে দিল লখাইয়ের দিকে। কল্‌কে না নিয়ে লখাই বলল, 'ওপার থেকে এপারেই এত? ভিন্ দেশে গেলে তুমি তো বউ-পাগলা হয়ে যাবে।' তারপর গলা নামিয়ে বলে, 'খুব খুবসুরৎ বুঝি?'

মুহূর্তের জন্য কল্‌কে ভুলে যায় চূড়ামণি। বউয়ের রূপবর্ণনা করতে গিয়ে ভাষার অভাবে শুধু চোখ জলে উঠল তার। রূপ বর্ণনা আর হল না। বলল, 'সে তুমি যদি দেখতে গো দাদা, কি তার নাক-চোখ নাড়ার ঘটা! খালি আমার গাঁজার কল্‌কে হাতে রাখবে, আর নৌকা নিয়ে বেরুবার সময় রোজ কাছা ধরে রাখবে।'

'আর রোজ খেয়া-পাটনিকে দেখতে গঙ্গায় ডুবতে আসবে বিহান

বেলা, না ?' বলে উঠল লখাই। চূড়ামণি হো হো করে হেসে উঠল। কিন্তু লখাই আচমকা গম্ভীর হয়ে গাঁজার কল্‌কেটা টেনে নিয়ে দমভর টানতে শুরু করে দিল। যেন হঠাৎ কেউ থাবড়া মেরেছে তার মুখে কিংবা অশরীরী জীব দেখেছে—এমনি চকিতে ছায়া ঘনিয়ে এল তার মুখে।

চূড়ামণি বিস্মিত হয়। একটা মস্ত নিঃশ্বাস ফেলে কল্‌কেয় দম দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'তা এট্টা কথা বলি দাদা। তুমি এট্টা বে' টে' করে ফেল না কেন ? কার অপেক্ষায় চুপ মেরে আছ তুমি ? এই বয়েস, এই শরীল—বউ নইলে কি চলে ? বলে, আমার এমনিতেই মনে লয় কি আরও দু'-চারটে বে' করি। আর তুমি—'

সে কথার কোন জবাব দিল না লখাই। গাঁজার দম নিয়ে চোখ বুঁজে চুপ করে রইল। এমনিতেই সে খুব কম কথা বলে, এসব কথা হলে সে একেবারেই বোবা হয়ে যায়।

চূড়ামণির চোখে খানিক সংশয় দেখা দিয়ে হঠাৎ সচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'আগের জন্মের কথা তোমার কিছু মনে টনে পড়ে লখাইদাদা ?'

আগের জন্মের ? খানিক্ষণ চুপ করে বসে থাকে লখাই। চলমান গঙ্গার জলের দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে। যেন সত্যিই মনে করবার চেষ্টা করছে তার গত জন্মের কথা। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে, কপালের শিরাগুলো ওঠে ফুলে। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'না, কিছুই মনে পড়ে না।'

গাঁজার নেশায় দুজনের চোখই লাল। আধবোজা চোখে দু'জনেই খানিক চুপ করে থাকে। তারপর চূড়ামণি হঠাৎ বলে, 'হয় তো বাপ-

মা বে' দিইছেল তোমার সাধ-আহ্লাদ করে, ছেল হয় তো তোমারও সোন্দর বউ। কিন্তু লখীন্দরের ভাগ্য নে জন্মেছ তুমি! সে জীবন তোমার কপালে নেই।'

লখাই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, 'ছেড়ে দাও ওসব কথা, ভাল করে সাজাও আর এক কলকে। খেয়াঘাটে লোক এসে পড়বে এখুনি।'

'হ্যাঁ, সাজাই', বলে কল্‌কে সাজাতে সাজাতে চূড়ামণি বলে, 'বাপের বড় সাধ ছেল মরবার আগে তোমাকে একবারটি দেখবার। রোজ রাতে মা'র কাছে তোমার গল্প করত। আর আমার কি মনে হয়েছেল জান লখাইদাদা?' বার বার লখাইকে বলা কাহিনী আবার সে শুরু করে। সে তাকে অশরীরী প্রেত ভেবেছিল। সব কথা জানা সত্ত্বেও ক' রাত্রি তার মোটে ঘুম হয়নি। মাঝ-গঙ্গায়, ঝোপেঝাড়ে কেবলি সেকথা মনে হয়েছে, মনে মনে 'রাম'কে ডেকে থু থু ছিটিয়েছে বুকে। আবার কল্‌কে সাজানো হয়, দু'জনে টানে। ওদিকে কাঁচা রোদে হেসে ওঠে গাছপালা, মাঠ নদী।

হঠাৎ চূড়ামণির নজরে পড়ে ওপারের ঘাটে কলসী কাঁখে এক বউ জলের ধারে দাঁড়িয়ে। নজর পড়ে লখাইয়েরও। সে চূড়ামণির পিঠে চাপড় মেরে বলে, 'নাও, ওদিকে রাজবাড়ীর মেজকর্তার আর্দালি এসে পড়েছে। চটপট পার করে দাও। পারানি দেখানি তুই-ই হবে।' বলে হাসতে হাসতে নৌকা থেকে নেমে পড়ল সে। চূড়ামণি হেসে উঠল হো হো করে।

৩

নারকেল আর কলা নিয়ে ইতিপূর্বেই শ্যামের ছেলে মধু চলে গিয়েছিল। লখাই এসে বাড়ীতে পা দিতেই শ্যাম বলদজোড়া ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। একমুহূর্ত দেখল লখাইয়ের মুখের দিকে. তারপর বলল, 'এট্টু ঘরোয়াভাবের তুমি হও দি'নি বাপু। ছাড়া পেলে তো দেখি তোমার কিছু মনে থাকে না। মধু এল সেই কখন, আর তুমি আতপুরের ঘাটে এতক্ষণ করছিলে কী?'

একমুহূর্তেই লখাই বুঝতে পারল, শুধু কালী বৌঠান নয়, কাঞ্চন-বউয়ের দুরন্ত ক্রুদ্ধ চোখও কোন বেড়ার ফাঁক থেকে তাকে বিঁধছে। বলল, 'ওই চুড়োর সঙ্গে এট্টু—'

ঢেঁকিঘরের পাশ থেকে আচমকা বটির কোপের মত কালীর তীক্ষ্ণ গলা ভেসে এল, 'কাল্‌কে সেবা করে এলাম, কেমন? আর আমরা যে ইদিকে দুটো মাগী উপোস বসে আছি পূজো দিতে যাব বলে, সে জানা কথাও কি গাঁজায় দম মেরে দিয়েছ? ছাখো তোমরা, মিন্‌সের চোখ দুটো একবার ছাখো!' হ্যাঁ, এমনি কথা কালীর। চেঁচিয়ে রেগে কথা বলা তার অভ্যাস। সে যে-ব্যাপারই হোক, রাগের না হোক হাসির, প্রকাশ্যে না হোক গোপনীয়, কালীর গলাই এমনি চড়া। মনে হবে মারতে আসছে বুঝি। একসময়ে পাড়ার লোকে উঁকিঝুঁকি মারত, এখন আর মারে না। এতো খুবই সামান্য। পাড়াঘরে ঝগড়া-বিবাদের সময় সে যে-কোন কারণেই হোক একবার যদি কালী সেখানে গিয়ে পড়ল তবে আর রক্ষে নেই। কালীই বটে,

স্মারা জগদ্দল গাঁ চমকে ওঠে তার গলায়। আর সরস গালি দিতে তার জুড়ি মেলানো ভার। মদন কৈবর্তের মা, অথবা অমন যে বাক্‌পটিয়সী ডাকাতনি, সেও 'গালে হাত দিয়ে বলে, 'মা গো, মাগী কি সব কথাই আমদানি করেছে বোদাই থেকে।' অর্থাৎ কালীর বাপের বাড়ী হল বরুতিবিলের পূবে বোদাই গাঁয়ে। তা ছাড়া লখায়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কালী মেজাজ রাখতে পারে না। লখায়ের রা কম, মুখে যেন মেঘের ভার। ডাকলে মিনসের চোখ তুলতেও কি-না এক পোহর লাগে! প্রথম প্রথম ভেবেছিল, নতুন বলে এমন। পুরনো হলে কেটে যাবে এসব। মধু তখন পেটে, শ্যাম থাকে ঘাটেমাঠে, নারান তো ডাকাবুকো মানুষ। খানেদের দপ্তরের বন্দুকধরা পাহারাদার। লখাই দেবর পেয়ে প্রাণটা তার খুশিতে ভরে উঠেছিল। ওমা! কাজ করে তো কাজই করে, খায় তো খেয়েই চলে, বসে থাকে তো সারাদিন বসেই কেটে গেল। এ কি মানুষ গো! কথা নাহয় না বলতে পারে, বোঝবার চেষ্টাও তো করবে। মা গো! এত যে ঠাট্টা মাট্টা করি, হেসে গইড়ে কথা বলি বোঠানের সে মর্ম কি ছাই ও কিছু বোঝে? যেন এই সেদিন পেট থেকে জমলো ছেলে, হাঁ করে চেয়ে থাকে। কি জ্বালা বল দিকিনি! ··· জ্বালাই না বটে। সে জ্বালাতেই লখাইকে গড়ে পিটে তুলবে বলে দিব্যি কেটে বসল কালী। শুতে বসতে লখাই, খেতে ধুতে লখাই—মায়, শ্যামের সঙ্গে ঝগড়া পর্যন্ত। আর এ গাঁয়ের কোটনা কুটনীর মরণ নেই, তাই লখাইয়ের সঙ্গে তার পিরীত জমার ঢাক পেটায়। তাই শুনে শ্যাম গম্ভীর হয়ে থাকত, থমথমে হয়ে থাকত তার মুখ। এ সব যখন কালীর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন বাড়ীর পেছনে একদিন জামরুল তলায় সকলের আড়ালে শ্যামকে

দু'হাতে সাপটে ধরে বুকে মুখ রেখে বলল, 'তুমিও কি তবে অবিশ্বেস কর আমাকে ?'

আর নারান সর্বজ্ঞ কি-না জানা নেই, কে জানে সে লখাইয়ের মনের এ বিভ্রমের কথা জানে কি-না! তা ছাড়া, কাঞ্চনের প্রতি তার সে প্রাণের টানও দেখা যায় না। তবু তারই প্রতি মনসার কোপের আশঙ্কায় যে-লখাইকে ঘরে এনে তোলা হল, তার সঙ্গেই নারানের কেমন যেন একটা মস্ত ফারাক থেকে গেল। লখাইকে সে প্রথম প্রথম চাপা বিদ্রূপে কিছুটা তুচ্ছ জ্ঞানই করেছে, তারপর থেকে কবে যেন একটা চাপা বিদ্বেষভাব ছড়িয়ে দিয়েছে তার মনে লখাইয়ের বিরুদ্ধে। লখাইয়ের প্রসঙ্গ সে শুধু এড়িয়ে যায় না, অপরকে অবাক্ করে দিয়ে হঠাৎ কটূক্তি করে বসে। ··· সে কথা আর কতদিনকার আগের যেদিন বালক মধুর সামান্য সোহাগ কথায় হঠাৎ নারান তাকে এক থাপ্পর কষিয়ে বলে উঠেছিল, 'ঘরে কি তোর খুড়ো একটা যে, আদর করতে এসেছিস আমার সঙ্গে ?'

শ্যাম শান্ত মানুষ। লখায়ের সঙ্গে কালীর সম্পর্ক তার বুকে নতুন আনন্দ এনে দিয়েছে। নারান তার সহোদর ভাই, কালীর সাক্ষাৎ দেওর। কিন্তু নারান যেন ঘরে থেকেও বাইরে। আপনার হয়েও পর। অমন সুন্দর কাঞ্চন বউয়ের মুখ চাইতে যে চোখ ফিরিয়ে থাকে, সে মানুষ কালীর কাছে ভুলেও দুদিন সোহাগ কাড়েনি, ধার ধারেনি গাল গল্পের। তার মজলিস অন্যখানে, মনের খেয়ালের সাধ মেটাতে ঘোরে বাইরে। সেদিক থেকে, পর হয়ে'ও পর থাকেনি যে লখাই, কম কথার মানুষ হয়েও আপন মানুষ কালীকে চিনতে তার ভুল হয়নি। সে বললে, 'তুই কি পাগল হয়েছিস বউ? তবে গাঁয়ের

এ মিছে রটিয়েদের একবার আমি দেখে নেব। আর এসব যদি সত্যি হত, তবে শ্যামেদের পদ্মপুকুরের পাড়ের মাটি কি এতই শক্ত হয়ে গেছে যে, দু' হাতে ধরে তোকে আমি পুঁতে দিতে পারব না ?'

সে কথা শুনে শিউরে উঠেছে, কালী, কিন্তু শান্তি পেয়েছে। শ্যাম তাকে বার বার বলে দিয়েছে,তোর লখাই দেওর মা মনসার বর পাওয়া ছেলে, যে যাই বলুক, পেটের ছেলের চেয়ে ওর আদর কম নয়! সেদিন ঘরের ছেঁচে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য শত্রুকে উপলক্ষ্য করে প্রায় সারা-দিন কালী তার নতুন পুরনো গালাগালি ও শাপ-মন্যিতে জগদ্দলের আকাশ ভরে তুলেছিল।

আর লখাই যে দেশেরই মানুষ হোক, তবু মানুষ তো! কালীকে বুঝতে তার বেশি দেরি হল না। বৌঠান হয়েও কালী তার কাছে মার চেয়েও বড় হয়ে উঠল। শ্যাম বিচিত্র নীরবতার মধ্যে এক অসীম স্নেহবন্ধনে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ল সে এদের কাছে। পলাতক সিপাহী লখাই বাগদী হতে আর দেরি হল না।

কেবল তার বুকে নতুন করে শ্বাস আটকে দিল দিন দিন বেড়ে ওঠা নারানের বউ কাঞ্চন। থেকে থেকে তার কপালের কাঁচপোকার টিপের ঝিলিক তার সব চিন্তা এলোমেলো করে দেয়। ভাবে, ওই টিপ কি সোনার টিকলি হয়ে দুলতে পারত না! না কি বুঝি টিকলিই কাঁচপোকার টিপ হয়ে গেছে।'...

আধ ধামা মুড়ি, খানিক গুড় নিয়ে কাঞ্চন ধপাস করে বসিয়ে দিয়ে গেল দাওয়ার উপর। বাগ্দী মেয়ে কাঞ্চন কিন্তু রূপের তার ধার যেন বড়ঘরের মেয়ে-বউদেরও হার মানায়। মানুষটা দেখতে ছোট, কিন্তু কালীর কাঞ্চী বউ কিংখাবে লুকিয়ে রাখা ছুরির মত শক্ত

ও ধারালো। যেখান দিয়ে যায় সেখানে দাগ রেখে যায়! মুড়ির ধামাটা বসিয়ে দেওয়ার মধ্যেই সে তার সব রাগটুকু প্রকাশ করে গেল। শ্যাম রয়েছে তাই গলা খুলতে পারল না সে। নইলে বুঝি লখায়ের রক্ষা ছিল না।

মুড়ি দিতে দেখে কালী বলে উঠল, 'হ্যাঁ, মুড়ি খেয়ে দাওয়ায় পড়ে পড়ে ঘুমোও। নেশাও জমবে, রাত জাগার বিশ্রামও হবে।' বলে সে দুড়দাড় করে করে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

শ্যাম বলল, 'নেও, মুড়ি কটা ঝট করে চিবিয়ে নে বেইরে পড়, আর দেরি ক'রো না। নাইতে হয়, কালী বাড়ীর ঘাটে দুটো ডুব দিয়ে নিও।'

কিন্তু লখাই তো কালীবউয়ের শুধুমাত্র বাধ্য দেবর নয়, সম্পর্কের তল তাদের আরও গভীর। তার নতুন জীবনের ভাবনা চিন্তার গতি, রাগ-অভিমান চলা-ফেরা যা-ই বল, সমস্ত কিছুর নিকটতম সম্পর্ক কালীর সঙ্গেই তার। যেমন নাকি ঝড়-ওঠা নদীতে সব মাল্লা পারে না নৌকো সামলাতে, সব মাটির চরিত্রের হদিস পায় না সব চাষী, তেমন লখায়ের জীবনের হাল ধরতে পারেছে শুধু এক কালীবউ। স্বল্পভাষী লখাইয়ের মনের স্রোতের ধার বোঝে মাত্র সে-ই। শুধু সে নয়, পরস্পর। পেটের ছেলে মধুর সব খুনসুটি সবসময় ঠাহর করতে পারে না কালী, কিন্তু এই পনর বছর ধরেও যে মিন্‌সে শিশু রয়ে গেছে, তার সব কিছু তার নখদর্পনে আর লখাইও সেই নখদর্পণেই শুধু মন খুলে দেখা দেয়। কালী লখাইকে বড় হতে দেয়নি, লখাই চায়নি বড় হতে, বড় হলে বোধ করি কালীবউয়ের যমুনার মতো কালো ঢলঢলে শরীরটার মধ্যে লুকোনো মমতাময়ী-মনের বিচিত্র গতিবিধি চকিতে ধরতে পারত না সে।

কালীবউয়ের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকাতে গিয়ে বড় ঘরের ছেঁচাবেড়া কাটা জানালায় তার চোখ আটকে গেল। রোদ পড়া জানালার কঞ্চির এলোমেলো ছায়া পড়েছে কাঞ্চনের মুখে। বাঁকানো ভ্রূর মাঝে কপালের চামড়া বেঁকে টিপ খানিক সরে গেছে, তলার ঈষৎ দুই বড় চোখের দৃষ্টিতে কি দুরন্ত অভিমান, আক্রমণের অভিসন্ধিতে সে কটাক্ষ বঙ্কিম, যেন সবাক। টেপা ঠোঁটের কোণের রেখাটিতে শুধু থেকে থেকে বিচিত্র খেলার কাঁপুনি।

কালীবউকে সে বুঝতে পারে কিন্তু কালীর কাঞ্চীবউকে সে বুঝতে পারে না। যা বোঝে, সেটা বোঝা নয়, জট পাকিয়ে ওঠে ক্ষণে, ঝড় ওঠে বুকে। গাছপালা উপড়ে-ফেলা এক মহা ভাঙ্গনের সর্বনাশা ইঙ্গিত পায় সে। সেদিনের মেয়ে কি এক জাদু বলে যেন জগৎ-জুড়ে মাতন লাগিয়েছে। কিন্তু হায়, তুমি তো জান না কাঞ্চীবউ, এই পলাতক যোয়ানের উপবাসী অন্তরের কথা। তুমি নিজের ঐশ্বর্য-গরিমায় গরিয়সী, দীর্ঘদিনের কটাক্ষে কটাক্ষে কেবলি যে ক্ষতের সঞ্চার করছ, সারা বাংলার সব নদীর প্লাবনেও তা শান্ত হবার নয়। অমন করে মেরো না আমাকে। আমি তোমাদের মা মনসার ছেলে, নারান আমার দাদাভাই কিন্তু তোমার কাঞ্চনবর্ণের ধার দিয়ে একি রক্তাক্ত খেলা শুরু করেছ তুমি?

তবু হায়, চোখ ফেরে না। কতদিন কালীবউ কত ঠাট্টা করেছে। সে ঠাট্টা চাপা আগুনে ফুঁ দিয়ে উস্কে তুলেছে লেলিহান শিখা। কালী ঠাট্টা করেছে, কাঞ্চন তাকে দুহাতে সাপটে ধরে গুম গুম্ করে কিলিয়েছে আর সেই গুম্‌গুম্ শব্দের সঙ্গে কাঞ্চনের কাচা হাসির খিল্‌খিল্ শব্দ এক বিচিত্র রং-এর পাকা ছোপ ধরিয়ে দিয়েছে বুকে।

সেনবাড়ীর মেরজাওস্তাদের সুললিত কণ্ঠের সেই গানের কলি রিনরিন করে বেজে উঠেছে কাজে,

'অয় গুল্ তেরি আঁখমিচোলি দিল্ মেরা কাটতি হ্যায়।

খুসবাশ্‌শে তেরি ছিপ্‌ছিপ্‌কে দিল মেরা রোতি হ্যায়!

সে গান শুনেই না কর্ত্তা হুকুম করেছিল কয়েদখানার সেপাইকে খির-পাড়ার পবন চাড়ালকে খালাস দিতে! দুঃসাহসী নরাধম পবন চাঁড়াল মহেশ চাঁড়ালের বিয়ের আসর থেকে তার কনেবউকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সে মেয়ের সঙ্গে তার জন্মকালের পিরীত। সেনবাড়ীর লাঠিয়াল বলে অহঙ্কারে জোর করে সে মেয়েকে বিয়ে করবে মহেশ চাঁড়াল। সমস্ত খিরপাড়াকে অবাক করে দিয়ে কনেবউয়ের হাত ধরে তুলে নিয়ে এল সে। বলল, 'কার ক্ষমতা আছে, এসো লড়বে আমার সঙ্গে, এ বউ আমার।'

কি সর্বনাশ! হোক্ ছোটজাতের কাণ্ডকারখানা, ঘটনা শুনে সারা হালিশহর পরগণাটাই ভয়ে ঘৃণায় রাগে সিটিয়ে উঠেছিল। পরের কনেবউকে বিয়ের আসর থেকে তুলে নিয়ে গেল নিজের বউ বলে!

ভাটপাড়ার শিবমন্দিরের রকে ধর্মরক্ষী বৈদিকদের পর্যন্ত আসর বসে গেল। এক সর্বনাশা বিপদের গন্ধ পেয়েছেন তাঁরা। তাঁদের আলোচনার মধ্যে খালি উত্তেজনা নয়, শঙ্কার ভাবও সুপরিস্ফুট। কেন না, তাঁরা যে জানতেন, দেশের এ অবনতি ঘটবেই। বিশেষ, জগদ্দল সেনপাড়ার যত ম্লেচ্ছ জায়গায়। ওখানকার যত পিরুলী বামুনেরাই তো এসবের প্রশ্রয়দাতা। জাত-মান খোয়ানো মুসলমানের দরবারী নফর ওই পিরুলীদের উস্‌কানিতেই ছোটজাতের এই স্পর্ধা। কেউ

কেউ কাঁটালপাড়ার হাকিম চাটুয্যের কথা বলতেও ভুললেন না। যে বিধর্মীর ইংরেজীয়ানা বাংলা কেতাবে যে সমস্ত অখাদ্যকুখাদ্য পরিবেশন করতে শুরু করেছে তাতে সমাজেরও সাংঘাতিক অবনতি ঘটবে—এতে আর বিস্ময়ের কি আছে।

সে দিল কাটারও শেষ নেই, কান্নারও শেষ নেই। শেষ নেই গোলাপের চোখের লুকোচুরি খেলা, ঘামগন্ধ ছড়াবার। সে তো গোলাপের ধর্ম, ধর্ম কাঞ্চনবউয়ের। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে, কোমরের গামছা খুলে মাথায় বেঁধে সে কালীবউয়ের উদ্দেশ্যে হাঁক দিল, 'আর দেরি নয় বোঠান্ জল্‌দি চল।'

শ্যাম বলল, 'দেরি হতে আর বাকিটা কি আছে। মুড়ি ক'টা চিবেই নেও। ফিরবে সেই কোন্ পহরে তার ঠিক কি? ওদিকে পূজো বসে গেল বুঝি।'

গম্ভীর মোটা গলায় লখাই বলল: 'উপোস আমিও থাকব, পূজো হলে পেসাদ খাব।'

শ্যাম বোধ হয় এটুকু আঁচ করেইছিল। ঘরের দরজার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল সে। বুঝল, রাগ ঝামেলা মিটল এতক্ষণে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার গরুর সেবায় মন দিল সে। ওর গোঁফের পাশে লুকনো হাসির হাদিস পেল না কেউ। মনে মনে সে লখাইয়ের তারিফ করে। কম কথা বলে, থাকে গম্ভীর, সব সময় লখাইয়ের ভাব বোঝা তার দায় হয় সত্যি, কিন্তু ঠিক সময়ে যথার্থ কথাটি বলে এরকম অনেক সমূহ প্রলয়কে বশ করে ফেলতে জানে লখাই। বিশেষ করে কালীবউয়ের মনের অলিগলির সব ফাঁকগুলো এমনি আয়ত্ত করে নিয়েছে সে।

হাসির দমকেই হোক বা রাগের উত্তাপেই হোক জানালা থেকে মুখ লুকাল কাঞ্চনবউ।

তবু সবাইকে চুপচাপ থাকতে দেখে শ্যাম খানিকটা আপন মনেই বলল, 'বোঝ সেটা তোমরা ভাজ-দেওরে। তবে যা করতে হয়, একটু তাড়াতাড়ি কর, রোদে তো উঠোন ভরল দিকি।'

ঘর থেকেই শোনা গেল কালীর গলা, 'ভরুক। রোদ তো কারুর মর্জি মেনে চলে না আমাদের মত। কই লো কাঞ্চী, তরকারি কি আছে কেটে কুটে নে, আমি উনুনে আগুন দিই, ভাত ডাল তো রয়েইছে কালকের।' তারপর এক মুহূর্ত চুপ থেকে আবার বলল, 'সোহাগ দেখে আর বাঁচি না!'

দুই বউ উপোস থাকবে, তাই গতকাল রাত্রেই ভাত ডাল রান্না করে রাখা ছিল। ছিল না কিছু তরকারি বেগুন। কথা ছিল, আম আর জলপাই আচারের টাকনা দিয়েই পুরুষেরা ভাত খাবে।

কপট বিপদে শ্যাম তাকাল লখাইয়ের দিকে। কিন্তু সে তো জানে তার ঘাড়েপিঠে করে মানুষ করা কালীবউয়ের মন। বুঝল, আরও খানিক মনোকষ্টের ভোগান্তি আছে তার লখাই ভাইয়ের।

লখাই সোজা ঘরে ঢুকে দেখল কালীবাড়ী নিয়ে যাওয়ার ফল মূলের ধামাটার কাছে কালীবউ বসে আছে মুখ ফিরিয়ে। অদূরে তেল সিঁদুরে মাখামাখি লক্ষ্মীর মূর্তির কাছে কাঞ্চন বসে আছে কালীর দিকে চেয়ে। বোধ হয় তারা চোখেচোখেই তাকিয়েছিল।

লখাই বলল, কালীবউয়ের পিঠের দিকে তাকিয়ে, 'জঙ্গলপীরে নতুন বিয়নো গাইয়ের দুধও তো দিয়ে আসতে হবে। খালি কি তোমাদের কালীবাড়ীর পূজোই নাকি?'

কালীবউয়ের মুখ দেখা গেল না, গলা শোনা গেল ; 'ঢং রেখে মুড়ি খেয়ে নিতে বল্ কাঞ্চী।' জঙ্গলপীরে দুধ দিতে হয়, মধু দে আসবে।'

কাঞ্চন ঠোঁট টিপে নিস্পলক তাকিয়ে ছিল লখায়ের দিকে। না, তার লজ্জাও নেই, ভয়ও নেই অতবড় পুরুষটাকে। ভাসুর নেই সামনে, এখন সে আসল মূর্তিতেই বিরাজ করছে। বলল ঠোঁট বাঁকিয়ে, 'মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না এসব মানুসের। বলতে হয় তুমিই বল।'

কাউকেই বলতে হল না। লখাই আবার বলল, 'মুড়ি খাব না বললুম তো সে কথা।'

মুখ না ফিরাইয়াই বলল কালী, 'বলি—কেন, কেন ?'

জবাব দিল কাঞ্চন ভ্রূ তুলে, 'উপোস দেবে।'

কালী বলল, 'কোন্ দুঃখে ?'

অপাঙ্গে লখায়ের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল কাঞ্চন, 'বোধ হয় তোমার দুঃখে।'

ঝেঁজে উঠল কালী, 'আহা, মরে যাই আর কি। আরও দুটো দম্ দিয়ে আসতে বল্ গাঁ্যাজায়।'

কাঞ্চন কটাক্ষ আরও দুর্জয় করে বলল, 'চুড়োপাটনির নতুন বউয়ের চাঁদমুখের কথা বললে না ?'

ওই একটি কথাতেই কালীর রাগের লক্ষ্যস্থল পাল্টে গেল। শ্যামকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল সে গলা খানিক বাড়িয়ে, 'তোর ভাসুরের তো সে কথা কানে যাবে না, আমি মাগী চেঁচে মরলে আর কি হবে।'

'কত বললুম যে, মিনুসের বে দেও, ঘরে ওর মন বসুক, সম্‌সার

করুক, তবে ওর টান বাড়বে। এখন এ ঘরে ওর টান হবে কোন্ দুঃখে, ওর আছে কে?'

লখাই এবার গম্ভীর গলায় আরও খানিক ঝাঁজ মিশিয়ে বলল, খালি বকবে, না, কি, সব ফেলে ছড়ে দিয়ে আসব। পূজো কি তোমাদের জন্যে বসে থাকবে?'

কালী নিশ্চুপ, কাঞ্চন বলল, 'দেও না ফেলে ছড়ে, দেখি একবার ক্যামতা?'

হ্যাঁ, কাঞ্চনের বোধ করি লখাইয়ের ক্ষমতার দৌড় দেখবার সাহসী অহঙ্কার আছে। নইলে চকিতে কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে সে চোখ ফেরাবে কেন? কিন্তু সে সোজাসুজি কখনো কাঞ্চনের সঙ্গে কথা বলে না। কথার আড় খোঁজে, নয় তো শুধু চোখের ভাষাতেই কথা বলে। কালী তাদের দেওর-ভাজের সম্পর্ক স্থির করে দিলেও তারা দেওর-ভাজে এখনো স্থির করে উঠতে পারেনি।

শ্যাম এবার ধম্‌কে উঠল বাইরে থেকে কালীর উদ্দেশে, 'নে বাপু, যেতে হয় যা, নয় তো থাক্। ওদিকে পালির দুধটুকু বরালের পেটে গে বসে থাকবে। পাঠাতে হয়, পাইটে দে মধুকে জঙ্গলপীরে।'

কাঞ্চন আর কালী চোখাচোখি করে হাসল মুখ টিপে। কালী বলল এবার লখাইকে উদ্দেশ্য করে, 'খুব বুঝেছি ঢং তোমার, মুড়ি কটা খেয়ে নেওগে, তা'পর যাব।'

'না।' মাত্র এক কথার জবাব দিল লখাই এবং আর সকলে

বুঝল, এ না-এর আর কোন নড়চড় হবে না। সে পূজোর সামগ্রীভরা ধামা কাঁধে তুলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

কাঞ্চন বলল, 'মা মনসার গোঁ যে!' বলে সে হেসে উঠল খিল্‌খিল্ করে।

শুধু করুণ হয়ে উঠল কালীর গলা, 'গ্যাখ দিনি কাণ্ড, সারারাত পাহারা জেগে এখন আবার উপোস। এসব মানুষকে দুটো কথা বলে নিজের পোড়ানি।'

যাওয়ার সময় বায়না ধরল মধু যাওয়ার জন্য। কিন্তু শ্যামের এক ধমকেই থেমে গেল সে। চৈত মাসের এ রোদ মাথায় করে কি দরকার ছেলের যাওয়ার।

ঘরে বড় গুমোট, বাইরেও রোদ বটে। কিন্তু মিষ্ট হাওয়ায় প্রাণ যেন জুড়িয়ে যায়। আম গাছে বোল ধরেছে, কোন কোন গাছে ছোট ছোট আমে উঠেছে ভরে। ঝরা রুক্ষ বট অশ্বত্থের ডালে ডালে নতুন পাতার চকচকানি। মস্ত কুকুরীর পেটে ছোট ছোট বাচ্চা ঝুলে থাকার মত এঁচোড় ঝুলছে কাঁঠালগাছে। চক্রবর্তীদের বাগানে বসন্তের পাখীর বারোমাসের আস্তানা। চৈত্র সকাল পাখীর গানে সুরের দোলায় ঝুলছে।

বাগান পেরিয়ে মুসলমানদের গোরস্থানের ধার দিয়ে দক্ষিণ কোণের পথ ধরল লখাই। পেছনে কালী আর কাঞ্চন। কালীর ঘোমটা কম, কাঞ্চনের ঘোমটা একটু বেশি। সেনপাড়া পেরিয়ে কাঞ্চনের ঘোমটা উঠে গেল অনেকখানি। রোদে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে তার সুন্দর মুখে। কিন্তু ক্লান্তির চিহ্ন নেই তাতে। চোয়াল খানিক চওড়া, চাকাপানা মুখ। তার সারা অঙ্গে অনমনীয় বলিষ্ঠতার ছাপ, কিন্তু

রমণীয়। চওড়া গড়ন, একটু খাটো কিন্তু সেটুকুই যেন তাকে মানিয়েছে। চোখ তার বড় নয়, টানা টানা। চোখের কোণ বেঁকে উঠেছে উপর দিকে ভ্রূর শেষ প্রান্ত স্পর্শ করার জন্য। সেই জন্য স্বাভাবিক ভাবেই তার কটাক্ষ যেন দুর্জয় হয়ে উঠেছে। একটুকু বা নিষ্ঠুরতা যেন সেই বঙ্কিম রেখায় ফুটে রয়েছে। নাক খানিক বোঁচা, কিন্তু সরু বলে মনে হয় না বোঁচা বলে। গায়ে আভরণ বিশেষ কিছু নেই রূপোর আর কাঁচের কিছু চুড়ি ছাড়া। এয়োস্ত্রীর নাকের সোনা খোয়াতে নেই, তাই এক চিমটি সোনার ঝুটো নীল পাথরের নাকছাবি নাকে। রোদে তার কাঁচপোকার টিপ অস্থির চকমকানিতে জ্বলছে।

কালী ঠিক কালী নয়, তেল দিয়ে পোঁছা বেগুনের মত তার গায়ের রং, চলতি কথায় দলমলে চেহারা তার। শরীরটা খানিক বিশালই বটে, আঁট একটু কম। মুখের শ্রীটুকু যেন এক কিশোরী মেয়ের। বড় বড় এক জোড়া কালো চোখে বিয়নো গাইয়ের শান্ত ভরাট দৃষ্টি। শাঁখা আর নোয়া ছাড়া তার আর কিছু নেই। নাকে সোনার সরু তারে রূপার নোলক উপর ঠোঁটের মাঝে একবিন্দু ঘামের মত দুলছে। রূপোর গয়না যা কিছু আছে মধুর জন্মের পর তা সে খুলে রেখেছে। অল্পতেই কালী হাঁপিয়ে পড়ে, গায়ের কাপড় ভিজে ওঠে ঘামে। একটু চলেই মনে হয় যেন কত রাজ্যি পেরিয়ে এসেছে সে।

আতপুরের ঘাটের কাছাকাছি আসতেই পা যেন তার অবশ হয়ে এল। মাগো! লখাইটা কি মানুষ না পাথর। কাঁধে ধামা নিয়ে যেন ছুটছে। পিছনে যে দুটো মেয়েমানুষ, তা বোধ হয় ভুলেই গেছে। বলল, 'ওরে কাঞ্চী, মিনসেকে দাঁড়াতে বল্, ওর মত তো আমার দস্যির পা নেই।'

লখাইয়ের পেছন ধাওয়া করতে গিয়ে কাঞ্চনেরও নিঃশ্বাস একটু দ্রুত হয়ে উঠেছে। তবু বলল কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত, 'মোনসার ছেলেকে খেইপেছ, মিন্‌সে কি না ভুগিয়ে ছাড়বে ?'

'কিন্তু উপোস দে অমন ডাকাতের মত হাঁটতে পারব না বাপু আমি।'

লখাই ততক্ষণে আতপুরের ঘাট পেরিয়ে জঙ্গলপীর ধরো-ধরো। কালী বলল কাঞ্চনের হাতের দুধের পালি দেখিয়ে, 'ওখানে দুধ দিতে হবে, থামতে বল্ ওকে।'

কাঞ্চন বলল, 'থাক্ না, দুধ কি আমরা দিতে পারব না ?'

আতপুর ঘাট থেকে এবার চুড়োপাটনীকে দেখা গেল। সে হেঁকে উঠল, 'ক্যা, শ্যামদাদার বউ নাকি গো ?'

কালী কথা বলে চুড়োর সঙ্গে। শত হলেও চুড়ো যে অনেক ছোট, কত বার কারণে-অকারণে তাদের বাড়ী গিয়েছে। কালী তাকে বলেছে তুই তোকারি করে। বলল, 'হ্যাঁ।' চুড়ো আড়চোখে কাঞ্চনের দিকে দেখে বলল, 'তোমাদের পাহারাদার যে জোড়ুতে লেগেছে, এই তো, দে আসব নাকি ?'

কালী দাঁড়িয়ে পড়ল। এবার তার রাগ হয়েছে। বলল, 'গ্যাখো দিনি কাণ্ড। মেয়েমানুস নে বিহার কি ষাঁড় দৌড় শুরু করেছে। আমি তো আর পারি নে। তা বলে তোমাকে—এই গে—দে আসতে হবে না। হাঁক দেও দিনি ওর নাম নে।'

চুড়ো গলুইয়ের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'হুই লখাই দা—দা !'

দীর্ঘপাথরের মূর্তি ফিরে দাঁড়াল। হাওয়ায় উড়ছে তার বাবড়ি চুল। খালি গায়ে রোদ পড়ে কালো অঙ্গে রূপোর ধার লেগেছে।

কালী হাত তুলে থামতে বলল তাকে।

জবাবে সে পেছন ফিরে আরও কয়েক পা এগিয়ে বসে পড়ল।

কিন্তু কালীও হাঁটু মুড়ে বসল। লখাইয়ের নামে অভিযোগ পেড়ে বসল চুড়োর কাছে। বলল, 'তোমার গাঁজার টানেই ও রোজ আসে এখেনে?'

চুড়ো চোখ পিট পিট করে বোকার মতো হাসতে থাকে।

কাঞ্চন বলল ফিসফিসিয়ে, 'নোক ডেকে নতুন বউ দেখাতে চায়।'

কাঞ্চনের ইচ্ছানুসারেই সেকথা শুনতে পেল চুড়ো। হেসে বলে, 'সে তো ওপারে গো নারান ঠাকুরাণী।' আর তোমাদের লখাই দেওরকে কতবার বলেছি যেতে, যায়নি। কেন যাবে বল?—' সে টিপে টিপে হাসতে লাগল আড়চোখে দুই বউকে দেখে।

দামাল কাঞ্চনও জবাব দিল ঘোমটার ফাঁক থেকে তার চোখের কোন্ দিয়ে।

কালী বলে, 'কেন?'

খুশির দমকে ট্যাঁক থেকে গাঁজার ড্যালা বের করে বলে, 'ঘরে অমন দুই ভাজ রয়েছে যে!'

'আ মরণ!' নোলক নাড়িয়ে ঘাড় বাঁকাল কালী। তারপর দুই জা'য়ে হেসে কুটিপাটি হল। হাসতে হাসতেই উঠল তারা আবার।

চুড়ো বলল, 'তা, হ্যাঁগো বোঠান, তোমাদের লখাই দেওরকে বে-টে দেবে না নাকি? অমন যোয়ান কার্তিকের মতন পুরুষ। বিবাগী হয়ে না চলে যায় ও। বয়সের একটা ধম্মো আছে তো?'

কালী বলল, 'বলে নাকি কিছু?'

'এর আবার বলা লাগে নাকি? তোমাদের চোখ নেই? কথা বলে

না, গুম খেয়ে বসে থাকে, কেবলি ভাবে, বোঝ না তোমরা?' কথাগুলো সরল আর দুঃখের সঙ্গেই বলল চুড়োমণি, 'তোমরা বড় নিদ্দয় বাপু।'

কথাটা লাগল কালীর। বলল, 'মধুর বাপ—তোমাদের দাদাকে বলো ভাই, আমি তো মুখ পইচে ফেলেছি।' তারপর গলা খাটো করে বলল, 'আমাদের জাতের মধ্যে যে কেউ রাজী নয় মেয়ে দিতে। বলে, কি জাত, কার ছেলে। ল্যাঠাও কি কম, তবে বলেছ ঠিকই।'

চুড়ো গাঁজা ডলতে ডলতে বলল, 'হ্যাঁ, বলে জাত। শ্যাম দাদার ভাই, এই তো ওর জাত, একবার যদি বলে ও স্থানকত্তাকে মুখ ফুটে তবে কোন্ বাগ্‌দী মেয়ে না দেয় একবার দেখি। আমার সে কথা লখাই দাদা শুনবে না। গ্যাঁজায় দম্ দিয়ে খালি বোম্ হয়ে বসে থাকবে, নয় তো হা হা করে হাসবে।'

কাঞ্চন ঘোমটার মধ্যে কান দিয়ে গিলল কথাগুলো। মুখে তার কত বিচিত্র ছাপই খেলে গেল, হাসি রাগ বেদনা,—কত রকম। কেন? কেন কে জানে!

কালী-কাঞ্চন আবার হাঁটা শুরু করল। জঙ্গলপীরের ধারে কাঠুরেদের গাঁয়ের মধ্য দিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করে তারা গেল দুধ দিতে পীরদহের থানে।

লখাই ধামা কাঁধেই শ্রীনাথ কাঠুরের হাত থেকে হুঁকো নিয়ে কয়েক টান দিয়ে নিল।

শ্রীনাথ বয়স্ক, মাথার চুলে পাক ধরেছে, গোঁফজোড়া পাঁশুটে, প্রায় কানের কাছ অবধি বিস্তৃত, বিশাল। বয়স হয়েছে, কিন্তু দোহারা শরীরটা তার পাকা বাঁশের মত শক্ত আর উজ্জ্বল।

উজ্জ্বল তার দুই চোখ। সে চোখে অনুক্ষণ দুষ্ট ছেলের মত সরল দুষ্টামিতে ভরা। তার মুখের প্রতিটি রেখায় এক অদ্ভুত ব্যঙ্গ হাসি লেগেই আছে। কাঠুরেপাড়ায় বীরত্বে, কথায়, ছড়ায়, নেশায় তার জুড়ি নেই। শুধু তাই নয়, শ্রীনাথ দুই বউ নিয়ে ঘর করে। আর তার প্রতাপ এতই অখণ্ড, তার হৃদয়ের বেগ এতই গভীর ও বিস্তৃত যে, ঘরে দুই সতীনে কেউ কোন দিন চুলোচুলি হতে দেখেনি! কিন্তু তার দুটি বউই সন্তানহীনা। ফলে বউ দুটো আজও সেই বালিকাই রয়ে গেছে। মাঝে মাঝে শ্রীনাথ দুই বউকে দুইপাশে নিয়ে দূরে অদূরে সাধু-ফকিরের ডেরায় ছোটে, এসম্পর্কে পাড়াঘরে যে যা বলে তাই মনোযোগ দিয়ে শোনে। কিন্তু সব চেষ্টাই প্রায় বিফল হয়েছে। একটা লজ্জার কথা, শ্রীনাথ এখনো ব্রত উদ্‌যাপন মত পালা করে সারারাত বউ নিয়ে জাগে। উদ্দেশ্য, এততেও ছেলে হয় কি না একবার পরখ করা। তাতে প্রাণান্ত তার, প্রাণান্ত বউগুলোর। জের চলে তার কয়েকদিন ধরে। কোথায় রান্না, ঘরদোর পরিষ্কার করা, কাঠ কাটা। সব ইতস্তত ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত। সংসার নয়, যেন গাছতলায় বেদের ডেরা। ব্যাপার দেখে নলিন কাঠুরের বউ কামিনী বাঁশঝাড়ে বসে বাঁশঝাড়ের বিলম্বিত হাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলে। শ্রীনাথের মত যোয়ানকে পাওয়ার আশায় কামাতুর বুক তার উথালিপাথালি করে। কাঠুরেপাড়ায় সেকথা গোপন নেই কারুর। এমন কি নলিনেরও নয়। অথচ নলিনের তাতে সায়ও নেই আপত্তিও নেই। কিন্তু শ্রীনাথ সেদিক থেকে বড় সজাগ। বলে, 'হ্যাঁ, তোমার মত মেয়েমানুষকে ঘরে এনে তুলি, তা'পরেতে নলের মত অথব্বো হয়ে ঘরে বসে থাকি।

ওসব মরদখেগো মাগী নে ছিনাথ ঘর করবার ব্যাটা লয়।' ··· এর পরেও আছে তার এই তীব্র সন্তান-আকাঙ্খার যৌনস্বেচ্ছাচারের ক্লান্তরাত্রির পর বিচিত্র প্রতিক্রিয়া। বউ দুটোকে চুলে চুলে বেঁধে খুঁটিতে দুদিকে মুখ করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। খেতে দেয় না। বলে, মাগী, বাচ্চা-খেগো কি তুক্ পুরে রেখেছিস্ পেটে, বের কর্, নইলে তোদেরই একদিন কি আমারই একদিন। এ যেন সেই রূপকথার ছদ্মবেশী রাক্ষসীরানী, সর্বনাশী গুণতুকে শ্রীনাথের জীবনে অশান্তিতে ভরে রেখে দিয়েছে। কিন্তু এরও শেষ হয়। বাঁধন খোলা হয়, সোহাগের জোয়ার শুরু হয়ে যায়, ফরাসডাঙ্গায় ছোটে একটু ভালমন্দ খাবারের সন্ধানে। কোন্ ফকির বলে দিয়েছেন, খবরদার ঘরের লক্ষীদের কখনো অনাদর ক'রো না। শ্রীনাথের ঘরে সোহাগের জোয়ার বইছে লোকে টের পায়, যখন শোনা যায় তার দুই বউ গলা ছেড়ে কান্না জোড়ে। 'মাগো মা-ষষ্ঠি, তোর জিভ দে আমাদের চেটে সাবড়ে দে মা, এত কষ্ট আর সয় না গো!'

এ শ্রীনাথ হল লখাইয়ের বন্ধু। বন্ধু হিসাবে শ্রীনাথের চেয়ে ভালমানুষ বোধ করি আর হয় না। সে মানুষকে হাসাতে পারে, দুঃখীকে দুটো মজার কথা বলে খুশি করতে পারে, মিষ্টি তার স্বভাব। শুধু মাঝে মাঝে তীব্র বংশ-আকাঙ্খায় তার ওই বিচিত্র বিকৃতিগুলো ছাড়া।

লখাই বলল এক মুখ ধোয়া ছেড়ে, 'ঠাকরুনেরা কোথা গেল?'

শ্রীনাথ বলল, 'পাতা কুড়োতে। তা, তুমি চলেছ কোথা দুই বউ নে?'

'কালীবাড়ী। ধর হুকো, ঝাই লইলে আবার গোঁসা করবে বউয়েরা।'

'করবে বই-কি।' স্বাভাবিক উপহাস ফুটে উঠল শ্রীনাথের চোখে। 'পরের বউয়েরা পরপুরুষে একটু বেশি গোঁসাই দেখায়।'

'কি যে বল, তার ঠিক নেই।' লখাই হাসতে হাসতে পথ ধরে।

'মন্দ বনম্ন বুঝি, হ্যাঁরে ও লখা' শ্রীনাথ ডাকে পেছন থেকে, 'ফের দিনি, দেখি মুখখানা একবার।'

লখাই ফিরল না। একটা হাসির শব্দ শোনা গেল, মিষ্টি আর দরাজ হাসি।

শ্রীনাথের মুখে হঠাৎ এক অদ্ভুত করুণ হাসি দেখা দিল। একটা নিঃশ্বাস ফেলে উপরের দিকে তাকিয়ে শুধু বলল, 'বুঝিনে বাপু তোমার কেরামতি, কি যে তোমার নীলা!'

লখাইয়ের জন্য শ্রীনাথের এক বিচিত্র বেদনা-বোধ আছে। দশমাস দশদিনে মায়ের পেট থেকে মানুষ জন্মায় আর লখাই জন্মেছে একুশ বছরে, মা-মনসার পেটে। একুশ বছরের কথা যার স্মৃতিতে চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে গেছে। এ জীবনে তার চেয়ে অভিশপ্ত আর কে আছে।

লখাইরা যে মুহূর্তে কালীবাড়ীর অঙ্গনে এসে হাজির হল, সেই মুহূর্তেই পুরোহিত ঠাকুর মন্দিরের দ্বার বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন। এদের দেখেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটি বিলম্বিত বিরক্তির শব্দ।

লখাইয়ের কাছ থেকে পূজোর বস্তুর ধামা নিয়ে কালী তাড়াতাড়ি

মন্দিরের দরজায় উঠে এল। মস্ত শরীর নিয়ে আর একজন যোগানদার বামুন ধামাটা ঢুকিয়ে নিল মন্দিরের মধ্যে।

পুরোহিত না বলে পারলেন না, 'পূজো কি তোমাদের জন্য বসিয়ে রাখতে হবে!'

গলায় আঁচল দিয়ে জোড় হাতে কালী বলল—তার ঘর্মাক্ত ক্লান্ত মুখে ভক্তি আর করুণা নিয়ে, 'জঙ্গলপীরে খানিক দেরি হয়ে গেছে বাবাঠাকুর।'

ভূলুণ্ঠিত প্রণামে ভেঙে পড়ল সে।

মন্দিরের দরজা বন্ধ হল। যমদূতের মত দুই লাঠিয়াল পাহারাদার মন্দিরের দুই পাশে। মহামূল্য স্বর্ণআবরণে মা কালীর সর্বাঙ্গ ভরা, বিশাল স্বর্ণমুকুট। কখন কি বিপদ আপদ ঘটে বলা তো যায় না! সিঁড়ির নীচে চারদিকে থাম দেওয়া ছাদ তোলা বলিদানের ঘর, থামে রং দিয়ে সব বিচিত্র মূর্তি আঁকা। তার দুই পাশে প্রাঙ্গণ জুড়ে ফুলের বাগান।

মন্দিরের উত্তর সীমায় পাঁচিলের পরে সংস্কৃত টোল, দক্ষিণের পাঁচিলের পর গঙ্গার ধার ঘেঁষে নাটমন্দির, বিচিত্র কারুকার্যেভরা গোল দেয়ালের ঢেউ-বেষ্টনী উঠেছে নহবৎখানার। তার ধারেই পাঁচিল দিয়ে আড়াল করা হয়েছে গঙ্গার বাঁধানো ঘাট। সেই ঘাট ঘেঁষেই উঠেছে রাজপ্রাসাদ। গঙ্গা দিনরাত্রি রাজপ্রাসাদের গায়ে এসে আছড়ে পড়ে। বড় বড় জানালা দিয়ে কক্ষাভ্যন্তরের ছাদের বরগায় বরগায় রঙ্গীন ঝার-লণ্ঠন দুলতে দেখা যায় গঙ্গার হাওয়ায়।

পূজো সুরু হলেও তখনো সানাইয়ের সঙ্গীত থেমে যায়নি, ঢোলকের চাটি ঠিক বেসুর না হলেও কিঞ্চিৎ মন্থর হয়ে এসেছে।

লখাই গঙ্গায় নেমেছে স্নান করতে। কালী বউ মন্দিরের দরজার সামনেই আর ও কয়েকজনের সঙ্গে রয়েছে বসে। কাঞ্চন কৌতূহল-বশত সারি সারি শিবমন্দিরের বারান্দা ধরে টোলের পাঁচিলের সামনে এসে দাঁড়াল। এখান থেকেই টোলের ভেতর দিক দেখা যায়। সেখানেও নানান ফুলের বাগান, একসঙ্গে কয়েকটি দেবদারু গাছের ছায়ায় ভরে রয়েছে বাড়ীখানি। কয়েকটি যুবক মাঝে মাঝে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করছে।

তুলসী-মঞ্চের সামনে একটি যুবক সামনে বই খুলে উদাস হয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার দীর্ঘ শিখা হাওয়ায় দুলছে, গায়ে চাদর। মুখের অবয়বটি ভরাট, চোখ দুটি স্বপ্নমাখা।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল কাঞ্চনকে! পড়ামাত্রই তার সারা মুখ বিস্ময়ে আনন্দে এক অদ্ভুত জ্যোতি ফুটে উঠল। যেন এতক্ষণ গঙ্গার দিকে তাকিয়ে এ মূর্তিরই আরাধনা করছিল সে। কাঞ্চন দেখতে পেল না, টোলের পড়ুয়া যুবক তার দিকেই জোড়হাত প্রসারিত করে দিয়েছে। সে তখন আড়চোখে গঙ্গার ঘাটের দিকে দেখছে লখাইয়ের স্নান সাঙ্গ হল কি-না। তার সারা মুখে এক গুপ্ত অভিসন্ধি ফুটে উঠেছে। বোধ হয় তাইতেই এক বিচিত্র চাপা হাসিতে তার সারা মুখ উদ্ভাসিত, কটাক্ষ বঙ্কিম।

হঠাৎ চাপা গম্ভীর গলায় যুবক বলে উঠল :

দেবি, আস্তাং তাবদ্ বচনরচনাভাজনত্বং বিদূরে
দূরে চাস্তাং তব তনুপরীরম্ভসম্ভাবনাপি।
ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণতিভিরিদং কিন্তু যাচে বিধেয়া
স্মারং স্মারং স্বজনগণনে কাপি রেখা সমাপি॥

কাঞ্চন প্রথমটা বিস্ময়ে পরে ভয়ে খানিক ঘোমটা টেনে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। মাঁগো! পুরুতটা তার দিকে জোড়হাত করে অমন সাংসাং করে কি মন্ত্র আওড়াচ্ছে! কি গুণতুক করছে ওই টিকিওলা বামুন! কে যেন তার পা দুটো চেপে ধরেছে, সড়তে পর্যন্ত পারল না সে। শুনতে পেল কে একজন বলছে, 'কি হে বনবালী, কোন্ *সুন্দরীর দেখা পেলে যে, তার স্বজনগণনাকালে তোমার নামের চ্যারাটিও টানতে বলছ?*

এবং বনমালীর দৃষ্টি অনুসরণ করে কয়েকজন যুবক সকলেই কাঞ্চনক দেখতে পেল। না দেখলেও কাঞ্চন যেন ওই দৃষ্টিগুলির অদৃশ্য খোঁচায় জর্জরিত হয়ে উঠল। ওমা! পুরুষগুলো তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

একজন বলল, 'ছি ছি, সিদ্ধিপানমত্ত হয়ে তুমি পরনারীর অপমান করছ?

আর একজন বলল, 'পাঁচিলটা উঁচু করে দিতে বলতে হবে দেখছি। তুমি না ভট্টপল্লীর সন্তান?'

বনমালী তেমনি শান্ত গলায় বলল, 'সেইরূপই শ্রুতি বটে। তবে, আমি তো আমার কথা ওকে বলিনি। ধরে নাও, আমি যদি ওর কান্ত হতাম, তাহলে দূর থেকে ওই মুখ দেখে একথা বলতাম! ওই দেখ, ওর স্বামী গঙ্গায় স্নান করছে, ও তাই দেখছে। আমি ওর স্বামীর হয়ে উক্ত শ্লোক ব্যবহার করেছি!' 'বলে সে লখাইকে স্নান করে উঠতে দেখে আবার বলে উঠল, 'এব স্মেরো মিলতি মৃদুলে, বল্লরীচিত্তহারী, হারী গুঞ্জাবলিভিরলিভিলীঢ়গন্ধো মুকুন্দঃ।'

কাঞ্চন ঘোমটার ফাঁকে আবার দেখল পুরুত তার দিকে তাকিয়েই মন্ত্র অওড়াচ্ছে। কিন্তু ওদের কথাবার্তায় এটা সে বুঝেছে,

বামুনটা শুধুমাত্র মন্ত্র বলছে না। আরও কিছু বলছে। তা বোধ হয় ঐ বাগদী বউয়ের উপলক্ষ্যে কোন কথা। আর সেকথা কাঞ্চনের রূপ দেখে নয়? দুঃখ নয়, মুখের হাসি তার আরও সরস হয়ে উঠল, বুক ফুলে উঠল নিঃশ্বাসে। লখাইকে দেখল সে আবার তার বঙ্কিম চোখ তুলে। প্রাণভরে দেখল। যেন কত দিন দেখেনি।

একজন যুবক অতঃপরও বনমালীকে ওরকম কাব্য করতে দেখেও বলে উঠল, 'টোল তোমার ছেড়ে দেওয়া উচিত। তুমি ভট্টপল্লীর নাম ডোবালে।'

বনমালীর শান্ত নির্বিকার গলা শোনা গেল, 'সে নাম ডোবার মেঘ-আয়োজন বহুপূর্বেই আকাশে দেখা দিয়েছে, তোমরা তা দেখতে পাওনি বন্ধু। আমি তো সুন্দরীর সম্মান দিয়েছি। প্রয়োজন নেই আমার তার কুলমানের, নাম গোষ্ঠির পরিচয়ের। এমন কি, তার কাছেও যেতে চাইনি।'

হঠাৎ কালীবউয়ের ডাক ভেসে এল, 'কাঞ্চী!'

কাঞ্চন তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে কালীর আঁচল ধরে টেনে বাগানে নেমে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'দিদি, চল বেইড়ে আসি একজায়গা থেকে।'

কালী চোখ বড় করে বলল, 'কোথায় লো?'

'যাবে কি না বল?'

'না বললে কেমন করে বলব?'

'মুরলীদাসের আখড়ায়, গারলেতে। ওদের রাধাকেষ্টোর মূর্তি নাকি বড় সোন্দর।'

কালী শুধু অবাক নয়, কি যেন খুঁজল সে কাঞ্চনের সারা শরীরে

আতিপাতি করে। কি হয়েছে কাঞ্চীর। ওর চোখ এমন লাল হয়েছে কেন, ওর সারা মুখে এত আলো কিসের! কি রয়েছে ওর মনে? জিজ্ঞেস করল, 'কেন লো, আখড়ার ঠাকুর দেখতে যাব কেন?'

'ইচ্ছে হয়েছে।'

'মরণ তোর ইচ্ছের। এ রোদ্দুরে আমার গারলে যাওয়ার ক্ষ্যামতা নেই বাপু।'

'তবে আমি একাই যাব। তোমার দেওরকে বল।'

'দেওর বুঝি তোর নয়, তুই বল্ না।'

'না, তুমি বল।'

'কিন্তু ফিরতে তোদের দেরি হবে যে!'

'হবে না দিদি, তোমার পূজো না মিটতেই আসব।'

লখাই তখন স্নান সেরে শুকনো কাপড়খানি পরে বাগানের মধ্যে ঢুকেছে ভেজা কাপড় মেলে দিতে। কালীর ডাকে কাপড় মেলে দিয়ে কাছে এল।

কালী বলল কাঞ্চনের গারলের আখড়ায় যাওয়ার ইচ্ছার কথা। লখাই বিস্ময়ে ফিরে তাকাল কাঞ্চনের দিকে। কাঞ্চনও ঠায় তাকিয়ে ছিল তার দিকে। শুধু একবার ভ্রূ কেঁপে টিপ ঝলকে উঠল তার।

লখাই বলল, 'ইচ্ছে হয়েছে তো চলুক।'

বলে সে দক্ষিণের দেউড়ির দিকে এগুল। কালী হঠাৎ কাঞ্চনের আঁচল ধরে টেনে কাছে এনে বলল, কাঞ্চী, তোর কি হয়েছে? সব্বোনাসী মাগী, সোয়ামীর ওপর 'তোর টান নেই কেন লো!'

'কি কথায় কি কথা, কাঞ্চী বলল মুখ অন্য দিকে করে।

কালীর সারা মুখে চোখে হাজার রুদ্ধ কথার ছটফটানি। যেন

ভয় পেয়েছে সে। বুঝি কান্না আসছে তার। বার বার বল
কাঞ্চনের স্বামীর নাম নিয়ে, 'সে যে মনিষ্যি নয়, সে যে ডাকাত। দিব্যি রইল, ঘরে যেন অশান্তি ডেকে আনিস্‌নি, কাঞ্চী।'

কাঞ্চন অনুসরণ করল লখাইকে। লখাই চলেছে আগে আ রাজবাড়ী পেরিয়ে, নিস্তব্ধ আমবাগানের ভিতর দিয়ে, গঙ্গার ধারে ধারে ঝোপঝাড়ের মাঝে পথ ভেঙ্গে।... তার ইচ্ছে করল ফিরে তাকাতে, দেখতে কাঞ্চীবউকে। কত দিনই দেখেছে কতরকমভাবে, নিষ্পলক দেখে শ্বাসরুদ্ধ নিরালায়। কিন্তু আজ ঘাড় ফেরাতে গিয়ে যেন হাড়ে হাড় ঠেকে গেল। কেবল এক উদ্দাম ঝড়ের হাওয়া তার বুকের মধ্যে আটকা পড়ে মাতন লাগিয়েছে।

কাঞ্চী যেন কোন্ ভাবের ঘোরে তন্ময়। লখাইয়ের দীর্ঘবলি মূর্তির দিকে তাকিয়ে সে শুধুই অনুসরণ করে চলেছে। যেন তার আশেপাশে কিছু নেই, নেই কিছু পেছনে, সামনে, অফুরন্ত পথ আর সেই পথের উপরে লখাই।

গারলের নীলকুঠির কাছে আসতেই লোকজন দেখা গেল। নীলকুঠির পেছনেই মুরলীদাসের আখড়া। অপরিচিত মানুষ দেখে কেউ কেউ তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। বিশেষ লখাইয়ের দীর্ঘ বলিষ্ঠ মূর্তি দেখে।

একজন জিজ্ঞেস করল, 'কোথেকে আসছ গো তোমরা?'

লখাই বলল, 'শ্যানপাড়া থেকে।'

'নাম?'

'লখাই মৈত্তির, জাতে বাগদী।'

'যাবে কোথায়?'

'মুরলীবাবাজীর আখড়ায়।

'অ।'

কুটির পেছনে আখড়ার ঝকঝকে তকতকে উঠানে লখাই-কাঞ্চন এসে ঢুকল। নিস্তব্ধ, নিঃসাড়, ঠাণ্ডা ছায়ায় ঘেরা যেন স্বর্গরাজ্যে মর্তের গোলপাতার ছাউনি ঘেরা বাড়ী। মানুষ নেই নাকি! মিঠেকড়া তামাক আর পাঁচমেশালী তরকারিতে কালোজিরের গন্ধে ভরে উঠেছে। তার ফাঁকে ফাঁকে হালকা বনতুলসীর গন্ধ দাওয়ার নীচে সারবাঁধা সন্ধ্যামালতী গাছে ফুল ফুটে রয়েছে।

খুট করে একটা শব্দ হল। মুরলীদাস বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এসেই লখাইকে দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। হঠাৎ যেন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে তার। তারপর আস্তে আস্তে তার সারা চোখে অদ্ভুত জ্যোতি ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি লখায়ের কাছে এসে হাসি মুখে আবার দেখল। তারপর আলতো হাতে এমন ভাবে লখাইয়ের গায়ে হাত দিল যে, লখাইয়ের শরীরের লোমকূপ বিচিত্র শিহরণে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। বলল, 'বাঃ, এ যে আমার প্রাণকান্তের মূর্তি। সোন্দর, বড় সোন্দর! এস, বসবে এস। কাঞ্চনের দিকে ফিরে বলল, 'এস তো কান্তপ্রাণহারিণী, তোমরা দেখবে আমাদের মন্দিরের যুগল, আমরা দেখব তোমাদের যুগল।' বলে সে লখাইকে দু'হাতে হাত ধরে দাওয়ায় তুলে নিয়ে গেল। বার বার লখাইকে দেখায়, দেখা আর শেষ হয় না। তারপর হাঁক দিল, 'সবি পুনি, কানি, আয় শীগগীর করে, কে এসেছে দেখবি আয়!'

কাঞ্চন বলল, 'আমরা ঠাকুর দেখে ফিরব তাড়াতাড়ি।'

'ফিরবে বৈকি, ধরে রাখতে চাইলেই তো সবাই ধরা দেয় না।' বলল মুরলী দাস।

মেয়েরা এল। সকলেই হয় তো সেবাদাসী। সকলেই বয়সে যুবতী। সকলেরই চেহারায় কাজের চিহ্ন, ঘর্মাক্ত মুখ কিন্তু বেশবাসে ফিটফাট, নিখুঁত করে তিলক কাটা। সকলেই তারা লখাইকে দেখতে লাগল।

লখাই তাকাল কাঞ্চনের দিকে, কাঞ্চন হাসল মুখ টিপে। কাঞ্চনের মস্ত অবয়ব ও চেহারার মধ্যে যেন আখড়ার কোন মিল নেই। এই ান্ত উন্মুক্ত পরিবেশের মধ্যে তার চোখে কেবলি অকারণ বিদ্যুতের লকানি, এক নির্মম ক্ষুরধারে চক্‌চক্ করছে।

দ্বিপ্রহর ভোগের সময় হয়েছে। মুরলী দাস তাদের ঠাকুর খাল।

ঠাকুর দেখে কাঞ্চন লখাই ফিরল। দূরে দূরে নয়, পাশাপাশি জনে। গায়ে গা ঠেকছে উভয়ের। পদক্ষেপ উভয়েরই অসমান ালকুঠি পেরিয়ে গঙ্গার ধারের নিরালায় এসে পড়ল তারা।

লখাইয়ের দৃষ্টি সরল না কাঞ্চনের মুখের উপর থেকে। লজ্জাহীনা ঞ্চন মুখ তুলি-তুলি করেও তুলতে পারল না। তারপর হঠাৎ ড়িয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'কি ছ্যাখো তুমি মিন্‌সে অমন করে—অ্যাঁ, ছ্যাখো গো!'

বাঁধভাঙ্গা বন্যার কলরোল বুঝি শোনা গেল লখাইয়ের নিঃশ্বাসে। থা বলতে পারল না, স্তব্ধ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কি দেখে সে? ানার টিকুলি দুলে দুলে আজ স্থির উজ্জ্বল টিপ হয়েছে কাঁচাপোকার। াই কি? কাঞ্চন কাছ ঘেঁষে এল আরও। তার তপ্ত নিঃশ্বাস লাগল।

লখাইয়ের খালি গায়ে, 'উপোস দে মিছে কথা বল না। বল তুমি কি গ্যাখো?'

লখাই বিকৃত গলায় বলল, 'তুমি কি গ্যাখো, বল আগে।'

অস্থির ব্যাকুলতায় বলে উঠল কাঞ্চন, 'মিন্‌সে, আমি যে মেয়েমানুষ, কেমন করে বলব সে কথা?' সে তার শরীরের বন্য ঢেউ দিয়ে স্পর্শ করল লখাইকে।

লখাই বলল, 'কাঞ্চন, নারানভাই যে তোমার সোয়ামী?'

'তুমি কি কেউ নও? উপোস দে মিছে কথা বলো না।'

'কাঞ্চী-বউ!'

অশ্বত্থের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো লতার মত কাঞ্চন আঁকড়ে ধরল লখাইকে। খুনী লাঠিয়াল বাগ্‌দী-বউয়ের রক্তে আজ মাতন লেগেছে। কোন সর্বনাশকে সে ভয় পায় না, সর্বনাশের নায়িকা আজ সে নিজে। বলল, 'মা কালী ও রাধাকেষ্টর নামে পিতিজ্ঞে কর লখাই, য্যাত কুরুক্ষেত্তর হোক, আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না কোনদিন।'

'তুমি ছাড়া আমি লয়, বল বল মিন্‌সে।' বলে নিজের শাড়ীর আঁচল টেনে লখাইয়ের কাপড়ের খুটে বাঁধল। মাথায় ঘোমটা নেই, ঘাড় থেকে কাপড় সরে গেছে, কাঁচা সোনার বরণ নিটোল বুক বসনহীন, উদ্ধত। অনাদৃত উদ্বেলিত যৌবন কামনায় উন্মুখ, কাঞ্চনের সারা দেহ থর থর করে কাঁপছে। টানা টানা চোখের দৃষ্টিতে তার বিহ্বল আমন্ত্রণ, ঠোঁটে বিচিত্র হাসি। কপালের টিপ জ্বলছে যেন আগুনের মত দপ্ দপ্ করে।

বিদেশী সিপাহীর ভাঁটাপড়া রক্তে জোয়ার এল। রাজপুতনার মরুভূমিতে আছ্‌ড়ে পড়ল ভয়ঙ্কর বন্যা। সারা শরীর জ্বলে উঠলো, যেন

আগুনের লেলিহান শিখা। বলল, 'তবে তাই হোক এ জীবনে, কাঞ্চী-বউ। ভেসে আসা মানুষের জীবনে বুঝি এই হয়। আগে পাছে সব ঢাকা ও প্রাণের ভার তোমারে দিলুম, দিলুম।' বলে একখণ্ড তুলোর মত কাঞ্চনকে দুহাতে তার বলিষ্ঠ শরীর তুলে গঙ্গার ধার ছেড়ে এক অতিকায় দানবের মত আমবাগানের ঝোপের দিকে সে এগিয়ে গেল।

৪

কাঞ্চন-লখাইয়ের সম্পর্ক নিয়ে মদন কৈবর্তের মা অধরার বিষাক্ত জিভ লক্‌লক্ করে উঠল। পাড়াঘরে তার চেয়ে এ বিষয়ে অগ্রণী কেউ ছিল না। সে হাততালি দিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে এবং দেহের বিচিত্র উৎকট ভঙ্গিমাতে সে কথা প্রচার করে বেড়াল। এমনিতেই অধরার মা'র কুটনি বলে গ্রামে বিশেষ খ্যাতি আছে। মদনের জন্ম সম্পর্কে বহুজনের রকমারি সন্দেহ আছে। মদনের বাপ বেঁচে থাকা পর্যন্ত থেকে শুরু করে আজও লোকে বলে অধরা কুলটা। অধরা বলে যে-মেয়েমানুষ আমাকে কুলটা বলে সে পুত-ভাতারি, যে ব্যাটা, বলে সে মেয়েমেগো।' এ গালিসত্ত্বেও অধরার কলঙ্কমোচন হয়নি, উপরন্তু এ প্রৌঢ়া বয়সে সে বুড়ি কসবী বলে নাম কিনেছে। অর্থাৎ এখনো নাকি তার ঘরে নাগরের আবির্ভাব ঘটে থাকে। সেকথা অস্বীকার করে না অধরা, বরং আসবেই তো, ব'লে সকলের কাছে ডঙ্কা বাজিয়ে বেড়ায়।

যাই হোক, কাঞ্চন-লখাই সম্পর্কে অধরার এ কাহিনী প্রচারে সকলের মনই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলে উঠল। কারণ কাঞ্চনের স্বামী নারানের সঙ্গে মদনের বউ কাতুর কু-সম্পর্কের ব্যাপারটা ঢাকাঢাকির পর্যায় উৎরে শুধু খোলাখুলি প্রচারিত নয়, সত্য-মিথ্যার বেড়া ডিঙ্গিয়ে দৈনন্দিন জীবনে এটা গ্রামের আর সবকিছুর সঙ্গেই মিশে গিয়েছিল। এখন নারান আর আগঢাক না খুঁজে সকলের সামনেই নিয়মিত মদনের বাড়ীতে যাওয়ায় এবং কাতু সম্পর্কিত ঠাট্টা উপহাস উপভোগ করে। এ ব্যাপারেও যত দোষ লোকে দিল নারান আর কাতুকে, তার চেয়েও বেশি দোষ দিল অধরাকে। প্রকৃত পক্ষে অধরাই ব্যাপারের জন্য দায়ী। সে নিজে সব খুইয়েছে, তাই ছেলের বউকেও সে কুলটা করতে চায়। প্রতিবেশীদের এ সন্দেহ শুধু সন্দেহ নয়, সত্য। নগিন হালদার ছিল অধরার পীরিতের মানুষ। তার যৌবনের নগিন হালদার যখন সে বন্ধনের শিকল কেটে ফেলতে চেয়েছিল তখন কাতুকে ঠেলে দিয়েছিল সে নগিনের কাছে। কাতুর আপত্তি ছিল, কিন্তু অধরার জাঁহাবাজীর কাছে সে আপত্তি টেকেনি। শুধু মারধর নয়, কাতুকে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে এমন কথাও অধরা বলেছিল। কাতুর আশ্রয় ছিল একমাত্র স্বামী মদন। কিন্তু মদনের সে স্বামীত্ব ছিল না। মদন শুধু মাতৃভক্ত নয়, মাতৃভীতও বটে। মায়ের আদেশে নিজে সে বউকে নগিনের ঘরে ঠেলে দিয়ে এসেছিল। দিয়ে এসে সে কেঁদেছিল মায়ের পা ধরে। অধিকার-বোধ না থাকলেও মমত্ব-বোধ ছিল মদনের। ছেলের চোখে জল দেখে কী মনে করে অধরা তখন বলেছিল, ও মাগী তোর বুগ্যি নয়, তোকে আমি আবার বে

দেব ছোটমোট এক মেয়ে দেখে। সে কথা শুনে মদন মায়ের পা আরও জোরে আকরে ধরে বলেছিল ; আর যাই হোক কাতুকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না। মা কাতুকে দিয়ে যাই করাক, এ বাড়ী থেকে যেন তাড়িয়ে না দেয়।

নিষ্ঠুর অধরা তাই মেনে নিয়ে মদনের বিয়ে দেয়নি। নগিন হালদার মরে গেল। অধরা বলল, কাতুই তাকে খেয়েছে। নারান তখন কি জানি কেন, কাঞ্চনকে ছেড়ে কাতুর আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অধরা কয়েকদিন গালাগাল শাপমন্যি করে বেড়াল, নারানও তো কম নয়। গালাগাল দিতে না জানুক, অধরার গলায় পা দিয়ে নিকেশ করে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। বিশেন কাতুর সঙ্গে আড়ালে আবডালে ইতিমধ্যে তার একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল। কাতু তখন শুধু সেয়ানা নয়, বন্ধনহীন হৃদয়ে তার অসীম আকাঙ্খার নিরন্তর হাহাকার। অধরার প্রতি তার ভয় কমে এসেছিল, মদনের প্রতি অসীম ঘৃণায় মন বিষাক্ত। খানিকটা বেপরোয়া উদ্ধত হয়ে উঠলেও অসহায়ত্ব ঘোচেনি তার। প্রয়োজন ছিল একটা শক্ত খুঁটির মত আশ্রয়। নারানের যোগ্যতা সেদিক থেকে পুরোপুরিই। যোয়ান নারানের বাহুবন্ধনে তাই সে বাঁধা পড়ল। বলা চলে, একটা আশ্রয় খুঁজে পেল। বেগতিক দেখে অধরা নারানের জন্য দরজা খুলে দিল। উদ্দেশ্য, নারানকে না ক্ষেপিয়ে কাতুকে ব্যবহার করা। সে অবশ্য গ্রামকর্তার কাছে নারানের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে যেতে পারত কিন্তু অধরার বুকে ততখানি সাহস ছিল না। কেন না, ছেলে মদন তো তার মানুষ নয়।

আর বিস্ময়ের হলেও সত্য বটে যে, নারানের আবির্ভাবে মদন

খুশি হল। যেন সে তার কাতু বউকে সঁপে দেওয়ার একটা উপযুক্ত, শক্ত আশ্রয় পেল এবং নিজের মায়ের চেয়েও নারানের সে আশ্রয় তার কাছে নিরাপদ মনে হল।

সুতরাং নিজের ছেলের বউয়ের উপপতির বউয়ের সম্পর্কে যখন অধরাই একথা উঠে পড়ে গাঁয়ে ঘরে চেঁচিয়ে বেড়াতে লাগল তখন সকলেই খানিকটা মুখ চাওয়াচায়ি করল। নারান কোন প্রতিবাদ করল না! উপরন্তু নিজের ভিটা সে প্রায় ত্যাগ করল।

কেবল কালী ঘরের ছেঁচে দাঁড়িয়ে বিচিত্র এবং সাংঘাতিক গালাগালিতে গাঁ ফাটিয়ে ফেলল। তবু রোধ করতে পারল না চোখের জল। বার বার কাঞ্চনকে বলতে লাগল, 'সব্বোনাসী, হারামজাদী, এ কি করলি, এ কি করলি?' ঘরের মধ্যে লখাইয়ের চুলের মুঠি ধরে চাপাস্বরে বার বার বলল; 'মিন্‌সে, তোর পেটে পেটে এত? আগে কেন বললিনে?

কালীর দেওয়া সমস্ত লাঞ্ছনা মাথা পেতে নিয়ে নীরবে বসে রইল লখাই। মিছে কথা বলে যাকেই হোক কালী-বউকে সে ভোলাতে পারবে না।

অধারার সঙ্গে গলা মেলালো দাশুমালর বউ, হরিকানার মা। কেন-না, এ বাড়ীর উপর তাদের পূর্বের একটা বিদ্বেষ থেকেই গিয়েছিল, জরিমানা দিতে হয়েছিল তাদের সেবারের বিচারে লখাই-কালীর দুর্নাম রটনায়।

স্তব্ধ হয়ে রইল কেবল শ্যাম। তবে তার স্তব্ধতা আজকের নয়, কয়েক বছরের। যে কালের প্রবাহে উৎকণ্ঠায় শঙ্কিত হয়ে সে নীরবে সব দেখছিল, বুঝল, এসবই সেই প্রবাহের ক্লেদনির্ঝর। এমন বোধ

হয় শুধু শ্যামের নয়, অনেকের এবং সারা দেশ জুড়েই। বলতে হলে কি গোড়ার আলোচনায় ফিরে যেতে হয়, যখন থেকে আকালের শুরু।

তিপ্পান্ন সালে যেদিন প্রথম রেললাইন পাতা হল কলকাতা থেকে হুগলী পর্যন্ত, সেদিন থেকেও আকালের শুরু বলা যেতে পারে। অন্তত শ্যাম তাই মনে করে। তখনো মানকুণ্ডুর খাঁয়েদের একশো একখানা নৌকা বদর বদর করে গঙ্গার উপর দিয়ে যাতায়াত করে নানান মালপত্তর নিয়ে। আজও করে। কিন্তু সেদিনের মত আর তার জাঁকজমক কোথায়! ভদ্রেশ্বরের বাজার হল কাটরার বাজার অর্থাৎ ভাল গম ইত্যাদি জাতীয় সব জিনিস পওয়া যায়। যা দেখে শ্যাম তার বোনের বিয়ে দিয়েছিল ভদ্রেশ্বরে। সেই ভদ্রেশ্বরে রেললাইন যেন এক উৎপাতের মত এসে হাজির হল। কিন্তু রেললাইন যখন পাতা হল তখন ওই কাটরার বাজার হল বারো জিনিসের, খাঁয়েদের জলপথের ব্যবসা হল একটু কানা।, কিন্তু রেল-লাইন যখন পাতা হল তখন ওই কাটরার বাজারের মহাজনেরাই হাঁড়ি আর জালা ভরতি মিঠাইমণ্ডা নিয়ে প্রথম গাড়ী যেদিন এল, পূজো দিয়ে এল তার। জগদ্দল-শ্যানপাড়ার লোকেরা নৌকা বোঝাই করে গেল সেই রেলগাড়ী দেখতে, ঢাকঢোল, সিঁদুর নৈবিদ্য নিয়ে। শ্যাম যায়নি। নানান লোকের মুখে নানান কথা, একদিনের পথ নাকি পলকে যায় সেই গাড়ী আর সে কি কাণ্ড। তোমার মনে হবে কৈলেস পাহাড় থেকে শিব ঠাকুর নেমে এসেছে। সে কি ফোস্ ফোস্ শব্দ, আকাশে মেঘ ছেয়ে গুম্ গুম্ করতে করতে ঝড়ের মত আসে সে গাড়ী। ভূমিকম্পের মত থর্থর্ করে মাটী কাঁপে, কার ক্ষমতা

আছে তখন সামনে থাকে। কেউ বিশ্বাস করল না ওর মধ্যে কোন যন্ত্র আছে, ম্লেচ্ছ কোম্পানীর ডাকাবুকো সাহেবরা ওতে অপদেবতা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। যে যার নিজের মনের মত গল্প ছড়ালো আশেপাশে। স্থানকর্তারা বোঝালেন এর ভালত্ব। বামুনদের মধ্যে যারা কলকাতার কেল্লায়, কোম্পানীর দরবার-দফ্তরে কাজ করতে যেতেন, তারা সপ্তাহান্তে নৌকোপথ ছেড়ে সেই গাড়ী চাপতে শুরু করলেন। সেটা এমন কিছু ছিল না, সর্বনাশ হল তখন যখন সেই গাড়ীতে করে মাল নিয়ে যাওয়ার সুবিধে পেয়ে কোম্পানী যা পেল সব সাবড়ে নিতে শুরু করল। ইতিপূর্বেই ফরাসডাঙ্গার তাঁতীদের মধ্যে সুতোর জন্য হাহাকার পড়ে গিয়েছিল, এবার শোনা গেল, সুতো তো দূরের কথা, এ দেশের সুতো নিয়ে বিলাতের মেশিনে বানানো কাপড় আসছে শীগগিরই। তা ছাড়া, নানান বিলাতী জিনিসে বাজার তখন ভরতি। আনন্দে গা ভাসাল শুধু মহাজনেরা।

তারপরেই আর এক ধাক্কা এল পঞ্চান্ন সালে, রিসড়েতে এক কারখানা খুলে। এবার কলরব উঠল চারদিক থেকেই। এ কি কোম্পানীর সাহেবের দেশ যে, এ মাটীতে তুমি যা করবে তাই সইবে। এ মাটীর বুকের উপর দিয়ে এখনও গঙ্গা-যমুনা প্রবাহিত, মন্দিরে মন্দিরে জাগ্রত দেবতারা অধিষ্ঠিত, ব্রাহ্মণের গলায় এখনও মন্ত্রপূত উপবীত, উজ্জ্বল ব্রহ্মতেজ, দিন হয়, রাত্রি হয়। এখানে ওসব ম্লেচ্ছ কারবার চলবে না। তা ছাড়া, সকলেই ব্যাপারটাকে ঠাট্টায় উপহাসে ভরে তুলল এই বলে, হায়! তুলোয় সুতো হয়, সেই সুতোয় কাপড় হয় জানি কিন্তু পাটের তো দড়িই হয়, তার আবার যন্তর কিসের। এক, পাটের সূক্ষ্ম সুতোয় ঢাকার তাঁতীর হাতে বাহারি জেল্লাদার

কাপড় তৈরি হয় রেশমের মত কিন্তু পাটের আবার কল কিসের? গোলপাতার ছাউনি দিয়ে ইটের মস্ত মস্ত থাম খাড়া করে বিরাট ঘরের মধ্যে প্রথম চটকলের পত্তন হল। সেই ঘরে যন্ত্রের কি কেরামতি চলছে, কি বাহার হয় পাটের, তাই দেখার কৌতূহলে কেউ কেউ নাম লেখালো কাজের। কেরেস্তান পাদরির ভগবানের হদিস্ বলার মত সাহেবরা লোককে ধরে ধরে বোঝাল এ যন্ত্রের কথা, ভরসার কথা এবং সব চেয়ে বড়—টাকা-পয়সার কথা। ··· টাকার কথা শুনে অনেকেই ছুটে এল। সপ্তাহে প্রায় একটাকা পাঁচসিকে নগদ! বড় কম নয়! কিন্তু লোকের সে মেজাজ কোথায়! তারা দুদিন আসে দশদিন আসে না। কারখানা বন্ধ থাকে। এমনি তখন অবস্থা।

এদিকে কোম্পানীর নতুন প্রবর্তিত খাজনা-আইনে যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল সারা দেশটার মাথায়। শ্যাম দেখল গোঁসাই এবং এবং স্থানকর্তারাও যুগপৎ পাল্টে ভিন্ন মূর্তি ধরলেন। খাজনা বাড়ল তো বটেই আবার কাঁচা পয়সায় সে খাজনা দেবার নিয়ম হল। ওদিকে জোলা তাঁতী যুগী—সবাই তখন মাঠে নেমে এসেছে। সারা দেশে নাকি তুলো নেই, সুতো নেই। এমন কি, মুচি ডোম পর্যন্ত চামড়ার জন্য হা-পিত্যেশ করে রইল। দেশে নাকি চামড়াও নেই। জোলা হল জেলে, মুচি হল চাষী। হাড়ের বোতাম চিরুনি গড়ত যারা তারাও নামল মাঠে। সারা পরগনায় পায়রার খুপরির মত জমি ভাগ হল কুটি কুটি।

এত অনাচার দেশ সইবে কেন! আচমকা সারা দেশে দেশী সেপাইরা লড়াই লাগিয়ে দিল কোম্পানীর বিরুদ্ধে। শ্যাম জঙ্গলপীরের থানে মানত করল, হে ভগমান্, হে বাবাঠাকুর, তোমার দু'হাতে সব অনাচার,

সব পাপ শেষ করে দাও, ভূমিকম্পে ঝড়ে ওদের কলকারখানা সব চুরমার করে দাও, কোম্পানীর সব্বোনাশ কর, এ ড্যাকরা সুমন্দির পো'দের ঘরে ঘরে ওলাউঠায় সব শেষ কর।'

কিন্তু শ্যামের বাবাঠাকুর সেদিন এই কোম্পানীর গোরাদের উপরই সুপ্রসন্ন। সেপাইদের হার হল। গোরাদের মহারানী আশ্বাস দিল, ধর্মকর্মে নাকি আর কখনো কোম্পানী এসব বেলেল্লা করবে না।

কে শুনতে চেয়েছিল সে কথা? হোক দেশীলোকের তৈরি, তবু হিন্দুস্থানের যে মুলুকে কাপড়ের কল তৈরি হয়েছে, সে কাপড়ের কল তো উঠল না, তাঁর হুকুমে রিষড়ের পাটকল ডুবল না গঙ্গায়। উপরন্তু দেশী খাদ্যে শস্যে হাত পড়ল গোরা কোম্পানীর। পূব দেশের নৌকা বোঝাই চা'ল ফসলে ভাঁটা পড়ল। এদেশের হাটে হাটে বিকোবার মাল কোন্‌খান দিয়ে কোন মুলুকে পাচার হয়ে গেল, ঠাওর পেল না কেউ।

খাজনা বাড়ল আবার। শ্রীরামপুর-চাঁতরার গোঁসাইবাবুরা রাজা, সারা হালিশহর পরগনার জমিদারী তাদের ব্রহ্মোত্তর কিন্তু পত্তনি দেওয়া কৃষক প্রজারা তো কোন রাজরাজড়ার কুলগুরু নয়। অভাবের দায়ে দেনার জন্য হাত পাতল তারা। মহাজনেরা এগিয়ে এল, ঋণ দানের জন্য।

শ্যাম নিরস্ত রইল ঋণগ্রহণ থেকে।

এল তার ঘরে মা-মনসার বরপুত্র লখাই। নতুন করে সম্পর্ক স্থাপিত হল গ্যানবাবুদের সঙ্গে। বুকে আবার একটু বল ফিরে পেল সে।

কিন্তু আবার বাড়ল খাজনা। ফরাসডাঙ্গার গোরারা খোলাখুলি

ডাকাতি শুরু করল, দেশের উৎপন্ন ধন জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল গোরা কোম্পানী। গারলের নীলচাষীরা' মাগ-ছেলে ফেলে পালাতে লাগল।

কেবল ইহুদী বাঈজীর নাচ থামল না আতপুরের রাজবাড়ীতে, মেরজা ওস্তাদের সঙ্গীতের মিঠাবুলির প্রাণ-রাঙানো চলল নিরন্তর। তার উপরে লক্ষ্ণৌ-দিল্লীর নাচওয়ালীর ঘাগরার ঝাপটা, নূপুরধ্বনি সেনবংশের দেওয়ানি ঐশ্বর্যের মহিমা-কীর্তনে মেতে উঠল। গোরাদের পাৎলুন-কোট পরে নতুন করে খোলস আঁটল বাবুভায়ারা। যে বাঙ্গালী রাজাবাবু বিধবা বিয়ের কথা বলে অনাচার করতে চেয়েছিলেন, সবাই যেন শুরু করল তাঁর সাকরেদী। কিন্তু রাজাবাবুর মত চাষার দুঃখে গোরাদের গায়ে পড়ে ঝগড়া করলেন না কেউ।

ওদিকে নতুন রেল লাইন পাতা চলতে লাগল কলকাতা থেকে শুরু করে এই সেনপাড়ার উপর দিয়ে। শ্যানপাড়ার উপর দিয়ে? ভয়ে কৌতূহলে অবুঝ উৎকণ্ঠায় লোকজন ছুটে গেল রেল দেখতে। আবার পাটকল করার কথা শোনা গেল তেলেনীপাড়ায়।

শ্যামের স্পষ্ট মনে আছে সেদিনের কথা। কানু ভড় বিশ্বকর্মা পূজো করল। ভড়েরা হল তাঁতী। গঙ্গাজলে তাঁত-চরকা ধুয়ে সিঁদুর লেপে সারাদিন সে মাথা ঠেকিয়ে পড়ে রইল তাঁতের উপর। ফরাসডাঙ্গা থেকে শ্যানকর্তারা আনিয়েছিল কানু ভড়ের বাপকে। কানুর বাপের তখন খুবই নামডাক। একসময়ে ওদের ঘরকে চিনত নবাব বাদশারা, ওদের নকৃসা জেল্লাদার বাহারে কাপড়ের সুনাম দিল্লী অবধি ছড়িয়ে পড়েছিল। হিন্দুস্থানের বাইরেও ওদের হাতে তৈরি মাল নাম রেখেছে এ দেশের। সে বংশের ছেলে কানু। ... পূজো

সেরে শ্যামকে এসে বলল, 'রিষড়ের কলে পাটের বোরা বুনতে যাব রে শ্যাম।'

শ্যাম বলল, 'কি যে বল কানু ভাই, তুমি যাবে কলে খাটতে!'

কয়েকদিন পরে ভোরবেলা সবাই দেখল কানু নতুন বানানো শেষ এবং অসমাপ্ত আগুনের মত জলজলে ওড়না গলায় বেঁধে তাঁতঘরে মাচার বাঁশে ঝুলছে।

কান্নার রোল পড়ল জগদ্দল-শ্যানপাড়া জুড়ে।

তবু বজরা-ভাউলে সাজিয়ে গোবিন্দপুর-ভবানীপুরের বাবুরা রাজসাহী শহরে ফুর্তি করতে যাচ্ছে। তাদের ভাউলে ভিড়ছে জগদ্দলের ঘাটে।

আগুরিপাড়ার ঘাটে বসে পাকা মাথায় চাঁটি মেরে গান গেয়েছে কালো তুলে :

মনের সুখে যাচ্ছে দেখ কত শত নারী
এরা বজরায় মেরে যায় বলি কি হারি।
কেউ পরেছে নীলাম্বরী
কেউ পরেছে ঢাকাই শাড়ী
ঝুমকো বেড়ি চারগাছা মল ডবল মার্কড়ি দুই হাতে চুড়ি।

বজরা ভাউলের ছাতে উঠে আসে বাবুভায়াদের রঙ্গসঙ্গিনীরা। বুকের কাঁচুলির ওড়না সরিয়ে নীলাম্বরীতে প্রাণভোলানো লহর তুলে নেচে নেচে গেয়ে ওঠে :

বাবুরা দেখে হতজ্ঞান! চায় না কো প্রিরান
পকেটেতে রোমাল ঝোলে, গলেতে ঘড়ি-চেন্ দোলে
ইংরিজী বুটজুতা পায় পরে সকলে।

এ গান ফুর্তির, না ব্যঙ্গের, কে জানে !

তখন শ্যামের মাথায়ও নেমে এসেছে ঋণের বোঝা। তার উপর ...রের মধ্যে এই অশান্তি। প্রথমটা তার সমস্ত জ্ঞান যেন গুলিয়ে ...াল। তারপর ভাদ্রবউ কাঞ্চনের রূপের কথা মনে হয়েই ওর সমস্ত ...াগ গিয়ে পড়ল নারানের ওপর। সোয়ামী হয়ে সে হারামজাদা ...াঞ্চনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না, সে গিয়ে আবার আস্তানা পেতেছে ...ধরার ব্যাটার বউয়ের ঘরে। কিন্তু বুক ফেটে গেল তার লখাইকে ...র প্রতিবাদ করতে না দেখে।

তারপর সে হঠাৎ স্থির করে বসল, কালীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী ...াওয়ার। পূবে বোদাই গ্রাম কালীর বাপের বাড়ী। কালী আর ...ধুকে নিয়ে চলে যাবে সে। যা আছে কপালে, এ সংসারের হোক। ...ন আর তা দেখতে আসছে না। কালীর বাপের অবস্থা এমন কিছু ...রাপ নয়, আর ভাইবোনও নেই কালীর। শ্বশুরের সবই তো ...াদের নাতী মধুর প্রাপ্য। এখন থেকে সে সেখানেই থাকবে।

কাঞ্চন কালীর পায়ে পড়ে কেঁদে ভাসাল। লখাই বার বার শ্যামের ...াছে এল কিন্তু কিছুই বলতে না পেরে ফিরে ফিরে গেল। নারান এ ...বের কোন খোঁজই রাখল না। কেবল নীরব রইল কালী।

শ্যাম খুব স্বাভাবিক ভাবেই সংসারের সব বুঝিয়ে দিল লখাইকে। ...রুগুলোর যত্ন করতে, খিরপাড়ার শ্রীশ মণ্ডলের সঙ্গে ক্ষেতখামারের কাজকর্ম বুঝে নিতে বলল।

যাওয়ার সময় কালী চোখের ইসারায় কেবল সান্ত্বনা দিয়ে গেল। কাঞ্চন-লখাই বাপ-মাহারা শিশু বালক-বলিকার মত স্তব্ধ হয়ে উঠোনের উপর দাঁড়িয়ে রইল।

শ্যামের চলে যাওয়াতে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল না শুধু, মধ্যে মনসার ছেলের কোন কারিগরি নিশ্চয় আছে মনে করে কে কেউ নারানকে তাতাতে লাগল। বিশেষ অধরা।

কিন্তু লখাইয়ের মুখে শোকের ছায়া দেখে জগদ্দলের নর-নারী একেবারে চুপ হয়ে গিয়ে প্রমাণ করে দিল, মানুষের মন কত বিচিত্র। কিন্তু একদল স্পষ্টই বলে বেড়াতে লাগল, শ্যাম-নারান দু ভাইকে ঘরছাড়া করে ভিটে দখল নিয়ে বসল লখাই। ধূমকেতুর আবির্ভাব এমনি বটে।

৫

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সেনকর্তা ডেকে পাঠালেন লখাইকে তার খাস কামরায়।

লখাই বুঝল এ ডাক কিসের। কর্তার কামরার বাইরে বন্দুকটা রেখে ঢুকে গড় করল সে।

ঘর না বলে এটাকে ইন্দ্রের কক্ষ বলাই ভাল। গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের উন্মুক্ত খোলা আকাশের ডুবন্ত সূর্যের লাল শেষ রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত ঘরের মধ্যে। বিচিত্র ছাঁদের বিশাল নানান বর্ণের সংমিশ্রিত বেলোয়ারী কাঁচের ঝাড়লণ্ঠন মৃদু মৃদু দুলছে। থেকে থেকে কখনো বা হঠাৎ হাওয়ায় টুংটাং করে উঠছে বেজে। ঘরের দেয়ালের প্রায় অর্ধেকখানি তৈলাভ নীল পাথরে বাঁধানো, তাতে রেখায় রেখায় ফোটানো পেখম-তোলা ময়ূরের ছবি। খানকয়েক বিদেশী ছবি দেয়ালের গায়ে লটকানো রয়েছে রূপোর ফ্রেমে আটকানো। ছবিরই বা কি বাহার। সে বাহার

দেখলে মানুষের লজ্জা হয়। কোম্পানীর সাহেবরা নাকি এসব ছবি কর্তাদের উপহার দিয়েছেন।

কর্তা তাকিয়ে দেখলেন লখাইয়ের মুখ। না, তিনি রাগ করলেন না। বরং লখাইয়ের বিরাট বলিষ্ঠ মূর্তি প্রশংসাভরে তাকিয়ে দেখলেন। বললেন, 'নারানের বউকে তুই নষ্ট করেছিস্ ব্যাটা, অঁ্যা? যার শিল তার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া, নাকি রে?'

লখাই অভয় প্রার্থনা করে সব কথা বলল কর্তাকে। বলল, তার আর কাঞ্চনের কথা, তার প্রাণের কথা। শুনতে শুনতে কর্তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললেন, 'তোকে আমি জমি দেব, ভিটে কর নিজের, ওই বউকে নিয়ে ঘর কর্ তুই।'

কিন্তু লখাই বলল, 'হুজুর অনুমতি দেন, এখান থেকে চলে যাব আমি। শ্যামদাদা কালীবউকে নিয়ে ঘর ছেড়েছে। এখানে আমি আর থাকতে পারব না। থাকতে হলে, শ্যামবাগদীর ভিটাই হল লখাইয়ের ভিটা।' বলতে বলতে তার চোখে জল এল।

'বেশ তো।' কর্তা বললেন, 'সেখানেই থাক্। চলে যাবি কেন? শ্যাম দেখিস্ আবার ফিরে আসবে।'

এ আশার কথায় শান্তি পেল লখাই। বড় ইচ্ছা করল এই মুহূর্তে একবার কাঞ্চীবউয়ের কাছে ঘুরে আসবার। কিন্তু রাতের পাহারা রয়েছে তার।

তারপর কর্তা হঠাৎ দু'খানি মোহর লখাইকে দিয়ে বললেন, 'তোর মেয়েমানুষকে যা খুশি গড়িয়ে দিস্। আর, শিরি-ফরহাদের গল্পো শুনেছিস্ কোনদিন?

'আজ্ঞে না।'

'শুনে নিস্ একদিন মেরজা ওস্তাদের কাছ থেকে।'

এমন সময় মেজ কর্তা ঘরে ঢুকে বললেন, 'দাদা, তা হলে মহারানীর উপাধি গ্রহণের দিল্লী-দরবারের তো আর বেশি দিন বাকি দেখি না। অনেকেই রওনা হয়ে গেছে। আমরাই বা আর দেরি করি কেন?

কর্তা গম্ভীর হয়ে বললেন, ভাবছি, আমরা কিসে দরবারে যাওয়ার উপযুক্ত লোক? সেখানে সব রাজরাজড়াদের ব্যাপার।

মেজকর্তা কিছুটা বিরক্ত ও অপশোশে বলে উঠলে, 'কি যে বল, তার ঠিক নেই। বলে, কোম্পানীর আস্তাবল সাফ করে যে জমিদারী কিনল, সেও দেখি দিল্লীর দিকে বজরা ভাসিয়েছে। আমরা কি তাদের থেকেও ছোট? তা ছাড়া, এসব ব্যাপারে একটু নড়াচড়া না করলে কর্তা ব্যক্তিরাও খুশি হয় না। ঘরে-বাইরের সম্মানটাও দেখতে হবে তো!'

কর্তা একটু চুপ থেকে বললেন, 'ভাল কথা। তবে যাওয়া সম্ভব নয়, মনে হয়। মহীগড় মৌজা বিক্রীর সব টাকাটা পেলে একটা উৎসবের আয়োজন কর আর হুগলীর বড়সাহেবকে বলে এস, আমরা লাটসাহেব লিটনকে কিছু উপঢৌকন পাঠাতে চাই, তিনি যেন দয়া করে একটু ব্যবস্থা ও দিন তারিখ সময়টা ঠিক করে দেন।'

মেজকর্তা মহীগড় বিক্রীর দুর্দশার ইঙ্গিত বুঝেও বললেন, 'কিন্তু মহারানীর রাজত্ব বলে সকলেই খুব খুশি হয়েছে।

'আমিও হয়েছি। কোম্পানীর দৌলতেই আমরা ঐশ্বর্য পেয়েছি, কিন্তু কর্তা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। একটা বিচিত্র অশান্তির রেখা ফুটে উঠল তাঁর মুখে। কর্তার মনে যে কথা রেখাপাত করেছে তা হয় তো দেশের সাম্প্রতিক নানান্ কথার জন্যই। এক এক মহলে

এক এক শ্রেণীর আলোচনা চলছে তখন। কেউ ভিক্টোরিয়ার ভারতের মহারানীর উপাধিগ্রহণ সম্পর্কে বিরুদ্ধ মতামত পোষণ করছিল, কোন কোন মহলে লিটনের সম্পর্কে নানান বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। কোম্পানীর রাজ্যে দেশীয় লোকের ঐশ্বর্য আহরণের যে সুযোগ ছিল, তা খর্ব হওয়ার আশঙ্কা করছিল কেউ কেউ।

লখাই কিছুই সঠিক বুঝতে পারেনি। সে হঠাৎ বলল, 'হুজুর মাপ করবেন। এ কোন্ মহারানী? ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ?'

মেজকর্তা বললেন, 'তুমি একটি মেড়াকান্ত। তোমার ওসব লক্ষ্মী-পক্ষী কেউ নয়, ইনি হলেন মহারানী ভিক্টোরিয়া। লণ্ডনেশ্বরী। এখন হলেন ভারতেশ্বরী, বুঝেছ?'

লখাই ঘাড় কাৎ করে বলল, 'বুঝেছি হুজুর, কিন্তু কোথাকার মহারানী, বুঝলাম না।'

বড়কর্তা ঠোঁট ঈষৎ বেঁকিয়ে বললেন, 'এদেশের আর রানীটানি নেই রে। এ হিন্দুস্থানের ভার নিয়েছেন এখন গোরা কোম্পানীর বিলাতের মহারানী। তিনি এখন ভারতেশ্বরী।'

ভারতেশ্বরী! গোরাদের ফিরিঙ্গিরানী ভারতের অধিশ্বরী। হায় মহাদেব! এ কি শুনছে লখাই! তার ওষ্ঠাগ্রে উথলে উঠল একটা প্রশ্ন, তবে সেই বীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের কি হল? কিন্তু চকিতে চেপে গিয়ে হাত-পা যেন অবশ হয়ে এল তার। শিথিল হাত থেকে পাথরের মেঝেতে মোহর পড়ে গিয়ে ঝনঝন করে উঠল।

কর্তা বললেন, 'কি হল রে?'

রুদ্ধশ্বাস বিপজ্জনক মুহূর্ত। মনে মনে বলল লখাই, সাবধান, সাবধান পলাতক সিপাহী। শান্ত হও, অধীর হয়ে এমন করে বিপদ

ডেকে এনো না। ...তাড়াতাড়ি গড় করে মেঝে থেকে মোহর তুলে হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'কিছু নয় হুজুর, কিছু নয়, মাথাটা যেন কেমন ঘুরে গেল।'

এ মিছে কথা বলার সুযোগ তার ছিল। শত হলেও জলে ভাসা মরা মানুষ, বেঁচে উঠেছে সে, আর তা ছাড়া, কর্তা জানতেন তার মনের অবস্থা খারাপ। তার মনের গতি তো আর দশজনের মত স্বাভাবিক নয়।

কর্তা যেচেই বললেন, 'ঘরে যাবি?'

আশীর্বাদ প্রাপ্তির মত বলল লখাই, 'যদি অনুমতি দেন।'

মেজকর্তা বলে উঠলেন, 'খোট্টা হয়ে শুধু বাংলা কথাই শিখিস্‌নি, বিনয়বাক্যও বেশ রপ্ত করেছিস দেখছি।'

'হুজুরদের দয়া।'

কর্তারা দুভাই-ই হেসে উঠলেন। বড় কর্তা বললেন, 'আচ্ছা যা। কয়েদখানার বাবুকে বলিস, বাইরের দালানে যেন রাতে কেউ থাকে।'

বাইরে এসে বন্দুকটা ছুঁতেই হাত দুটো সাড়াশীর মত মুঠি পাকিয়ে উঠল লখাইয়ের। দাঁতে দাঁত চেপে বসল। সে ভুলে গেল কাঞ্চনের কথা, ভুলল শ্যাম-কালীবউয়ের কথা, অশান্তির কথা ঘরের। আচমকা এক অসময়ের ঝড় উঠল তার বুকের মধ্যে। আবার তার জীবনে যেন সেই যুদ্ধক্ষেত্র ফিরে এসেছে। ফিরিঙ্গিরানী ভারতেশ্বরী! তা হলে কি সব শেষ হয়ে গিয়েছে, সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে!

কয়েদখানার বাবুর কাছে এসে বন্দুক ফিরিয়ে দিল সে। কয়েদখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে কয়েদবাবু বলা নিয়ম এবং কয়েদবাবু বলেই

তিনি এ এলাকায় পরিচিত। কূটবুদ্ধি ও নিষ্ঠুর নীচ প্রকৃতির মানুষ বলে তার খ্যাতি আছে। কয়েদখানার বাইরে সামান্য খোলা জমির পরেই কাছারিবাড়ীর পেছনের পাঁচিল সংলগ্ন কয়েদীদপ্তর, এ ঘরটি শুধু শ্রীহীন নয়, সমস্ত সেনবাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে এ ঘরখানিই বোধ হয় সবচেয়ে অন্ধকার (কয়েদখানা বাদে) পুরনো এবং অল্পদামী আসবাব-পত্রে ভরা। আলো মাত্র একটি, তাও প্রায় সবসময়েই জ্বালানো থাকে। দরজা মাত্র দুখানি। একটি কাছারি, অপরটি কয়েদঘরে যাওয়ার। কর্তারা এ ঘরটিকে বোধ করি ইচ্ছা করেই সংস্কার করার প্রয়োজন বোধ করেন না কয়েদীদপ্তর বলে। তাতে কয়েদীদপ্তরের সামঞ্জস্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। সে ঘরে কয়েদ-বাবু ও যমদূতের মত সিদ্ধিপানে লাল চোখ নিয়ে কয়েকজন সেপাই সব সময়ই বসে থাকে।

কয়েদবাবু তার বকের মত নাকটা আরও খানিকটা ছুঁচলো করে জিজ্ঞেস করলেন লখাইকে, 'কি বৃত্তান্ত বাবা লক্ষীন্দর, ছুটি নাকি ?'

লখাইয়ের হাতে হঠাৎ সোনার চকমকানি দেখে কয়েদবাবুর সন্দেহ-প্রবণ লুব্ধ কুটিল চোখজোড়া চক্‌চক্ করে উঠল। 'তোমার হাতে কী ওটা ?'

'মোহর। কর্তা দিয়েছেন।'

'বাঃ! তুই তো বেটা যাদু জানিস দেখছি।' কুটিল হাসিতে মুখ ভরে তিনি বললেন, 'পরের বউ, পরের ঘর সবই লুটলি, আবার কর্তার কাছে বখশিশও পেয়ে গেলি ? হা হা হা। বেশ বেশ! তা তোর কেরামতিটা সবাইকে শিখিয়ে দে না রে।'

অন্য যে কয়জন সেপাই সেই গুহার মত অন্ধকার ঘরে বসে ঝিমুচ্ছিল, তারা সকলেই চোখ ঘষে লখাইয়ের দিকে তাকাল। তাদেরই মত একজন নগণ্য সেপাইয়ের এতখানি সৌভাগ্য দেখে ঠিক হিংসা নয়, এক বিচিত্র আশাবোধ তাদের প্রাণের মধ্যে জেগে ওঠে। সেই সঙ্গে কর্তাদের দানের মহিমাতে বিস্ময়ে চোখ জ্বলে ওঠে তাদের।

একজন বলে উঠল তাদের মধ্য থেকে, 'আমার ঠাকুদ্দারে কত্তারা একবার অনেক সোনা দিইছেল, কিন্তু কপালে সইল না।'

এবং সবকজন সেপাই-ই লখাইয়ের কাছে এসে বিস্মিত প্রশংসায় লক্ষ্য করতে লাগল তাকে। একজন বলল, 'কী বলে দিলেন কর্তা?'

সে জবাব দেওয়ার মত মনের অবস্থা তখন লখায়ের নয়। তার সমস্ত মনের মধ্যে তখন তোলপাড় করছে ফেলে-আসা অতীতের কাহিনীর সমস্ত পরিণতি জানবার জন্য। তার সমস্ত প্রাণমন ফিরে গেছে ফেলে-আসা সেই সেপাই ব্যারাকে, মনে পড়ছে প্রতিটি দিনের নিরন্তর ফিস্‌ফাস্‌, জাতমান খোয়ানোর আতঙ্ক, আর প্রতিমুহূর্তে শ্বেত দানবের হুকুম অমান্যের সাংঘাতিক উত্তেজনা।

সে বলল কয়েদবাবুকে, 'কত্তা বাইরের দালানে একজন পাহারাদার পাঠাতে বলে দেছেন। আমি যাই আজ্ঞে।'

কয়েদবাবু বললেন, 'আরে শোন্ শোন্। হঠাৎ সরে চললি কেন? ময়াল খেলাতে না রাত করে মেয়েমানুষকে পাহারা দিতে?'

একজন সেপাই বলল, 'তা নারানও বড় কম যোয়ান নয়। সে কি ছেড়ে কথা কইবে?'

লখাই বলল, 'না ভাই, শরীলটা বড় বেভাব লাগছে।'

কয়েদবাবু হেসে উঠলেন হো হো করে। বললেন, 'সে তো কর্তা বুঝেছেন, আমরা কি আর বুঝেছি?' তারপর হঠাৎ গলার স্বর পরিবর্তন করে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'তা তুই এত ঘামছিস কেন, হাঁপাচ্ছিস কেন! ভয় পেয়েছিস নারানের জন্য?'

কথাটা শুনে মাথা নাড়া দেওয়া সিংহের মত সোজা হয়ে উঠল লখাই। পরমুহূর্তেই আবার মাথা নামিয়ে চাপা একটু উত্তেজিত গলায় বলে, 'তা বাবু, নারানের না হোক, ভয় পেয়েছি একটা। সে ভয় এ পানের লয়, সে ভয় ...' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে আর একটি কথাও না বলে সে বেরিয়ে পড়ল।

ঘরের সবাই হতবাক্ হয়ে তার চলার পথে দিকে তাকিয়ে রইল। কেবল কয়েদবাবুর মুখের সমস্ত রেখাগুলো বার বার নানান্ ভঙ্গিতে বেঁকেচুরে উঠতে লাগল নানান্ চিন্তায়।

লখাই বেরিয়ে এসে পথের উপর পড়ল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। উত্তর-দক্ষিণে বিলম্বিত পথ নির্জন নিস্তব্ধ। চক্রবর্তীদের বাগানের উলটো দিকে পথের উপর ঘোষের মুদীখানায় বাতি জ্বলছে একটা টিম্‌টিম্ করে। দু-একজনের নীচু গলার কথা শোনা যাচ্ছে সেখানে।

কোথায় যাবে লখাই? বাড়ীতে, কাঞ্চনের কাছে? না, নারীর প্রেমালিঙ্গন আদর-সোহাগ আচমকা তার জীবন থেকে এক উদ্দাম

ঝড়ে ঝরে গিয়েছে। বুঝি চকিতে দুদিনের জন্য তার জীবনে নারীর উদ্দাম সোহাগ এসেছিল এবং যে দুর্বিপাকে পড়ে ভাসন্ত জীবনকে সে তুলে দিয়েছিল কাঞ্চনের হাতে, পুনর্বার সেই দুর্বিপাকই দারুণ আবর্তে পাক খেয়ে ফিরে এসে ছত্রখান করে দিল সমস্ত। কোম্পানীর ফিরিঙ্গি রানী ভারতের মহারানী! এ কি করে সম্ভব হল! তা হলে চোখে-না-দেখা যে ঝাঁসীর রানীর যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনেছিল, শুনেছিল বীর নানাসাহেবের কথা, তাঁরাও কি এ নগণ্য সিপাহীর মত লাঞ্ছিত পলাতক জীবন যাপন করছেন। হিন্দুস্থানে কি তাঁদের আর কোন পাত্তা নেই, বিলাত থেকে ফিরিঙ্গীরানীর শাসন-ক্ষমতার অধিকারের কথা শোনা সত্ত্বেও কি যুদ্ধের অবসান হয়ে গেছে? তা হলে গরুশূকরের চর্বিতে ভাজা হাড়চূর্ণের ময়দার রুটি-পরোটাতে হিন্দুস্থানের মানুষকে পেট ভরাতে হবে? কোথায় বীর সেনাপতি তাঁতিয়া। আজও যে লখাই, ঝড়ো হাওয়ায় মেঘ গর্জনের মধ্যে তোমার সেই অমোঘবাণী শুনতে পায়, 'প্রতিটি ফিরিঙ্গীর রক্তে হিন্দুস্থানকে স্নান করিয়ে শুদ্ধ করে নিতে হবে।'

বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল তার। সারা গায়ে ঘাম ছুটছে। কোথায়, কোথায় তাঁতীয়া! তার মনে পড়ল, মজুমদারদের সেজবাবুর কথা। সারা সেনপাড়ার মধ্যে এমন দুটি লোক আর সে দেখেনি। বাবু সারাদিন বসে বসে মস্ত মোটা মোটা কেতাব পড়েন। পড়ায় এতই তন্ময় থাকেন যে, তাঁর বেশবাসের ঠিক থাকে না, ঠিক থাকে না নাওয়া-খাওয়ার; একদিন তিনি নিজেই ডেকে লখাইকে অনেক কথা বলেছিলেন এবং লখাইকে ওঁর কী যে ভাল লেগেছিল। বলেছিলেন, আমি তোমার প্রেমে পড়েছি হে, বুঝলে? মাঝে মাঝে

এসে আমাকে দেখা দিয়ে যেও। তুমি একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছ সারা হালিশহর পরগনার মধ্যে।'

স্থানীয় অধিবাসীরা তাকে কিছুটা পাগলই মনে করে। কোন বাক্‌বিতণ্ডা তো দূরের কথা, হেসে ছাড়া তাঁকে কেউ কোন দিন কথা বলতে দেখেনি। যা বলেন, তাও দুর্বোধ্য। কখনো সংস্কৃত, কখনো ইংরেজী, কখনো ফারসী বা ফরাসী। কেতাব পড়েই মাথাটি অমন গোলমেলে হয়ে গেছে, শোনা যায় তিনি শীঘ্রই কলকাতায় কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত কোন বিদ্যালয়ে নাকি শিক্ষকতা করতে যাবেন এবং সাহেবরা তাকে বিলাত নিয়ে যাওয়ার জন্যও খুব অনুরোধ করেছেন।

তিনি যেমন লখাইয়ের প্রেমে পড়েছিলেন, লখাইও তেমনি পড়েছিল এ মানুষটির প্রেমে। অনেক কথা শুধু নয়, অনেক দেশের অনেক ব্যাপার সে জেনেছে এ লোকটির কাছ থেকে। এত কথাও তিনি জানতেন! আর এ দেশের কোন কথা বলতে গেলেই তাঁর সারা মুখে এক অদ্ভুত ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে। বলেন, 'আমরা কিসের জাত তুমি জান?'

লখাই বলে, 'আজ্ঞে হিন্দুর বটে।'

তিনি বলেন, 'সে তো বটেই, তা ছাড়াও আমরা হলাম নিধিরামের জাত।'

'নিধিরামটা কে বাবু?'

'যার ঢাল-তলোয়ার নেই!'

বজ্রকণ্ঠে সে কথার প্রতিবাদ করতে চেয়েছে লখাই। ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম হলাম আমরা। তুমি কি জান না বাবু, এ দেশের সেপাইদের লড়ায়ের কথা, তুমি কি জান না, ফিরিঙ্গির রক্তে

ভাগীরথী লাল করে দেওয়ার কথা। কিন্তু বলতে পারিনে ভয়ে। এত কথা জিজ্ঞেস করেছে, তবু প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়ে কোন দিন জিজ্ঞেস করেনি সে যুদ্ধের পরিণতির কথা। মনগড়া কল্পনা করেছে, যুদ্ধ থেমেছে সাময়িক ভাবে, দিন আবার আসবে।

কিন্তু আজ সে কল্পনার সৌধ হয়ে গেছে চূর্ণবিচূর্ণ। সাময়িকভাবে যে পরাজয়ের জ্বালা স্তব্ধ হয়ে ছিল স্বকল্পিত চিন্তায়, আজ সেই জ্বালা নিদারুণ সত্য হয়ে পুড়িয়ে দিল বুকটা।

না, বাড়ী নয়, কাঞ্চন নয়, নয় অন্য কোন দুশ্চিন্তা। ভয় নয়, আজ সে সোজা চলল মজুমদার-বাড়ীর দিকে সেজবাবুর কাছে সমস্ত কথা জানতে। ও হো! বিদ্যুতের মত ঝলকে উঠল তার মনের মধ্যে, তাই বুঝি সেজবাবু অমন ঠোঁট বাঁকিয়ে বলেন, 'আমরা হলাম নিধি-রামের জাত।' আর লখাই অপোগণ্ড মূর্খ সিপাহী, সে কোন অর্থই বুঝতে পারেনি। সব কথাই জানেন তা হলে সেজবাবু! নিশ্চয়! সেজবাবু যে কথা জানেন না, সে কথা জানে না তা হলে কেউ।

মজুমদার-বাড়ীর দেউড়ি দিয়ে ঢুকতেই চাকর হরি জিজ্ঞেস করল, 'লখাই না কি গো?'

লখাই বলল, 'হ্যাঁ, সেজবাবুর সঙ্গে এট্টু দেখা করব। কোথায় আছেন?'

হরির খানিক ভক্তি আছে লখাইয়ের উপর মনসার ছেলে বলে। তবু বলল বিস্মিত হয়ে, 'রাত করে যে?'

লখাই বলল, 'বড় দরকার ভাই। বাইরের ঘরে আলো রয়েছে, বাবু ওখানেই নাকি?'

হরি নির্বিকারভাবে বলল, 'তা ছাড়া আর কোথায় থাকবেন বল ? তুমি হলে মনসার ছেলে, উনি হলেন মা সরস্বতীর। যাও।'

লখাই ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ থমকে পেছিয়ে এল তাড়াতাড়ি। হরি বোধ হয় নজর করেনি। বাবুর পাশে সুন্দরী যুবতী একজন ঘোমটা খুলে বিহ্বলভাবে শূন্যে তাকিয়ে আছেন আর বাবু কি যেন পড়ছেন তাঁর মিষ্টি গলায় দু'হাত নেড়ে। মানুষ দেখে যুবতী ঘোমটা টেনে দিলেন। ছায়া দেখে সেজবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ওখানে ?'

তাড়াতাড়ি চৌকাটের উপর গড় করে লখাই বলল, 'আপনার লক্ষীন্দর।'

সেজবাবু কেতাব মুড়তেই যুবতী উঠে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। সেজবাবু তাড়াতাড়ি তার আঁচল ধরে বললেন, 'যাচ্ছ কোথায় ? ও আমাদের লখাই, তোমার এত গোপনতার কোন কারণ নেই।'

যুবতী ঘোমটা ঈষৎ তুলে বললেন, 'জানি। তুমি ওর সঙ্গে কথা বল, আমি ভিতরে যাই।'

লখাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'থাক্ বাবু, আমি এখন যাই।'

সেজবাবু বাধা দিয়া বললেন, 'যাবে কি হে! গৃহস্থের গিন্নীর দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু তুমি হলে চাঁদরাজার ছেলে রাজপুত্তুর লক্ষীন্দর, এসেছ আবার সন্ধ্যার পর, তোমাকে কি এখন ছেড়ে দিতে পারি! এস, ভিতরে এস।' স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি তো কতদিন লখাইয়ের কথা শুনতে চেয়েছ, চলে যাবে কেন ?'

'বারবাড়ীতে বসে এভাবে কথা শোনা যায় বুঝি ?' বলে স্ত্রী চলে গেলেন।

সেজবাবু একটু হেসে বললেন, 'তা বটে। তারপর লক্ষীন্দর তুমি কি মনে কর? শুনলাম তুমি আর এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছ সেনপাড়াতে। সেই সম্বন্ধে কিছু বলবে নাকি?'

লখাই বলল, 'না' কিন্তু যা বলতে এসেছে, বলতে গিয়ে সে কথা আটকে গেল তার মুখে। নানান্ সংশয়, সন্দেহ চেপে আসতে লাগল তার মনে। না জানি কী মনে করবেন বাবু, না জানি কী ভাববেন। হয় তো কিছু জিজ্ঞেস করে বসবেন, যে কথার জবাব দিতে পারবে না সে। আর নিজের মন-মেজাজেরই কি তার কিছু ঠিক আছে? কী বলতে কী বলবে সে। বলতে গিয়ে তার এতদিনের আত্মগোপনের কাহিনীই যদি ফাঁস হয়ে যায়।

তার মুখ দেখে সেজবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার লখাই?' কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি তো? কাজে যাওনি আজ?'

যেন কথাচ্ছলে একটু হাসল লখাই। তাড়াতাড়ি মনের ভাব গোপন করার চেষ্টা করল। এ কি করছে সে! আর কোন দিন কি লখাই সেজবাবুর কাছে আসেনি? আর আর দিনের মতই স্বাভাবিক ভাবে নানান্ কথা বলে তার কথাটি জেনে নিতে হবে, উত্তেজনার মধ্যে সেকথা ভুলে যায় কেন সে? বলল, 'না, তেমন কিছু নয়। শরীলটা একটু বেভাব হয়েছে, তাই চলে এলাম। কি কেতাব পড়ছিলেন বাবু?'

সেজবাবু খানিকটা যেন ভাবের ঘোরে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। লখাইয়ের ছলনা তিনি বুঝতে পারলেন না। বললেন, 'কেতাব বড় সাংঘাতিক হে। কেতাবের নাম হল দুর্গেশনন্দিনী। লিখেছেন কে জান? কাঁটালপাড়ার এক চাটুয্যে হাকিম। আমাদের বাড়ীতে

দেখলে আমি আমার বউকে পড়িয়ে শোনাচ্ছি, কেন-না, রেওয়াজ আছে। আমার ভাটপাড়ার বন্ধু বনমালী টোলের ফিরতি পথে রোজ এ কেতাবের পাতা ছিঁড়ে পাচন নিয়ে যেত আর সেই পাতা পড়ে শোনাত তার নব-বধূকে।' বলে তিনি ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে সেই কেতাবের পাতা ওলটাতে লাগলেন। লখাই সে সব কিছুই বুঝতে পারল না। বলল, 'কেন কিছু খারাপ কথাটথা লেখা আছে বুঝি?'

'খারাপ বলে খারাপ!' সেজবাবু ভ্রূ তুলে কপট গাম্ভীর্যে বললেন, 'রীতিমত চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ হৃদরোগ ঘটতে পারে, বুঝলে? শুনবে নাকি একটু?'

লখাই জোড়হাতে বলল, 'না বাবু, যাব এখন, তা বাবু কেতাবে এত কথা লেখা থাকে, সেপাইদের যে সেই লড়াই হয়েছিল কোম্পানীর সঙ্গে তার কিছু লেখা নেই?'

সেজবাবু বললেন, 'ইংরেজী কেতাবে আছে।'

আছে? আবার যেন লখাইয়ের সারা মুখ জ্বরের ঘোরে তমতমিয়ে উঠতে চায়। মুখে তার আলো ফুটল। বলল: 'সে লড়ায়ের কী হল বাবু?'

'সে তো শেষ হয়ে গেছে হে।'

'অ! যারা লড়েছিল, তাদের কী হল?'

'তারা তো অনেকেই মরে গেছে।'

'মরে গেছে?'

লখাইয়ের অবিশ্বাস্য অথচ তীব্র কণ্ঠ শুনে সেজবাবু ফিরে তাকালেন। বললেন, 'হ্যাঁ। ঝাঁসীর রানী তো যুদ্ধ করতে করতেই

মারা গেলেন। নানা সাহেব তো গ্রেপ্তার হয়ে বোধ হয় বহরমপুরে জেলে ছিলেন, মরে গেছেন কি-না জানি না। কেন বল তো?'

কেন? কেন, সে কথা আজ আর কেউ বুঝবে না। ছদ্মবেশী জীবনের সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে, সে মরেছে জীবন্তে। বলল, 'কেন আর, এমনি। গল্পো শুনেছি কি-না। আর একজন ছিল বাবু, কি নাম তার, হ্যাঁ, তাঁতীয়া?' সেজবাবু বললেন, 'সে মরাহাট্টিকে ফাঁসি দিয়েছে।'

আচমকা লখাইয়ের বুকে যেন তীক্ষ্ণ তলোয়ার আমূল বিদ্ধ করে কেটে ফেলল হৃদপিণ্ড। কিন্তু কোন শব্দ করার উপায় নেই। যন্ত্রণায় আর্তনাদ দূরের কথা, মুখে তার চিহ্ন পর্যন্ত ফুটতে দেওয়া চলবে না। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ করে আবার বলল, 'কার হুকুমে ফাঁসি হয়েছে বাবু? কোম্পানীর মহারানীর?' এবার আর সব চেষ্টাতেও লখাই তার বিকৃত উত্তেজিত মুখভাব গোপন করতে পারল না, সেজবাবু বললেন, 'কী হয়েছে তোমার লখাই। তোমার স্তানকর্তারা মহারানীর উৎসব করতে দিল্লী যাচ্ছেন,'তাতে কি তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে?'

লখাই প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মসম্বরণ করে বলল, 'না, কিন্তু বাবু', বলতে ভরসা পাইনে, ফিরিঙ্গী রানী এদেশের মহারানী হবে, ফাঁসির হুকুম দেবে—এ যেন আমার পানে সয় না।'

সেজবাবু তক্তাপোশ ছেড়ে নেমে লখাইয়ের কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'ঠিক বলেছ লক্ষীন্দর—ঠিক বলেছ। সাধ করে কি তোমার বন্ধু হয়েছি। কিন্তু কোন উপায় নেই। আমরা যে নিধিরামের জাত হয়েছি!'

সেজবাবুর এ আকস্মিক আত্মপ্রকাশ লখাইয়ের হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার যেন প্রচণ্ড ধাক্কায় ঠেলে খুলে ফেলতে চাইল। দামামা বেজে উঠল তার বুকের মধ্যে, কামানের গোলা ফাটার শব্দ এল যেন তার কানে। তাড়াতাড়ি সেজবাবুর পায়ে হাত দিয়ে ব্যাকুল গলায় বলল সে, 'বাবু, এর কোন বিহিত কি হবে না! আপনারা কিছু করবেন না?'

সেজবাবু লখাইয়ের হাত ধরে তুলে বললেন, 'বলেছি তো লখাই, আমাদের কিছু নেই। ঈশ্বর আজ ওদের সহায়, শক্তিতে ওরা আজ সিংহবাহিনী। পৃথিবীর কেউই আজ ওদের সঙ্গে পারবে না। তার উপর আমাদের দেশের বড় বড় মাথারা আজ সব ওদেরই সহায়।'

না—না এ আর শুনতে পারে না লখাই। কোম্পানীর প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ, ওর প্রতি প্রচণ্ড অভিশাপ! হায়, কী পাপে, কোন্ পাপে! ঈশ্বর কখনো অবিচার করেন না, কিন্তু এই নাকি তাঁর বিচার!

'রাত হল, আমি যাই বাবু'—বলে লখাই প্রস্থানোদ্যত হল।

সেজবাবু একটু এগিয়ে বললেন, 'এসব কথা কাউকে যেন বল না।'

'না বাবু না।' বলে সে বেরিয়ে এল। একথা কি বলার মত, না, এ লজ্জার, এ পরাজয়ের কথা ফলাও করে কাউকে বলা যায় না।

কিন্তু ঈশ্বরের অভিশাপেই যেন অভিশপ্ত ক্রুদ্ধ বন্দী সিংহের মত অন্ধকার পথের উপর এসে আরষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লখাই। তাঁতীয়াটোপীর উদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল তার সমস্ত সুপ্ত স্মৃতিকে হিংস্র করে তুলেছে, দুই মুষ্টিবদ্ধ হাতে অন্ধকারকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য যেন সে ঝাপটা মারতে লাগল। না, বোধ করি সেনাপতির ফাঁসির

দড়িকে সে দু'হাতে টেনে ছিঁড়তে চাইছে। তার ঘন ঘন নিঃশ্বাসের সঙ্গে মনে হল, মণিহারা অজগর ফুঁসছে অন্ধকারে, ধক্ ধক্ করে জ্বলছে দুই রক্ত চোখ। ফাঁসি দিয়েছে তার সেই বীর সেনাপতিকে! সারা হিন্দুস্থানের কোম্পানীর সমস্ত গোরাকে কি সেই ফাঁসিরও কাঠে ঝোলানো যায় না?

অন্ধকারে গাছের মাথার উপর দিয়ে পাখী একটা পাখা ঝাপটা দিয়ে উড়ে গেল বিচিত্র শব্দ করতে করতে। লখাই যেন শুনল সে পাখী বলে যাচ্ছে, হঁ্যা, হঁ্যা, হঁ্যা, হঁ্যা ...

উপরের দিকে ফিরে তাকাল সে। অন্ধকার। গাছের ফাঁকে ফাঁকে তারা ভরা আকাশ। সেই অসীম শূন্য থেকে ক্রমবিলীয়মান দৈববাণীর মত সেই শব্দ ভেসে আসতে লাগল, হঁ্যা হঁ্যা হঁ্যা হঁ্যা ...

অন্ধকারে দানবের মত লখাই চলল বাড়ীর দিকে। কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে। চিন্তা করবার ক্ষমতা নেই। যা ভাবতে চায়, সে ভাবনার কোন ধারাবাহিক গতি নেই তার। কেমন করে সে ভাবনা ভাবা যায় বুঝি তাও তার জানা নেই। কেবল এক অশান্ত বোবা ক্রোধে মনে মনে বার বার প্রশ্ন উঠল, কেমন করে, কেমন করে, কেমন করে?

অন্ধকার উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় উঠে দরজায় ধাক্কা দিল সে।

কাঞ্চন জেগেই ছিল। জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'আমি লখাই।'

পরিচিত গলার স্বর শুনেও কাঞ্চন বেড়া কাটা জানালা দিয়ে অন্ধকারে ঠাওর করে একবার দেখে নিল। তারপর দিল দরজা খুলে।

ঘরে তখনো টিম্‌টিম্‌ করে একটা প্রদীপ জ্বলছে। লখাইয়ের খাওয়া এঁটো বাসন দুখানা পড়ে রয়েছে, অগোছাল ছড়ানো জিনিস-পত্র কালকের মতই পড়ে রয়েছে এখনো। বিস্রস্ত বিছানার কাঁথা গুটানো, মাদুর পড়ে আছে মেঝেয়।

কাঞ্চনের দুই চোখ ফোলা, মুখ ভার, ক্লান্তিমাখা! বোঝা যায় সে খায়নি, ওঠেনি সারাদিন, পড়েই ছিল। অসময়ে লখাইকে ফিরতে দেখে বলল, 'চলে এলে যে?'

লখাই কোন জবাব দিল না। চুপ করে বসে রইল সে এক পাশে। স্তব্ধ, ক্রুদ্ধ। জ্বলন্ত চোখ, ঘন নিঃশ্বাসে মস্ত বুক বিরাট পাথরের মত দুলে দুলে উঠছে।

সে মূর্তি দেখে চমকে উঠল কাঞ্চন। শিউরে উঠল ভয়ে। তাড়া-তাড়ি কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'কী হয়েছে, কি করে এসেছ?'

'কিছু না।'

সেকথা বিশ্বাস করল না কাঞ্চন। আরও খানিক ঝুঁকে পড়ে ভাল করে লখাইয়ের মুখ দেখে বলল, 'কিছু নয় কি? তবে তোমার চোখ-মুখ এমন জ্বলছে কেন! অমন জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছ কেন? কি হয়েছে বল! তুমি কত্তাদের বাড়ী থেকে চলে এলে কেন?'

বলে সে লখাইয়ের সর্বাঙ্গ আতিপাতি করে দেখল। তার স্থির বিশ্বাস হয়েছে মারামারি না হলেও নারানের সঙ্গে নিশ্চয় তার কিছু ঘটেছে। হয় তো সেখানে অধরা এবং আরও কেউ কেউ ছিল। তারা সকলে মিলে অপমান করেছে লখাইকে হয় তো। নয় তো বুঝি কত্তারাই কোনরকম অপমান করেছে, ব্যবস্থা করেছে হয় তো কোন শাস্তির।

অস্থির গলায় বলল সে, 'মরণ সেই আমার, বল না কেন মিন্‌সে, কী হয়েছে? এত রাগ কেন তোমার! কার 'পরে!

'কার 'পরে?' বলে জলন্ত দৃষ্টিতে শূন্যে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে আবার বলল, 'যার 'পরে, তার নাগাল আমি পাবো না, বুঝি কোন দিন না।'

শুধু আতঙ্ক নয়, কৌতূহলে ফেটে পড়ার যোগাড় হল কাঞ্চনের। দু'হাতে লখাইয়ের কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'কেন! কে সে! কার নাগাল খুঁজছ তুমি?'

লখাই স্থির দৃষ্টিতে তাকাল কাঞ্চনের দিকে। কাঞ্চনও তাকাল। একি চোখ। খুন করবার সময় মানুষের চোখ কি এমনই হয়। শত্রুকে না পেলে মানুষের সারা মুখ এমনি জ্বলে!

লখাই হঠাৎ কাঞ্চনের হাত ধরে বলল, 'কাঞ্চীবউ, সেপাইদের লড়ায়ের কথা তুমি শুনেছ কোন দিন? গোরা কোম্পানীর সঙ্গে যারা লড়েছিল?'

কাঞ্চন বলল, 'শুনব না কেন। তখন তো আমার বে হওয়ার কথা হচ্ছে।'

কঠিন চাপা গলায় বলল লখাই, 'সে যুদ্ধের সেনাপতিদের ফাঁসি দিয়েছে কোম্পানীর গোরারা। এ হিন্দুস্থানের তখ্‌তে আজ ওরা ফিরিঙ্গীরানীকে বসিয়েছে। ওই সাদা শয়তানেরা নাকি ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়েছে, ওদের নাগাল আর কেউ পাবে না।'

এ কথার অর্থ বুঝতে পারল না কাঞ্চন। লখাই এখন দ্বিগুণ দুর্বোধ্য হয়ে উঠল তার কাছে। অজানা এক নতুন ভয় দানা বাঁধল তার বুকে। এসব কথা বলে কেন মানুষটা, আর এসব কী কথা? বলল, 'তাতে তোমার কি?'

'তাতে আমার কি! বেকুফ আওরৎ!' হাতের ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিল সে কাঞ্চনকে।

সত্যি, তাতে লখাইয়ের কী! কেউ বুঝবে না তার কথা, পুনর্জীবিত মনসার ছেলের এ বিচিত্র প্রশ্নে সবাই শুধু চমকাবে, নয় তো এক দারুণ সর্বনাশের সন্ধান পেয়ে খিল আঁটবে ঘরে ঢুকে। আপন মনে সে বিড় বিড় করতে লাগল। ··· সিপাহী ব্যারাকের কথাই তার আবার মনে পড়ল। একেবারে শেষের দিকে যেদিন শোনা গেল 'চপাটি ঘুম্ গিয়া' সেদিন ব্যারাকে এক দারুণ উত্তেজনা। ওই চপাটি যুদ্ধ শুরু হবার প্রথম সঙ্কেত ছিল। ওই চপাটিতে লেখা ছিল গোরা কোম্পানীর অনাচারের কথা, অত্যাচারের কথা, অস্পৃশ্য টোটা টুপি ময়দার কথা আর ছিল গোরা কোম্পানীকে এদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করার কথা। কেমন দেখতে ছিল সেই চপাটি, কে ছেড়েছে সেই চপাটি, কোত্থেকে আসছে, কেউ জানত না। শুধু মাত্র শোনা গেল, এ জনপদের উপর দিয়ে ঘুরে গেছে সেই চপাটি। ··· পারিড্ বন্ধ, গোরা কানিল মাজের সাহাবের দল অশরীরী প্রেতের আতঙ্কে যেন টিপে টিপে পা ফেলছে। তারপরই আচমকা বোম্ ফাটার মত যুদ্ধ শুরু হল। কী সাংঘাতিক তার শেষ।

কাঞ্চন এতক্ষণ অপলক উৎকণ্ঠিত চোখে লখাইয়ের ভাব লক্ষ্য করছিল। তারপর সারা মুখে এক বিশ্রী আলো ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি কাছে এসে বলল, 'তবে কি তোমার—'

বলতে গিয়ে কথা আটকে গেল তার গলায়। হায় ভগবান, যদি তাই হয়, যদি তাই হয়, তবে হয় তো এ জীবনের তার সবই শেষ।

কাঞ্চনের মুখ দেখে লখাইয়ের চৈতন্য হল। শান্ত গলায় বলল, 'তবে কী, বল ?'

কাঞ্চন ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'তবে কি তোমার আগের জন্মের কথা মনে এসেছে ?'

'আগের জন্মের ? ওহো ! সে যে তার আগের জন্মেরই কাহিনী, যে জীবন তার শেষ হয়ে গিয়েছে। সে যে তার গত জন্মের কথা, এখন যে সে লখাই বাগ্দী, মা মনসার বর-পাওয়া জলে-ভাসা ছেলে। তার তু'চোখ ফেটে জল এল। তু'হাতে কাঞ্চনের মুখটি সামনে এনে সে বলল, যদি তাই হয় কাঞ্চীবউ, যদি তাই মনে আসে ?'

হতবাক্ বিহ্বল কাঞ্চনের ঠোঁটে একটি কথা যোগাল না। প্রাণহীন নিস্পন্দ কাঠের মূর্তির মত আড়ষ্ট হয়ে রইল, তু'চোখে ভরা বিস্ময় নিয়ে লখাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

কাঞ্চনকে আরও কাছে টেনে লখাই ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'কোন্ জীবনের কথা তা তো জানি না কাঞ্চীবউ, মনে পড়ে এক লড়ায়ের কথা, সেনাপতির কথা। সেকথা মনে হলে, আমার প্রাণ পুড়ে যায় কাঞ্চীবউ। কাউকে বলি না, তোমাকে বললুম। কিন্তু সে আর আমি মনে আনতে চাই না, না না না।'

কাঞ্চন বলল, 'সেপাইদের সে লড়ায়ে তুমি ছিলে ?'

'হয় তো ছিলাম।'

'কী হ'ল সে লড়ায়ে ?'

'হার হয়েছে।'

'তারপর ?'

'তারপর তো কিছু নেই।'

'সাপে কামড়াবার কথা তোমার মনে নেই ?'

'না।'

'তবে এতদিন তো তুমি এ পান পোড়ানোর কথা বলনি ?'

'আজ তো বললাম। কিন্তু কাউকে আর বল'না এ কথা।'

'তোমার বাড়ী কোথায় ?'

লখাই তীক্ষ্ণ চোখে কাঞ্চনের দিকে ফিরে তাকাল। উৎকণ্ঠা কাঞ্চনের চোখে। প্রশ্ন যেন ভীত সন্ত্রস্ত।

সে বলল, 'অত কথা তো মনে নেই কাঞ্চীবউ। শুধু ওই-কথাই মনে পড়ে মাঝে মাঝে।'

কাঞ্চনের দুই চোখের কোণে বড় বড় ফোঁটায় জল জমে উঠল। ভাঙ্গা গলায় বলল, 'আর যত যন্তন্না হয় তোমার সে কথা মনে এলে ? এমন কান্না পায় ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি একদিন কড়ি ফকিরের কাছে যাও কাঁকনাড়ায়। আজ যে যন্ত্রণা তোমার দেখলুম, মাগো! কোন্‌দিন তুমি এ যন্ত্রণায় অপঘাতে মরবে।'

এবার লখাই হাসল, বিষণ্ণ ক্লান্ত হাসি, 'না, কড়ি ফকির টকির নয়, যন্তন্না হলে তোমার কাছেই ছুটে আসব। এ পানের ভার তোমাকে দিইছি যে!'

কাঞ্চনের বুক ভরে উঠল। লখাইয়ের ভেজা চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি চলে এলে যে কত্তাদের বাড়ী থেকে ?'

'কত্তা অনুমতি দিলেন, তাই।' বলে হঠাৎ কোমরের গাঁট থেকে মোহর ক'খানি নিয়ে কাঞ্চনের হাতে দিয়ে বলল, 'কত্তা দিয়েছে তোমাকে।'

'আমাকে ?'

'হ্যাঁ। বললেন, তোর মেয়েমানুষকে যা খুশি গড়িয়ে দিস্!'

'সত্যি ? অমা গো!' খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে সুখে সোহাগে ঢুলে পড়ল কাঞ্চন লখাইয়ের বুকে। বলল, 'রাগমাগ করল না ?'

'মনে তো হল না। আমি যে সব বললুম!'

'অমা গো!' বলে আবার খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল কাঞ্চন।

সে হাসিতে রাত্রিও যেন মোহিনীময়ী হয়ে উঠল। নিস্তব্ধ অন্ধকার হাওয়া-ভাসা রাত্রি, সে হাসির দমকে নূপুরের তালে যেন নেচে উঠল।

৬

পরদিন সকালে দেখা গেল কাঞ্চনের মুখ ভার। সে বার বার লখাইকে বলল তাকে বাপেরবাড়ী দিয়ে আসার জন্য।

লখাই বলল, 'বেশ তো, সাতদিনের মধ্যে যদি কালীবোঠান না আসে তবে রেখে আসব।'

সে কথা কাঞ্চন শুনল না। কেঁদে বলল সে, 'না এখেনে আমি আর এক দণ্ডও টিকতে পারছি না। দিদি নেই, মধু নেই, গরুগুলোকে খড়বিচুলি খাওয়াতে গেলে কী ফোঁস ফোঁস করে উঠছে। ভাসুর যে ওদের বাপের মত। তুমি একবার বোদাই যাও, ওদের নিয়ে এসগে নইলে নোকেও তোমাকে দুষবে।'

লখাই বলল, 'পূবে তো আমি কোন দিন যাইনি। অচেনা পথ তা'পরে আবার ফিরে আসতে হবে তো আমাকে। কতখানি পথ তা কে জানে ?'

কাঞ্চন ছাড়বার পাত্রী নয়। বলল, 'ভারী তো পথ। মাত্তর চার কোশ হবে বা। আর অচেনা তো কি, জিজ্ঞেস করলে নোকেই বলে দেবে।'

লখাই একমুহূর্ত কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে বুঝল যেতে তাকে হবেই। এমনিতেই কালীবউ, শ্যাম গিয়ে অবধি মুখে অন্নজল তোলেনি সে। সাতদিন অপেক্ষা করতে গেলে কাঞ্চন হয় তো উপোস করে প্রাণ দেবে। সে বলল, 'আচ্ছা দেখি, একবার খিরপাড়ার ছিরিশদাদার সঙ্গে কথা বলে। আগে এট্টু নেয়ে আসি পদ্মপুকুর থেকে।' বলে গামছাটি টেনে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

গ্রীষ্মকাল। বেলা মস্ত। রাত না পোহাতেই সূর্য যেন আকাশে উঠে বসে আছে। এর মধ্যেই তাত ফুটতে আরম্ভ করেছে। তবু খানিক মোলায়েম হাওয়া আছে বলে বাঁচোয়া। নইলে বোধ করি সিদ্ধ হয়ে মরতে হত।

পদ্মপুকুর গ্রামের শেষে। এ চাকলার মধ্যে এটাই বোধ হয় সবচেয়ে বড় পুকুর। পুকুর না ব'লে দীঘি বলাই বোধ হয় ঠিক ছিল। মস্ত উঁচু পাড়। চারদিকে বড় বড় গাছ, লতাজঙ্গলের ঝুপসি ঝাড়ে ছাওয়া। দিনের বেলাও এত নির্জন যে, কেমন যেন গা ছমছম্ করে। রাত্রে নাকি এখানে চোর ডাকাতেরা তাদের নৈশঅভিযান শেষে বসে হিসেব-নিকেশ করে। এত যে গাছপালা, প্রাণজুড়ানো ঠাণ্ডা, তবু একটা পাখীও এখানে ডাকে না। এখানকার ও নীরবতার মধ্যে যেন অশরীরী আত্মার অবস্থিতি অনুভব করা যায়।

পুকুরের কাছাকাছি এসেই লখাই থেমে পড়ল। তার যেন মনে হল, তার পেছনে কিম্বা পাশে পাশে আরও কেউ আসছে। সে

চারিদিকে একবার ভাল করে দেখে নিল। কিন্তু কেউ তো নেই অথচ ধীরে চলা পায়ের শব্দ এখনো শোনা যাচ্ছে, অস্পষ্ট থেকে স্প হচ্ছে। সে পিছন ফিরে দেখল। না, কেউ নেই।

এতটুকুন ভাবতে ভাবতেই সে দেখল তার খানিক দূরের ঝাঁকড় পিপুল গাছটার তলায় নারান তার দিকেই এক দৃষ্টিতে তাকিরে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল, গোল মুখ নারানে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। লাল চকচকে চোখ দুটো যেন জ্বলছে দুখণ্ড অঙ্গারে মত, তাঁর বেঁটে কালো লোমশ শরীরের সমস্ত পেশীগুলো শক্ত হ ফুলে উঠেছে। দুটো সুপুরির মত তার চোয়ালের হাড় রয়েছে ফুটে সামনের দিকে তার খাটো শক্ত শরীর এমনভাবে ঝুঁকে আছে যেন বন্য হিংস্র জানোয়ার শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ওৎ পেতে আছে।

লখাই নারানের মনোভাব সঠিক বুঝতে না পেরে ডাকল, 'নারান ভাই, তুমি এখেনে?'

দাঁতে দাঁত ঘষে চিবিয়ে বলল নারান, 'শালা, ভাই লয়, নারান তোর যম। যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই। শালা, কাল-সাপ! ভেবেছিস আমাদের বাপ-পিতামোর ভিটে আর মাগী নিয়ে ঘর করবি তুই?'

লখাই দু'পা এগিয়ে বলল, 'ছি লারান ভাই, তোমার ভিটেয় তুমি এস, যখন খুশি তাড়িয়ে দেও আমাকে, আমি চলে যাব। কাঞ্চীবউয়ের ব্যাপারের জন্য তুমি আমাকে শাস্তি দেও নারানভাই, আমি যে পানটা দমাতে পারিনি!'

'পারিস্‌নি তো চ্যামনা, ওই পান তোর রেখে যা এখেনে।' বলে

আচমকা পায়ের কাছ থেকে মস্ত একটা মাটীর ঢ্যালা দু'হাতে তুলে সে ছুঁড়ে মারল লখাইয়ের বুক লক্ষ্য করে।

লখাই চকিতে একবার 'লারান ভাই' বলেই ডান দিকে সরে গেল। মাটির ঢ্যালাটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল তার পায়ের কাছে পড়ে। পুনর্বার চোখাচোখি হওয়ার পূর্বেই চোখের পলকে এক লাফে নারান লখাইয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে গলা টিপে পুকুরের খাড়া ধারের অল্প-পরিসর জমির উপর আছড়ে পড়ল। পড়ার সে কী শব্দ যেন দুটো মত্ত হাতি আছড়ে পড়ল।

লখাই শক্ত হাতে নারানের হাত দু'টো ছাড়াবার আপ্রাণ চেষ্টায় ঠেলা দিয়ে নারানকে ফেলে দিতে চাইল। কিন্তু নারান মৃত্যুপণ করে গলা টিপেছে, নিজের শক্ত মাথা দিয়ে লখাইয়ের নাক এবং চোখ ঢুঁ দিয়ে গুঁতিয়ে ভাঙতে লাগল। চাপা গলায় হিসিয়ে উঠল, 'শালা, আমার পেরমায়ুর জন্য মোন্‌সার ছেলে এলি তুই, আজ তোর পেরমায়ু কে রাখে একবার দেখি।'

লখাইয়ের শক্তিও বড় কম নয়। সে এত জোরে নারানের দুই কবজি চেপে ধরেছে যে, ক্রমশ যেন নারানের থাবা শিথিল হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে তার মাথার গুঁতোয় লখাইয়ের নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে শুরু করেছে। লখাই ডাকবার চেষ্টা করল, 'নারানভাই। ...'

নারান লখাইয়ের মাথাটা আলগা করে তুলে আবার ঠুকে দিল মাটিতে। 'শালা ভাই লয়, লারান তোর যম।' লখাই পায়ের চাড় দিয়ে কাত হওয়ার চেষ্টা করতেই নারান হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ডভাবে তার তলপেটে আঘাত করল। গাঁক্ করে একটা শব্দ উঠল লখাইয়ের প্রায় দমবন্ধ গলা থেকে।

শব্দ উঠতেই হঠাৎ দেখা গেল নারানের একটা হাত লখাই গলা থেকে তুলে সরিয়ে দিয়েছে। আবার সেই হাতটা গলায় এসে পড়বার পূর্বেই লখাই ঘাড় কাৎ করে এক প্রচণ্ড ঘুষি কষলে নারানের গর্দানে। ধাক্কাটা সামলাতে না পেরে নারান কাৎ হয়ে পড়তেই লখাই ছাড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু নারান ছাড়ল না। একটা ক্রুদ্ধ আর্তনাদ করে লখাইয়ের কোমর জড়িয়ে ধরল সে। লখাই চীৎকার করে উঠল, 'সাবধান নারান, সাবধান!'

'আগে তুই সাবধান!' বলে নারান একটা হ্যাঁচকা টান দিতে দু'জনেই পুকুরের গড়ানো জমিতে জাপটাজাপটি করে গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু জলে পড়ল না, কাছাকাছি এসে থেমে পড়তেই সুযোগ বুঝে এক লাফে লখাই নিজেকে মুক্ত করে সরে দাঁড়াল। নারানও দাঁড়াল।

যেন দুটো মাটিমাখা ক্রুদ্ধ মোষ রক্তাক্ত চোখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আক্রমণের ছল খুঁজছে। নারান বলল, 'যদি শুয়োরের বাচ্চা না হোস্, যদি কুকুরের মত ওই মাগীর সঙ্গে ঘর না করতে চাস্, তবে লড়।'

এই আচমকা আক্রমণ ও নিজের রক্ত দর্শনে লখাইও তখন দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে। তবু বলল, 'এ ভাল নয় নারাণ, কথা বলে মীমাংসা কর। লোক হাসিও না, সরে যাও।'

নারান শুনল না সে কথা। মুহূর্ত সময় না দিয়ে আবার সে লাফিয়ে পড়ল লখাইয়ের উপর। লখাইও তখন নারানের চকিত আক্রমণ বুঝে নিয়েছে। সে চকিতে সরে যেতে নারান হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ল। তার এই পশ্চাদ্গমনে নারান আরও ক্ষেপে উঠল। সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে লখাইয়ের চুলের মুঠি চেপে ধরল।

লখাই বুঝল নারান ছাড়বে না। এবার পরস্পরে সত্যিই লড়াই শুরু হল। একবার এ ওর নীচে যায়, আবার ও এর নীচে যায়।

লম্বা লম্বা ঘাস জঙ্গল মইয়ে অনেকখানি জায়গা আলোড়িত হয়ে উঠল তাদের লড়ায়ে। ঘন নিঃশ্বাস ও বিচিত্র শব্দ উঠতে লাগল ওদের গলা দিয়ে। ওদের ঘন ঘন পতনে মাটি পর্যন্ত কেঁপে উঠল। বোধ করি সর্বচরাচরও স্তব্ধ হয়ে এ দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফলাফল দেখবার প্রতীক্ষা করছিল।

দু'জনেরই ঘামে শরীর ভিজে উঠেছে, জাপটাজাপটি করতে গিয়ে পিছলে যাচ্ছে। তাতে নারানের খাটো শরীরে কিছুটা অসুবিধা ঘটল। তা ছাড়া, তার ক্রোধের প্রেরণাটাই বড় ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লখাইয়ের শক্তি নারানের চেয়ে বেশি। তাই একবার সুযোগ বুঝে নারান লখাইকে নীচে ফেলেই তার চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। তা বুঝতে পেরেই লখাই নারানের দু'হাত ধরে পা তুলে আচমকা নারানের গর্দানটা আটকে উল্টে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর একলাফে উঠেই নারানের দুই পা ধরে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলল খানিকটা দূরে। লখাইয়ের মূর্তি তখন নারানের চেয়েও ভয়ঙ্কর। মৃত্যু পণ করে বুনো শুয়োরের গোঁয়ের মত সে অবস্থাতেই আবার নারানকে তুলে আছড়ে ফেলল মাটীতে। নারান আর্তনাদ করে উঠল, 'আঃ!'

কিন্তু লখাই ছাড়ল না। সে অবস্থাতেই নারানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার একটা ঠ্যাং পা দিয়ে চেপে আর একটা ঠ্যাং ধরে উপরের দিকে টান মারল। নারান ভয় পেল। শক্তি যদিও বা ছিল, ভয়ে তা নিঃশেষ হয়ে গেল। মনে করল লখাই তাকে চিরে

ফেলার চেষ্টা করছে বাগে পেয়ে। সে অস্ফুট গলায় ডেকে উঠল, 'লখাই !'

ডাকটা কানে ঢোকামাত্র লখাইয়ের দুরন্ত ক্রোধ যেন হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়াল। সে তাকাল নারানের দিকে এবং তার মৃত্যুভীত চোখে চোখ পড়তেই তার সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে এল। সে নারানের পা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল।

নারান মুহূর্ত পড়ে থেকে মাটিতে ভর দিয়ে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে পুকুরের ঢালু পাড় দিয়ে টলতে টলতে উঠে গেল। একবারও ফিরে তাকাল না। একেবারে উপরে গিয়ে একবার সে থম্‌কে দাঁড়াল, মনে হল যেন কিছু বলবে লখাইকে। কিন্তু কিছুই না বলে শুকনো পাতায় মস্‌মস্‌ করতে করতে ফিরে গেল সে।

এমন সময় হঠাৎ একটি যোয়ান মানুষ যেন পুকুরের ধারের জঙ্গল ফুঁড়ে হাসতে হাসতে উঠে এল লখাইয়ের কাছে। মানুষটা প্রায়-ফরসা, মস্ত বড় বড় গর্তে বসা চোখ লাল কিন্তু হাস্যময়। মস্তবড় একজোড়া গোঁফ। কপালে সিঁদুরের দাগ। খালি গা, চওড়া শক্ত গড়ন। বুকে কালো লোম ভরা, মাথায় একরাশ চুল। তাতে এক চিলতে কাপড় জড়িয়ে বেঁকিয়ে গিঁঠ দিয়েছে। সে এসে লখাইয়ের বুক চাপড়ে দিয়ে বলল, 'বারে ব্যাটা বাঃ, কালী কালী বল। একে বলে বীরের ধম্মো। তোমার নাম তা হলে লখাই। চাঁদ রাজার ব্যাটাই বটে! মোন্‌সার কোপে চাঁদের ছ' পুত্তুর ম'ল, লখায়ের কথা মনে করে আবার বুক বাঁধল। বস বস, হাঁপে পড়েছ। বড় রক্ত ঝরছে নাক দে, জল দে আমি ধুইয়ে দিচ্ছি।

লখাই কিছু বুঝতে পারল না, লোকটা কে, কোথেকে এল।
বিস্মিত মনে, ক্লান্ত শরীর নিয়ে বসে পড়ল সে। গায়ের অনেক জায়গা ছড়ে গিয়ে তাতে নোন্‌তা ঘামের দরানি লেগে জ্বালা করতে লাগল তার। কিন্তু এ শরীরে তখুনি জলে নামল না সে।

লোকটা মাথার কাপড়টুকু খুলে জলে ভিজিয়ে ভাল করে লখাইয়ের মুখ নাক ধুইয়ে মুছিয়ে, সেটা দিয়েই হাওয়া করতে লাগল।

কিছুটা দম পেয়ে লখাই ভাল করে লোকটাকে এবং তার সিঁদুরের ফোঁটা ও চোখ দেখে হঠাৎ তার মনটা চমকে উঠল। কাপালিকদের কথা শুনেছে সে। তারা এমনি মানুষকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে অনেক সময় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বলি দেয়। সে জিজ্ঞেস করল, 'বাবাঠাকুরের ঘর কোথায়?'

লোকটা ভাঙ্গা গলায় হেসে উঠে বলল, 'বাবাঠাকুর কিহে, বাবাও লই, ঠাকুরও লই, নাম একটা আছে বটে।'

'তুমি কি এ স্থানপাড়ারই বাসিন্দে?'

'হ্যাঁ। তুমি?'

'মাদ্রালে আমার বাড়ী। মাদ্রাল চেন?'

'চিনি না। শুনেছি। কোথা আসা হয়েছিল?'

'কোথাও না। ফেরার পথে বিশ্রেম হচ্ছিল।'

'এখেনে?'

'হ্যাঁ।' বলে সে মিটমিট করে হাসতে লাগল লখাইয়ের দিকে তাকিয়ে। লখাইয়ের ভীষণ অস্বস্তি হতে লাগল।

সে জিজ্ঞেস করল, 'কী করা হয়?'

'কালী সেবা।'

চমকে উঠল লখাই, সন্ত্রস্ত চোখে তাকাল সে। সন্দেহ তার দৃঢ় হয়ে উঠল। বলল, 'নাম ?'

এবার লোকটা হাওয়া থামিয়ে গোঁফে তা দিতে দিতে পিট পিট করে তাকিয়ে বলল, নামটা শুনবে ? বলব তোমাকে, বলব ? বীরপুরুষ তুমি, তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। তবে কালীর দিব্যি করে বলতে হবে, কাউকে কোন দিন আমার কথা কিছু বলবে না।'

সন্দেহে মন দুলছে লখাইয়ের। সাত-পাঁচ না ভেবে সে দিব্যি করে বসল কালীর নামে।

লোকটা স্থির দৃষ্টিতে লখাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নাম মনোহর বেদে।'

মনোহর বেদে! আচমকা যেন বজ্রাঘাতে প্রাণহীন আড়ষ্ট হয়ে গেল লখাই। একবার কেঁপে উঠল তার সমস্ত শরীর, বোধ করি আতঙ্কে তার লোমকূপ খাড়া হয়ে উঠল। মনোহর বেদে যে দুর্দান্ত খুনী ডাকাত, তার নামে সারা পরগনা থরহরিকম্পমান! বুঝি হাওয়া স্তব্ধ হল, পদ্মপুকুরের জলও বোধ করি গেল স্থির হয়ে। তার সামনে মনোহর বেদে ? তাকে কেউ কোন দিন দেখতে পায় না! দিনের বেলা যে থাকে মাটির তলায়, রাত করে আসে আকাশের ওপর দিয়ে!

মনোহর লখাইকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে বলল, 'ভয় পেয়ে গেলে তুমি বীরপুরুষ হয়ে ? কালী কালী বল। তবে দেখো, তোমার কত্তাদের আবার খবরটা দিয়ে দিও না। দেবে নাকি ?'

লখাইয়ের মনে হল ডাকাতও কি এমন করে কথা বলতে পারে ? এ তো তার ছিনাথকাঠুরে বন্ধুর মত, সদাশয়, অমায়িক, হাস্যময়। তাকে

আদর যত্ন করেছে। ভয় কাটিয়ে সে বলল, 'কালীর নামে দিব্যি করেছি না? কিন্তু তুমি ডাকাত কেন?'

মনোহর হেসে উঠল। বলল, 'ডাকাত কোথায় দেখলে? কোথায় আমার লেঠেল বরকন্দাজ ঘোরসওয়ার যে লুঠ-ডাকাতি করব? ডাকাত হল তোমার ফরাসডাঙ্গার বড়সাহেব আর মানিকঠাকুর। ওদের দল আছে, তলোয়ার বন্দুক আছে, গণ্ডা গণ্ডা ছিপ লেটকো আছে। আমার কী আছে?'

লখাই বলল, 'তবে যে শুনি—'

বাধা দিয়ে বলল মনোহর, 'আহা, যা রটে তা কিছু তো বটেই। নইলে কোম্পানী আর বড় বড় বাবুরা এত খাপ্পা কেন, বল? তা বলে কি ডাকসাইটে জমিদার আর কোম্পানীর ফিরিঙ্গিদের মত দিনেদুপুরে লুটতে পারি আমরা? এই তোমার ঘাঁৎ বুঝে ডাক, নয় তো খাজনা কোন কোন সময় রাতবিরেতে ···। আচ্ছা, এবার বল তো তোমাদের লড়ায়ের বিত্তান্তটা কী? ওই নারান না কী নাম ওর, কী হয়েছে তোমার সঙ্গে ওর?'

লখাই সব কথা বলল মনোহরকে, শুধু নিজের আত্মপরিচয়টুকু বাদ দিয়ে।

মনোহর ঘাড় দুলিয়ে লখাইয়ের পিট চাপড়ে বলল, 'ও, তা হলে বেহুলা করে নিয়েছ। বেশ বেশ, এই তো বীরের ধম্মো, লড়াই করে জিতে নাও। আচ্ছা, এবার তা হলে চলি। দিনমানে আর বসব না।'

লখাই তাড়াতাড়ি বলল, 'তা হলে দাদা—'

'দাদা?' হঠাৎ যেন চমকে গম্ভীর হয়ে গেল মনোহর। বলল, 'তুমি

দাদা বললে আমাকে? কালী কালী বল। সাতকুলে যার কেউ নেই, সেই ডাকাতের তুমি ছোট ভাই?'

লখাইয়ের হাত চেপে ধরে বলল, 'বেশ, তাই সই, তোমার কুল থেকেও 'কুল নেই, মোনসার বরে মরা মানুষ পিথিমী দেখেছ তুমি আবার। তুমি আমার ছোট ভাই। তবে মনা বেদের ঘর নেই, পথে ঘাটেই ভায়ের সঙ্গে দেখা হবে। চললাম।'

বলে তাড়াতাড়ি পুকুরের উত্তর ধার দিয়ে যেন সে চকিতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

৭

কালীবউ ও মধুকে নিয়ে শ্যাম গরুর গাড়ী নিয়ে যখন কেউটে দিয়ে বরুতির বিলের পাশ কাটিয়ে মালতীর শেষ প্রান্তে শ্বশুরবাড়ী বেদোই গাঁয়ের কিনারায় এসে দাঁড়াল তখন শীতের মিষ্টি রোদের আমেজে রোদ পোয়াচ্ছে দুপুর। এতক্ষণ সে গরুদুটোকে একটা কথাও বলেনি, ফলে অনেকখানি দেরি হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল সে ঝিমুচ্ছিল, কিন্তু সে সারা পথটাই কী যেন ভাবছিল।

গাড়ী ওখানে এসে দাঁড়াতেই কালী ভাবল শ্যাম বোধ হয় তামাক খাবে। সে মধুকে বলল, বোদাই গাঁ দেখিয়ে, 'ওই মাঠটা পেরিয়েই তোর দিদি-দাদার গাঁ।'

মধু তড়াক্ করে এক লাফে কালীকে ধাম্‌সে ছইয়ের সামনে এসে বসল। এতখানি জ্ঞানে আর সে কখনো দিদিমার কাছে আসেনি।

খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'দিদিমা খুব বুড়ি হয়ে গেছে, না রে মা ?'

কালী বলল, 'আমিই বুড়ি হলাম তা তোর দিদিমা।'

'আর দাদা ?'

'বাবা ? বাবা এখনো খুব শক্ত। মাঠে যায় এখনো। আর তুই এত বড় ধাড়ি, লাঙ্গল চালাতে শিখিসনি আজো।'

'মিছে বলিস্‌নে মা। গঙ্গাধারের পৃথক জমিটে তো এবার আমিই চষলাম রে।'

বড় দুঃখে বাড়ী ছাড়লেও অনেক দিন-পরে বাপ-মাকে দেখতে পাবার আনন্দে কালীর মনটা কিছুটা হাল্‌কা হয়ে উঠেছে। ছেলের সঙ্গে হঠাৎ নানারকমে খুনসুটি লাগাল সে। বলল, 'ছাই, তুই চষেছিস না, তোর বাপ চষেছে।'

মধু বলল, 'জিজ্ঞেস করে দ্যাখ্‌ না বাপকে।'

শ্যাম তখন সত্যি সত্যিই কলকে সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে হুঁকো টানতে শুরু করেছে।

কালী বলল, 'তা একেবার বাড়ী গে-ই না হয় হুঁকো ধরতে ? এটুকু আর বসলে কেন ?'

শ্যামের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না, কেবল দীর্ঘ স্তব্ধতার পর থেকে থেকে হুঁকো টানার শব্দ শোনা গেল। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ বলল সে, 'মধু, ভেতর থেকে দু আঁটি বিচুলি দে দিনি বলদ দুটোকে।'

শিক্ষিত বলদ দুটো কান নেড়ে, চামড়া কাঁপিয়ে লেজ দুলিয়ে ফোঁস ফোঁস করে উঠল।

কালী তার বিস্মিত মুখ বাড়িয়ে বলল, এখন আবার বিচুলি দেবে কেন গো ? পো.খানেক পথ তো বাকি ?'

আরও কয়েকটা হুঁকোয় টান দিয়ে কলকেটা নলচ্যুত করে শ্যাম বলল, 'বোদাই আর যাব না, বাড়ী ফিরব।' গাড়ীর মধ্যে মা-ছেলে চকিতে একবার চোখাচোখি করে কালী নেমে এসে বলল, 'তবে এত ঠাট করে বেরুলে যে ?'

—'বরুলে কি আর ফিরতে নেই ?' শ্যাম কলকেটা উপুড় করে আগুন ঢেলে ফেলল।

—'ফিরতে হয় কি সে এতখানি পথ এসে কুটুম বাড়ীর কানাচ থেকে ?' হতাশায় দমে যাওয়া কালীর মন উত্তপ্ত হয়ে উঠল। —'ভ্যালা মানুষ বাপু। আবার সে কোন পহরে ফিরে যাবে, কখন খাবে ছেলেটা ! পথের মাঝে একি অনাচ্ছিষ্টি ?'

হুঁকো কলকে রেখে বলদ জুটোর গা হাতাতে লাগল শ্যাম। তারপর হঠাৎ কালীর কাছে এসে বলল, 'আমি পারবো না বউ বাড়ী ছেড়ে থাকতে, তিলেকও নয়। মন বড় কাঁদছে। এ ভিটে ছেড়ে আমি কোথাও থাকতে পারবো না।'

কালী একটু চুপ করে থেকে মাথা নেড়ে বলল, 'এ তো আমি তখনি জানি। সাধ করে কি আর কাঞ্চীকে চোখ টিপেছিলাম তা বলে ঘরের দরজায় এসে তুমি আজ ফিরে যাবে ? আমি যে কতদিন বুড়ো বাপ-মাকে দেখিনি গো ! মল কি চল একটু চোখের দেখাটাও দেখে যা'ব না ?'

বলতে বলতে তার চোখ ছলছলিয়ে উঠল। মধুরও প্রায় তাই শ্যাম পশ্চিম দিকে তাকিয়ে একটা মস্ত নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

'চ তা হলে এসেছি যখন। তবে আজকের রাতটাই, কাল ভোরে-ভোরেই আবার ফিরবো। আজ রাতে তোর সঙ্গে খানিক পরামর্শ করব।'

'আমার সঙ্গে? বাবাগো!' কালী চোখ বড় করে বলল, 'সেটুকু বাড়ীতে করলেই তো হ্যাটা চুকত?'

শ্যাম বলদ দুটোকে বলল, 'চ বাবারা, একেবারে কুটুমবাড়ীতে গিয়েই খাস্‌ 'খনি।'

আনন্দের চোটে মধু বলল, 'দেও বাবা, পাচনটা নিয়ে আমি আগে বসি।'

শ্যাম বলল, 'হ্যাঁ, তা'পর তোর পেছনে আবার আমি একটা পাচন নে বসি।'

এক রাত মেয়ে জামাই নাতীকে প্রাণভরে আদরে সোহাগে ভরিয়ে পরদিন খানিক বেলায় বুড়োবুড়ি প্রাণের আশ না মিটিয়ে চোখের জলে তাদের বিদায় দিল। তাদের আত্মীয়স্বজনহীন সংসারের কথা মনে করিয়ে দিয়ে পূজোর সময় এ বনবাসের জীবনে মেয়েজামাই বিশেষ করে নাতি আসতে কিছুতেই না ভোলে বারবার চোখের জলে সেকথা মনে করিয়ে দিল।

কালী আর মধুও খুব খানিক কাঁদল। শ্যাম শ্বশুরশাশুড়ীকে মাটিতে গড় করে বলল, পূজোর সময় আর কেউ না হোক্, মধুকে পাঠাতে সে ভুলবে না। তারপর ফিরে চলল গাড়ী।

ফেরার পথে এক কাণ্ড ঘটল।

যাবার সময় তারা কেউটে দিয়ে গিয়েছিল। আসবার সময় উচ্ছেগড় হয়ে সোজা মাঠের ধারে নাবাল পথ ধরে এগুল সে।

অদূরেই অজগর সাপের মত দীর্ঘ রেললাইন পাতা হয়েছে। কেউ বলে লাইন নাকি নৈহাটি অবধি গিয়েছে। কেউ বলে কাঁচড়াপাড়া অবধি গিয়েছে। যাই হোক্ লাইন গেছে উত্তরে।

ইতিপূর্বে সেনপাড়া জগদ্দলের সবাই এসে রেললাইন দেখে গেছে। সবাই দূর দূর থেকেই দেখেছিল। কিন্তু কালো দুলের মেঝো ছেলের নাতি বিষ্ণু নিতান্ত কৌতূহল চাপতে না পেরে কাছে এসে গাড়ীর গায়ে একটু আঙ্গুল ছুঁইয়েছিল। হায়, বেচারীর সে কী খোয়ার। গঙ্গায় নাইয়ে তুলসীর ছিটা দিয়ে ঘরে তোলা তো হয়েইছিল উপরন্তু প্রহারটাও কম খেতে হয়নি। কেন না, ওই গাড়ী অভিশপ্ত শুধু নয়, এত বড় অমঙ্গল নিয়ে তার আবির্ভাব হয়েছিল যে, গাড়ী চলবার পূর্ব মুহূর্তেই এক ব্রাহ্মণ শ্যামনগরে ট্রলি চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল। ব্রহ্মহত্যা করেছে ওই রেললাইন। কেউ বলে, ঠাকুর নাকি তুলে ফেলতে চেয়েছিল রেললাইন, কেউ বলে মন্তর দিয়ে ট্রলি থামাতে চেয়েছিল বামুন কিন্তু ব্রহ্মতেজকে অবহেলা করেই সে গাড়ী চলেছে। বোঝদার বাবু মহাজনেরা বলেছে, ওটা দৈব দুর্ঘটনা, বামুন নিজেই নাকি রেলের কাজ করত। যাই হোক্, এতবড় অধর্মের কলের আশঙ্কায়, কলসী-কলসী গঙ্গাজল ঢেলেছিল মেয়েবউরা রেলপথে। হে যন্ত্র, এ দেশে তোমার আবির্ভাব মঙ্গলময় হোক্, এ আশা নিয়েই সেদিন পথের ধারে ধারে সিঁদুর মাখানো মঙ্গলঘট পাতা হয়েছিল।

আর এ সারা চাকলার মহাজনেরা সেদিন শ্যামনগরে কী ভোজটাই দিয়েছিল।

হায়রে মঙ্গল। নিঃশ্বাস পড়ল শ্যামের। কার মঙ্গল, কিসের মঙ্গল,

হায়রে অনামুখো রটানো দেবতা! তা কি ছাই এ শ্যামের মত মানুষেরা এক চিমটি ঠাহরও পাবে না! নাকি সে মঙ্গল কোম্পানীর গা থেকে হাওয়ায় তাদেরও শরীর স্পর্শ করবে! জল ছেড়ে কোম্পানী ডাঙ্গায় বাণিজ্য ফাঁদল, তার জুড়ি দেশী মহাজনে টাকা দিয়ে কবিয়ালকে দিয়ে গাওয়াল ব্যবসার মহিমাকীর্তন।

কি বা অপরোপ এহ র‍্যাললাইন লাইন দেখি।
মুঙ্গেরে মুটকির ঘি, বাখরগঞ্জের চাল
দেশ ছেড়ে বিদেশে যায়, যেন পলকে পড়ে ঢেঁকি।

ইতিমধ্যে রেললাইনের উঁচু জমির কাছে গাড়ীটা আসবার আগেই বলদ দুটো থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল দূরে একটা ঝক্‌ ঝক্‌ শব্দ শুনে। এবং নাক উঁচু করে যেন কোন বিপদের গন্ধ শুঁকছিল। তারপর আচমকা তাদের জীবনে একেবারে নতুন এক বিরাট দানকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মাটি কাঁপিয়ে হা হা করে ছুটে আসতে দেখে এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে পূবদিকে প্রাণপণ মারল ছুট।

শ্যাম হা হা করে উঠল, ছেড়ে দেওয়া দড়ি ধরে জোরে টান মারল, চীৎকার করে ফিরতে বলল। কিন্তু সে দানবীয় শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাড়ী নিয়ে বলদ দুটো উল্কা বেগে ছুটে চলল। গাড়ী কখনো বাঁয়ে, কখনো ডাইনে কাৎ হয়ে, কখনো ধপাস্‌ করে গর্তে পড়েই আবার হুড়মুড় করে ছুটল দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে। কালী মধু জড়াজড়ি করে চেঁচিয়ে উঠল। সে চীৎকার কানে ঢুকতেই একবার চোখ ফেরাতে গিয়ে শ্যাম দেখল রেলইঞ্জিনের দুটো গোরা সাহেব হাততালি দিয়ে হাসছে। রাগে দুঃখে আগুন জ্বলে উঠল শ্যামের মাথায়। অন্ধের মত পাচন দিয়ে গরু দুটোকে পিটতে লাগল

সে। যা মুখে এল গালাগাল দিতে লাগল। তাতে ফল ফলল উলটো। মার খেয়ে বলদ দুটো থামল না। আরও তীব্র বেগে ছুটল। একপাশের চাকা সরে গেছে তখন খানিক, দুইটা হেলে পঁড়েছে বাঁয়ে, গাড়ীর পাটাতন আলৃগা হয়ে কালী মধুকে দুইয়ের মাথায় ঠুকে দিতে লাগল। এক দারুণ অপঘাতে মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। নামবার উপায় নেই, থামবার উপায় নেই। পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অনিশ্চিত বিপদের হাতে প্রাণ সঁপে দিয়ে শ্যামও তখন গাড়ী আঁকড়ে বসে আছে।

উচ্ছেগড়ে খালের পুলের কাছে বলদ দুটো হঠাৎ শান্ত হয়ে ঘাড় নুইয়ে চোখ পাকিয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ মার খাওয়ার জন্য প্রস্তুত। গাড়ীটা তখন একদিকে বেঁকে হেলে গেছে। ভিতরে কালী মধু মৃতপ্রায়। নেমে পিছন দিয়ে আসতেই শ্যাম দেখল কালীর উরুৎ রক্তে ভেসে গেছে। দু'হাতে পেট চেপে ধরেছে। মধুর ধাক্কা খেয়ে ঠোঁট কেটে গেছে।

শ্যাম আঁৎকে উঠল; 'কালীবউ, কালীবউ, কী হল রে?'

কালী একবার উঁ করে শব্দ করল মাত্র। মধু এতক্ষণে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

লোকজন জড়ো হল কয়েকজন। ঘোমটা-দেওয়া বয়স্কা মেয়েমানুষ একটি কালীকে নামতে বলল। নামলে, দেখেশুনে সে বলল, 'ভয়ের লয় বটে, বোধ হয় রেতু হয়েছেল, না রে বেটি?'

কালী এ দারুণ বেদনাতেও লজ্জায় ঘোমটা টেনে দেওয়ার চেষ্টা করে ঘাড় নাড়ল।

সামনেই এক চাষীর ঘরে সবাই উঠল। মধু এখন নিজের জন্য নয়, মায়ের রক্ত দেখে কান্না জুড়েছে কোঁস কোঁস করে।

শ্যাম কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে দুরন্ত রাগে দাঁতে দাঁত ঘষে গাড়ীর ভিতর থেকে একটা লাঠি বের করে হিসিয়ে উঠল গরু দুটোকে। 'শালা ভাগাড়ের মড়া!

গরু দুটো মার খাওয়ার জন্য যেন প্রস্তুত হয়েছিল। কেবল ভয়ে তাদের নাক দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছিল ফোঁস ফোঁস করে, আর মাথাটা নুইয়ে দিয়েছিল সামনের দিকে।

শ্যাম মাথার উপর দিয়ে সাঁ করে লাঠি ঘুরিয়ে এনে মারতে গিয়েও ঘা দিল সাঁকোর বাঁধানো ধারে। তারপর হঠাৎ লাঠিটা মাটিতে ফেলে দিয়ে এক মুহূর্ত বলদ দুটোকে দেখে তাড়াতাড়ি খালের ধারে নেমে গিয়ে চোখে জলের ছিটা দিতে লাগল, 'অবোলাজীব তোরা পানভয়ে ছুটেছিস্, তাতে পানের ভয়ে তোদের আমি কেমন করে মারব!'

কিন্তু তার দুর্ভাগ্যে সেই ইঞ্জিনের গোরা সাহেব দুটোর উল্লসিত হাসির কথা মনে করে দাউ দাউ করে জলতে লাগল তার বুক আর বার বার বলতে লাগল, 'কোন্ পাপে, মাগো, কোন পাপে!'

এইদিন সন্ধ্যায় যখন সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে শ্যাম কালীবউকে আর মধুকে নিয়ে ফিরল তখন সারা সেনপাড়া-জগদ্দলে রাষ্ট্র হয়ে গেছে যে, মদনের বউ কাতুকে নিয়ে নারান দেশত্যাগ করেছে আজ দুপুরে। কোথায়, তা কেউই জানে না।

তখন শ্যামের মনে পড়ল গত রাত্রে কালীর সঙ্গে তার আলোচনার কথা। শ্যাম বলেছিল, লখাইকে বে দিলে হয় তো এ দুর্ঘটনা ঘটতো না। কিন্তু কালী তাকে বুঝিয়েছে, হাজার বিয়ে দিলেও কাঞ্চন-লখাইকে ঠেকানো যেত না। উদাহরণ স্বরূপ সে নারানের স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা, দুর্ব্যবহার ইত্যাদি সরলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে এবং এও

বুঝিয়ে, দিয়েছে শ্যাম যাই মনে করুক না কেন, অধর্মই হোক, নাবি কালীর মনটাই কালো, কিন্তু এ ব্যাপারে সে যেন তেমন দুঃখিত হয়নি। এখন শ্যাম যদি আঁট দিয়ে সংসার দেখে তবেই বাঁচোয়া, নইলে ঘরের দুর্দশা ঠেকানো যাবে না। আর নারান যদি নিতান্তই এসবে বাদ সাধে, তবে তার না হয় বিয়ে দেওয়া হোক আবার। নয়তো যদি সম্ভব হয় *কাঞ্চনকেই নিজের করে নিক। লখাই যদি কাঞ্চনকে নিয়ে কোথাও চলেই যেত, তবে শ্যামের কিছু করার ছিল কি? কিন্তু লখাই তা যায়নি. উপরন্তু যেন শ্যাম এবং কালী বউয়ের শাস্তি মাথা পেতে নেওয়ার জন্য* অপেক্ষা করে আছে। আর কাঞ্চন-লখাইয়ের কথাও ভেবে দেখতে হবে বৈকি!

শ্যাম ফিরে যখন কাতুকে নিয়ে নারানের চলে যাওয়ার কথা শুনল, তখন মনটা তার সত্যিই ভাইয়ের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল। মনের মধ্যে কাঁটার খচখচানি থাকা সত্ত্বেও সে স্বীকার করল, জীবনভর নারান তাকে জ্বালিয়েছে, গাঁয়ে ঘরে মাথা নুইয়েছে এবং সংসারে থেকেও সে চিরকাল সংসারের বাইরে থেকে নিরন্তর বিপদ ও বিপর্যয় ডেকে এনেছে। এবং বিস্মিত হল সে লখাইয়ের কাণ্ড দেখে, যখন লখাই তার পায়ের কাছে বসে পদ্মপুকুরের ধারে তার সঙ্গে নারানের মারামারির কথা বলল। সে চোখের জল রোধ করতে না পেরে লখাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'হারামজাদা খুন হলেও আমি তোমাকে দুষতুম না, লখাই। আজ আমি আবার নতুন করে ভাই বলে তোমাকে এ সংসারের সব ভার দিলুম।' সে তুষ্ট হল এবং স্বস্তি পেল লখাইয়ের কৃতজ্ঞতা, দৃঢ়তা ও এ-সংসারের প্রতি প্রাণের টান দেখে। বলতে গেলে লখাই তাকে জয় করল।

কিন্তু অধরার গলাবাজীর শেষ নেই। নারানকে ছেড়ে সে কখন শ্যামকে নিয়ে পড়েছে। সহ্য করতে না পেরে শ্যাম অধরার গলায় পা দিতে গিয়েছিল, কিন্তু লখাই তাকে ফিরিয়ে এনেছে।

৮

ইতিমধ্যে সেনবাবুদের বাড়ীতে উৎসবের কলরোল তখনো শেষ হওয়ার নাম নেই। খাওয়া দাওয়া, গান বাজনা, লাঠিখেলা, কুস্তি, কবিগান, যাত্রা বিরামবিহীন চলল ভিক্টোরিয়ার ভারতেশ্বরী উপাধি ও দেশের শাসনভার গ্রহণের উল্লাসে।

কিন্তু সেনবাড়ীর উৎসবে সেনপাড়া জগদ্দলকে এত নিষ্প্রাণ ও বিমর্ষ কোন দিন দেখা যায়নি শুধু নয়, ঘরে ঘরে এক দারুণ উৎকণ্ঠায় ও হতাশায় দম বন্ধ হয়ে আসছে। মুখে মুখে শুধু খাজনা বৃদ্ধি, জমি হাতছাড়া, ফসল উধাওয়ের কথা। মাথা চাপড়ানো, বুক চাপড়ানো। শোনা গেল, শ্রীরামপুর থেকে যে খবরের কাগজ বেরোয় তাতে নাকি কোম্পানির খাজনা আইনের সম্পর্কে কি সব লেখা হয়েছে এবং সেই খাজনা আইনের অসারত্ব চোখে আঙুল দিয়ে চাষীপ্রজাদের দুর্দশার কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু সে মায়া-বাড়ানো আইন যাদের জন্য তাদের কোন আশা নেই, ভরসা নেই। দুরন্ত অভিশাপে ও ক্ষোভে ঘরে ঘরে নিজেদের মধ্যে বিবাদ আর কান্নাকাটি। মহাজনেরা ও জমিদারেরা দুষ্ট সওয়ারের মত চাষীপ্রজাদের ঘাড়ের উপরে ঋণের বোঝা নিয়ে চেপে বসল।

এমনি সময় খবর এল, নারান কালুকে নিয়ে রিষড়ের চটকলে কাজ

করতে গিয়েছে। শ্যাম এতদিন বাদে নারানকে সত্যিই অভিশাপ দিল। লখাই ভাবল, কলেই যদি খাটতে যাবি হতভাগা, তবে সেদিন আমার হাতে প্রাণ দিতে তোর এত প্রাণের মায়া কেন হয়েছিল ?

গঙ্গার বুকের উপর দিয়ে বজরা ফিরে আসছে দিল্লী থেকে উৎসব করে। বাঈজীর মিষ্টি গলার গান, নাচের নূপুরধ্বনি দুধারের জনপদ দিয়ে যেতে লাগল ছড়িয়ে। যমুনা জাহ্নবী পেরিয়ে হুগলী নদীতে এসে পড়ল ঢোলকরতালের ঝমাঝম 'রামা হো' শব্দের তাণ্ডবে উৎসবের জোয়ারে। নপুংসকের মেয়ে বাঈজীর পোশাকে উৎকট কামোত্থানের লাগ ঝমাঝম্ নাচে বজরার ছাদে হল্লা মাতালের।

৯

গঙ্গায় জোয়ার ভাটা খেলে। দিন আসে যায়।

শুক্রবারণ মুসলমানদের জুম্মাবার। রমজানের মাস সেটা। সারা দিনমান উপোস, তারপর কিছু জলযোগ।

বেলা শেষে আজানে বসে গনি মিঞার মনটা কিছুতেই ভাল বসল না। চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠল গঙ্গার ধারের প্রার্থনাতে বিঘে জমির ছবি। 'ছবি তো নয়, যেন ননীমাখন। খাণের বোঝা এত বেড়ে উঠেছে যে, নিঃস্ব হওয়া ছাড়া কোন গতি নেই। সেই জমি আজ বেহাত হতে বসেছে। এ লাহা ইল্লাল্লাহ্ মোহাম্মদের রসুলাল্লাহ্! এ কি দিন এল। কোন্ গোস্তাকিতে! কার গোস্তাকিতে!

সন্ধ্যাবেলা সামান্য দুটো কলাই ভেজানো গুড় দিয়ে খেয়ে বিবি

লতিফাকে বলল, 'পিরানটা দে তো গোলামের মা, নগিন মহাজনের কাছে একবারটা ঘুরে আসি।'

লতিফা গনির দ্বিতীয় পক্ষের বিবি। প্রথম বিবি একটা রুগ্ন বছর বারোর ছেলে রেখে গত সনের ওলাউঠায় মারা যাওয়ার পর লতিফাকে সে নিকা করেছে। গোলাম লতিফার আগ পক্ষের সন্তান। সেই সন্তানসহই লতিফাকে ঘরে এনেছে সে। লতিফার বয়স অল্প তো বটেই, মুসলমানপাড়ায় তার সৌন্দর্যের খ্যাতিও আছে। সৌন্দর্যের জন্যই গনির জীবনে লতিফা যা বয়ে এনেছে তা হল, একদিকে আওরতের প্রতি তার অতিরিক্ত টান ও সাংঘাতিক মোহ, অন্যদিকে প্রচণ্ড অবিশ্বাস নিজের দারিদ্র্য ও কুলমর্যাদাহীনতার জন্য। একমাত্র এই কারণেই মুসলমানপাড়ার অর্থবান ঐশ্বর্যবান শরাফৎ মিয়ার সঙ্গে তার একটা গোপন বিদ্বেষের অন্তঃস্রোত ক্রমাগত বেড়ে উঠেছে। ধনমদে মত্ত শুধু নয়, শরাফৎ সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার মোগল শাসনকর্তা ইসমাইল খাঁয়ের বংশীধর বলে পরিচয় দেয়। বোধ করি বাদশা বংশের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়েই সে একটি ছোটখাটো হারেম তৈরি করেছে বাড়ীতে। গোটা সাতেক বিবি নিয়ে তার ঘর। মুসলমানপাড়ায় সামাজিক ও বৈষয়িক ক্ষমতার প্রাবল্যে সকলেই কিছুটা সন্ত্রস্ত বটেই, সমস্ত ব্যাপারেই সে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে অনেক সময় অনেকের সর্বনাশই ঘটিয়ে ছেড়েছে। সেনবাবুদের সঙ্গে তার মোহাব্বত গভীর, কোম্পানীর সাহেবদেরও সে খুব প্রিয়। গোরাদের পার্বন উৎসবে তার নিমন্ত্রণ হয়, মুসলমানদের পালপার্বণে নিমন্ত্রিত হয় গোরারা।

লতিফাকে গনি নিয়ে আসার পর শরাফৎ স্পষ্টই বলেছিল, 'বেল

দেখে কাকের নোলায় জল। গনির উচিত লতিফা আমার মোকামে তুলে দেওয়া। অন্যথায় লতিফা তাকে পরিত্যাগ করবে। একমাত্র শরাফতের বিবি হওয়া ছাড়া লতিফার গত্যন্তর নেই।'

পিঁপড়ে-হাতি সম্পর্ক হলেও গনি বলেছিল, 'আমার হাঁসুয়ার যা ধার আছে তাতে অমন শরাফতের মত এক গণ্ডাকে এক কোপে খতম করে দেওয়া যাবে।'

শরাফতের মত প্রতাপশালী লোক যে সেই মুহূর্তেই এর প্রতিশোধ গ্রহণ করেনি তার পেছনে কারণ ছিল। তার বিশ্বাস ছিল, গনিকে অবস্থার দায়ে তার কাছে আসতেই হবে। লতিফা আরও দশবছর যদি গনির ঘর করে, তারপরেও তাকে নিয়ে ভোগ করা এমন কিছু ঠকবার মত হবে না। কারণ লতিফার রূপের আগুন নিভবার নয়।

গনির পূর্বপুরুষেরা সকলেই সুতা তৈরি করত। কোম্পানীর দৌরাত্ম্যে যখন জোলারা অনেকেই জাতব্যবসা ছেড়ে মাঠে নামল তখন থেকে তারা মাঠের মানুষই হয়েছে। কিন্তু জমির পরিমাণটা চিরকালই কম ছিল। যাদের জমি এবং ফসল নিয়েই শুধু কারবার ছিল তারা প্রতিমুহূর্তে জমি বাড়াবার কথাই ভেবেছে। তাদের সে অবসর ছিল না। আজ দুর্দিন এতই গভীর যে, যাদের জমি ও বাগান বেশি ছিল, ঘোড়দৌড়ের দ্রুত খুরাঘাতের মত অতিরিক্ত খাজনার চাপে তারাই মুমূর্শ হতে বসেছে। জোলা তাঁতীর এ দুর্দশার সঙ্গে ছোটখাট নিম্ন কৃষকেরাও তাদের সঙ্গে বসেছে ফতুর হতে। সুদিনে জোলা তাঁতীর অন্তহীন কাজের ফাঁক ছিল না। জমি তাদের ভাগেই থাকত। সেই সমস্ত জমি আজ হয়েছে ছিন্নভিন্ন, হাজার

টুকরো। এসব গ্রামের দিকে তাকালে আজকাল মনে হয়, দু-এক ঘর কুমোর ও ওস্তাগর ছাড়া কোন শিল্পের কারিগর কেউ ছিল না, অধিবাসীরা জীবনভরই বুঝি চাষী। এমন কি, কাঁসা পেতলের কারিগরদেব ভিড়ও হাটে কমে গেছে। নতুন রকমের বিলাতী হালকা রূপালী বাসনে বাজার ভরে উঠেছে। দেশী মহাজনেরা বিলাতী মালের কারবারী হয়েছে।

লতিফা বলল, 'রোজার দিনেও মাঠঘাট করে এসে এখন আবার নগিনের কাছে কেন?'

কেন? সত্যিই শত বুদ্ধিসুদ্ধি থাকলেও অওরতের জাতটা ভারী বোকা। হুঁকায় একটা বিলম্বিত টান দিয়ে এমন আসন্ন বিপদের মুহূর্তেও হেসে বলল, 'কেন বল দেখি?'

স্থির দৃষ্টিতে গনির দিকে তাকিয়ে লতিফা বলল, 'কর্জার ফিকিরে বোধ হয়?'

হুঁকো টেনে ঘাড় নেড়ে তারিফ করল গনি লতিফার বুদ্ধির। আবার বলল, 'কেন বল্ তো?'

কিন্তু লতিফার মুখে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বলল, 'ঈদের সওদা করতে লাগবে তাই।'

এবার বিস্ময়ে চোখজোড়া কুঁচকে লতিফার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে হঠাৎ হাসতে গিয়ে হাসতে পারল না গনি। একটা দুর্বোধ্য গোঙানি শোনা গেল তার গলায়। বলল, 'ধানটা উঠলে আবার দেনা শোধ করে দেব। উপায় তো নেই। পান্নু ঠাউর বলছিল পরশুকে আমাবস্তে, যা হোক করে পরবটা মানাতে লাগবে তো!'

কিন্তু লতিফার মুখে যেন অন্ধকার আরও ভারী হয়ে এল। নিঃশব্দে

এবং কোন কথা না বলে পিরানটা গনির হাতে দিয়ে চলে গেল সে।

লতিফার এ নীরবতা, এই কি-যেন-কি-থাকা নৈঃশব্দ্য গনির মনটাকে সন্দেহে ভারী করে তোলে। মনে করে, লতিফা বুঝি প্রতিমুহূর্তে নিজের এ দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে চুপ করে থাকে। আফশোশ নিয়ে ঘর করে সে গনির সঙ্গে। একথা মনে করলে তার রাগ হয়, বেদনার চেয়ে অপমানিত এবং সেজন্য এক অদ্ভুত জ্বালায় বুকটা জ্বলে তার। কারণ জিজ্ঞেস করলে লতিফা বলে, 'কি বলব বল, কথা বললে আল্লা কি আমাদের কিছু দৌলত দেবে?'

কিন্তু অভাবের কথা বিবির সঙ্গে বসে আলোচনা করবে ততখানি উজবুক যেন কেউ গনিকে ঠাউরে না বসে। সে জবাব দেয়, 'আরে তুই মাগী আমার ঘরে গতর খাটিয়ে পেট ভরা না, দৌলতে তোর কী হবে?'

সে হঠাৎ উঠে লতিফার কাছে গিয়ে বলল, 'গোমরা মুখ করে চলে এলি যে?'

'কী কথা বলব?'

'বলবি আবার কী? তোর গোমরা মুখ দেখব বলে বুঝি মহাজনের কাছে যাচ্ছি?'

'সে কি বড় সোখের কথা।'

সুখের কথা নয় ঠিকই কিন্তু অমন আঁধার ভারীমুখ দেখতে ইচ্ছে করে না গনির। বলল, 'শরাফৎ মিয়ার মত দৌলত যদি থাকত, তবে—'

লতিফাও কাটা কাটা জবাব দেয়, 'তা হলে আরও কয়েক গণ্ডা লতিফাকে ঘরে এনে তুলতে।'

গনি হো হো করে হেসে উঠল। আচমকা লতিফাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে টেনে নিল সে বুকের কাছে।

লতিফা বাধা দিয়ে বলল, 'যাও সাহেব, মনে আমার সোয়াস্তি নেই। আমি হলে কর্জা করে পরব করতুম না।'

গনি ধমকে উঠল, 'অমন কথা বলিস্‌নে লতাবিবি। আল্লার দেওয়া পরবের দিন, ফকিরেও চুপচাপ বসে থাকে না। তোর অমন খুবসুরৎ চেহারা, পরবের দিনেও তাকে ভূত করে রাখতে পারব না বাপু আমি।'

বিবির সৌন্দর্যে অভিভূত মানুষটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে লতিফা পরম উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, "মিয়াসাহেব, সংসার তোমার ছোট নাকি, কিন্তু কেমন করে বছর কাটবে আমি যে ঠাওর পাই না।'

তাড়াতাড়ি লতিফাকে ছেড়ে দিয়ে একেবারে উঠানে নেমে গেল গনি। তার উপর ভরসা নেই লতিফার। নিশ্চিন্তে মরদের উপর নির্ভর করে হাসতে পারে না সে। উঠান থেকেই চেঁচিয়ে বলে উঠল গনি, 'কিছু না হোক, শরীরে খেটে দিনমজুরি তো করতে পারব। কুম্পানির এলের নাইন পাতব, পরের জমিনে মজুর খাটব। তা বলে শরাফতের দৌলতখানায় তোকে আমি যেতে দেব না।'

মনের এই শেষ আসল এবং মোক্ষম কথাটি বলে সে বিড় বিড় করতে করতে বেরিয়ে গেল।

লতিফাকে তৎক্ষণাৎ দেখলে মনে হয় না গনির এ কথায় সে রুষ্ট হয়েছে। সে চুপচাপ বাতি জ্বালল, গনির রেখে যাওয়া হুঁকোটা ঘরে এনে বারকয়েক গুড়ুক গুড়ুক করে টানল। আগুন নেই দেখে হুঁকো রেখে চাল ধুয়ে ঢেকিঘরের মাচান থেকে কাঠ পাড়তে গিয়ে হঠাৎ চোখে আঁচল চেপে ফোঁস ফোঁস করে উঠল। বসে পড়ে ঢেঁকিতে

মুখ রেখে বার বার বলল, 'খোদা, তুমি সাক্ষী থেকো, সাক্ষী থেকো। বিনা গোস্তাকিতে আমার ইজ্জৎ ছোট করল। বিনা গোস্তাকিতে···

গনি যাওয়ার পথে শ্যামের উঠোনে কয়েকজনকে দেখে থেমে জিজ্ঞেস করল, 'শ্যাম আছ নাকি?'

উত্তর দিল শ্রীশ মণ্ডল।

শ্রীশের গলা শুনে গনি ঢুকল। দেখল প্রায় জনা দশেক লোক সেখানে বসে আছে। সকলেই প্রায় ক্ষিরপাড়ার লোক। রান্নাঘরের ছিটে বেড়ার জানালা দিয়ে খানিক আলো মানুষগুলোর গায়ে পড়ে কাঁপছে। সে আলোয় দেখা গেল সকলেই প্রায় মাথা নিচু করে বসে আছে। মাঝখানে কালো দুলে তার ছানি-পড়া চোখে এদিক ওদিক দেখছে। দেখছে না, মনে হয় যেন গন্ধ শুঁকছে।

গনি বলল, 'কিসের মজলিস্ বসেছে গো সন্‌জেবেলতে?

শ্যাম বলল, 'মজলিস্ আর কি। এ্যাই সুখ দুঃখের কথা দুটো। বস।' বলে সে হুঁকো থেকে কলকেটি তুলে গনির হাতে দিল।

গনি কলকেটা হাতে নিয়ে বসে বলল, 'বসব না, যাব একবার নগিন ঘোষের কাছে।,

সকলেই প্রায় তার দিকে একবার মুখ তুলে তাকাল।

শ্রীশ বলল, 'এর মধ্যেই? বছরের আদ্ধেকখানিকও তো যায়নি।'

'তা কি করব বল।' কলকেতে কয়েকটা টান দিয়ে বলল, 'কাল বাদ পরশু পরব, যা হোক কিছু করতে লাগবে তো।'

কালো দুলে বলে উঠল, 'তাই বলছিনু কি যে, আগের দিনে,···

তাকে ধমকে উঠল পবন চাঁড়াল, 'তোমার খালি ওই এক কথা। আগের কালে তো রাম যোধিষ্ঠীর ছেল, তাতে হয়েছে কি?'

'না, তাই—'একটা বিলম্বিত শব্দ করে কালো দুলে। থেমে পাশের লোকটির সঙ্গে নীচু গলায় গল্প শুরু করল।

শ্রীশ আবার বলল, 'নগিন ঘোষের কাছে কেন? শুনছেলম, শরাফৎ মিয়ার কাছেই তোমরা ধার দেনা করছ?'

গনি আরও গোটাকয়েক টান দিয়ে বলল, 'তাতে কি আর সুদে আসলে কিছু কম আদায় করবে। আর তুমি তো জান, মরে গেলেও শালার কাছে হাত পাতবে না গনি জোলা কোন দিন।'

অন্ধকারের মধ্যে একটা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে উৎকণ্ঠিত গলায় বলল শ্রীশ, 'তাই তো বলছেলম গো, মান-অপমান মহাজন বাছাবাছি য্যাতই করি, মরলেও কি বাঁধন ছাড়াতে পারবে? জমিদারের খাজনা আদায় নাকি কম পড়ে, তাই জমি নীলামে ডাকবে।'

সকলে না হোক, কয়েকজন বিস্ময়ে চমকে উঠল। শুধু চমকানিও নয়, এর মধ্যে এমন এক সর্বনাশের ইঙ্গিত ছিল যে, আচমকা গায়ের উপর কেউটে পড়লে বোধ করি মানুষের এমন অবস্থা হয়।

পবন বলল, 'নীলামে ডাকবে, তার জমি কোথায়? অনাবাদী জমি তো একছিটেও দেখিনে।'

শ্রীশ যেন জমিদারের আমিনের মতই নির্লিপ্ত নিষ্ঠুর গলায় ঘোষণা করল, তা হলে আবাদী জমিই নীলামে ডাকবে।

'কার জমি?'

'তোমার আমার।'

'আমরা কি খাজনা দিইনে?

শ্রীশ বলল, 'আইনের কথা বলছিস্ পবন?' তিক্ত এবং বিদ্রূপভরা

রাজত্বে নাকি আইন বড় চড়া। কিন্তু প্যাঁচ করবি কার সঙ্গে। জমিদারের সঙ্গে? 'উচ্ছেদ করে ছেড়ে দেবে না তোকে?'

পবনের চোখজোড়া অন্ধকারে ধক্‌ধক করে জ্বলে উঠল। বলল, তার বাড়া ভয় তো নেই? সে তোমার এমনিতেও হবে অমনিতেও হবে। একবার নয় প্যাঁচ কষেই দেখব।

কালো দুলে বলে উঠল, 'ওসব অনাচ্ছিষ্টির কথা বলিসনে পবনা। দিনকাল বুঝে কাজ করতে নাগে, বুচলি। ইকে বাস, বোলতার সঙ্গে বিবাদ চলেনে। হাতে পায়ে ধরে পড়গে। দয়া ধম্মো কি আর উবে গেছে দেশ থেকে। আগের কালে ···

'তোমার আগের কাল নে তুমি থাকগে, প্যাচাল পেড়'নে।' জ্বলে উঠে অস্থির গলায় বলল পবন। 'বলি দয়া ধম্মো যদি থাকবেন তবে নীলামে ডাকা কেন, আঁ?'

লখাই কোন কথা না বলে সেনবাড়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। খেয়েদেয়ে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে লাঠিগাছটি নিয়ে বেরুবার মুহূর্তে সে হঠাৎ পবনকে জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে পার তুমি জমিদারকে? কী ক্ষ্যামতা আছে তোমার।

তাকে দাঁড়াতে দেখে ও এ প্রসঙ্গে কথা বলতে শুনে, শ্যাম শঙ্কিত হল। কারণ এসব কথা বলতে গেলে লখাইয়ের ভালমন্দ জ্ঞান থাকে না। থাকে না মুখের রাখঢাক। তার কথা শুধু পবনের মত প্যাচকষার দুঃসাহসিক অভিপ্রায়েই সীমাবদ্ধ থাকে না, তার চেয়েও চতুর্গুণ সর্বনাশ ও ভয়ের কথা বলে অপরের মনে শঙ্কা জাগিয়ে তোলে।

শ্যাম তাড়াতাড়ি বলল, 'তুমি বেইরে পড়, রাত হয়ে গেল। কোতোলবাবু নইলে আবার গণ্ডগোল করবে'খনি।'

লখাই পবনের পরম বন্ধু। লখাই পবনকে বিদ্রূপ করে বা রাগ করে বলেনি তার ক্ষমতার কথা। বলেছে বড় জ্বালায়, পবন সে কথা জানত। তাই বলল, 'কিছু না পারি, মরতেও তো পারি লখাই!'

কানু তাঁতীর কথা উল্লেখ করে বলল লখাই, 'সে তো কানুদাদাও পান দিন, তুমিও না হয় খুন হবে তাতে হবেটা কী? তোমার ঘরের বউ রাঁড়ি হয়ে ঘুরবে। সাধ করে কি আর সেজবাবু বলেন, আমরা হলুম নিঁধিরামের জাত।'

শ্যামের আশঙ্কাকে লক্ষ্য করে লখাই সত্যিই উত্তেজিত হয়ে উঠল। শ্যাম উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, 'লখাই, বেড়ারও কান আছে।'

লখাই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কান থাকলে সেই বেড়াকেই বলি, যত নষ্টের গোড়া তোমার ওই কোম্পানি, তার সাউকার বড় মানুষেরা। মহারানীর আইন!'

বলতে বলতে ক্রোধে আত্মহারা লখাই মাটিতে লাঠি ঠুকে বলল, 'বলি, সে ফিরিঙ্গি মেম আমার কে যে, তার আইন মেনে চলব? তার আইন নে তার দেশে থাকুক, এখেনে কেন অ্যাঁ, কেন?

শ্যাম উৎকণ্ঠায় তাড়াতাড়ি কাছে এসে ফিস্‌ফিস করে বলল, 'লখাই, চুপ যাও, লখাই···'

অন্ধকার দাওয়া থেকে কাঞ্চনের কালীকে উদ্দেশ্য করা কথা ভেসে এল, 'মোনসার গোঁ উঠলে আর রক্ষে নেই, কাজে যেতে বল তোমার দেওরকে।'

কিন্তু অন্যান্য মানুষগুলো এক বিচিত্র বিস্ময় অথচ নির্বোধের মত হাঁ করে তাকিয়ে রইল লখাইয়ের দিকে। সে যা বলেছে কাজে তার সঠিক অর্থ এবং পরিণতি কী হতে পারে, সে কথা যেন মানুষগুলো

আঁচ করতে গিয়ে আপন মনেই থমকে দাঁড়িয়েছে।

রান্নাঘরের লম্প নিভে গিয়ে উঠোনটা অন্ধকার! লখাই সেখানে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে যেন এক মস্ত দানব। আর অন্ধকারে-মিশে-যাওয়া কালো মানুষগুলোর ভয়ে বিস্ময়ে প্রাগলিত জোড়া জোড়া চোখগুলো চকচকিয়ে উঠল। ··· হা হা করে হাওয়া ছুটে এল দক্ষিণ থেকে। প্যাঁচা ডেকে উঠল হুম্ হুম। ··· সেনবাড়ীর ভেরী বেজে উঠল। রাত্রির প্রথম ভেরী ছুটে গেল দিগদিগন্তে হাওয়ার ভর করে।

গনি উঠে এসে লখাইয়ের হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলে উঠল, 'ঠিক বলেছে লখাই। আল্লার হুকুম আমরা কেউ মানিনি। আমরা কাফেরকে তোয়াজ করে বসতে দিইছি।'

এমন সময় অন্ধকার ফুঁড়ে পাঁচু দিগর হাজির হল বাঁক কাঁধে জলার মত দুই মস্ত ভাড়ে তাড়ি নিয়ে। কালো দুলে নাকটা উঁচু করে শ্বাস টেনে বলল, 'পাঁচু এল বুঝি।'

কিন্তু কেউই জবাব দিল না। পাঁচু বাঁক নামিয়ে সবাইকে দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার গো, সব মৌনি বর্‌তো লিয়েছ নাকি?'

এ সন্ধ্যার তালরসের যেন কি এক দুরন্ত মাদকতা আছে। সেই সঙ্গে পাঁচুর গলার স্বরেরও বোধ হয়। থম্‌ধরা দলটা সকলেই গা ঝাড়া দিয়ে বস্‌ল। কালীবউ এসে ইতিপূর্বেই শ্যামের খানিক কাছে বসেছিল। দেখা গেল গন্ধে গন্ধে অধরাও এসেছে। এসময়ে সে ঝগড়ার কথা ভুলে যায় না শুধু নয়, গালি খেতেও রাজী আছে।

লখাই একটা দুর্বোধ্য শব্দ করে বেরিয়ে পড়ল। পবনও উঠে পড়ল তার সঙ্গে কয়েকজনের আপত্তি উপেক্ষা করে।

গনির রোজার দিন। সেও বেরিয়ে পড়ে বাইরে এসে হঠাৎ থমকে

দাঁড়াল। নগিন ঘোষের বাড়ীর দিকে মুখ করে এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল, তারপর মুখ ফিরিয়ে সরাসরি বাড়ীর পথ ধরল।

বাড়ীতে এসে দেখল, সব অন্ধকার। ঘরে ঢুকে দেখল, সেখানেও বাতি জ্বলে নি। মেঝেতে ঘুমিয়ে আছে গোলাম, বাঁয়ে মাচাতে তার রুগ্ন ছেলে পাঁচু অঘোরে নিদ্রামগ্ন। নিঃশ্বাস পর্যন্ত শোনা যায় না। কালু হেকিমের যাবতীয় বড়ি খেয়েও ছেলেটা সারেনি। কিন্তু লতিফা কোথায়?

রান্নার চালাটাও অন্ধকার। পায়ের কাছে নীচু হয়ে মালসায় হাত দিয়ে দেখল ধোয়া চাল ভিজে ঢোল হয়ে উঠেছে। উনুনটা ফাঁকা। লতিফাবিবি কোথায়?

হঠাৎ যে কথা তার প্রথমেই মনে গেয়ে উঠল তাতে এক দারুণ ভয় ও যন্ত্রণায় যুগপৎ বুকটা আড়ষ্ট হয়ে গেল। সে ডাকল, 'গোলামের মা! লতিফা।'

হাওয়ায় সর্‌সর্‌ করে উঠল চালার গোলপাতার ছাউনি। বেড়ার বাঁকে শব্দ উঠল ক্যাঁ কোঁ। উঠোন থেকে বিলম্বিত শব্দ করে একটা বেরাল ডেকে উঠল।

গনি ছুটে উঠোনে এসে ডাকল, 'লতিফাবিবি!'

জবাব নেই।

ঘরের পেছনে জংলার দিকে গেল। নেই সেখানে। ঢেঁকিঘরটা হা হা করছে। সেখানে মানুষ দেখা যায় না। ··· কিন্তু ঢেঁকির উপরে ওটা কী?

সে কাছে এসে দেখল ঢেঁকিতে মুখ দিয় পরে আছে লতিফা। দু'হাতে লতিফার মুখ তুলে সে বলল, 'কী হয়েছে তোর লতাবিবি?'

লতিফার কান্নার বেগ তাতে বেড়ে গেল। কান্নার সেই বেগ দেখে গনির মনটা বড় আকুল হয়ে উঠল। সে কোন বিপদের আশঙ্কা করে বলল, 'বল্ তোর কি হয়েছে, আমাকে বল্।'

সে তার বলিষ্ঠ দুই হাতে লতিফাকে গায়ে টেনে নিল।

লতিফা কান্নার দমকে দমকে বলল, 'কী বলব, তুমি মিয়াসাহেব শরাফতের দৌলতের খোঁটা দেয়ার চে আমাকে গলা টিপে শেষ করে দেও।'

আচমকা বেদনায় গনির বুকটাতে মুচড়ে উঠে কী যেন ঠেলে এল গলার কাছে। ফিস্‌ফিস্ করে যেন কান্নারোধ করে সে বলল, 'ই আল্লা, আম্বাগীর কথা শোনো।'

এই কথা, এই কথা তোর! আর বলব না, কোন দিন না, কোন দিন না।'

বলে সে পরম সোহাগে লতিফার রোজার উপোসে ক্লিষ্ট চোখের জলে ভেজা মুখখানি তুলে ধরল। নিঃশ্বাসে রূপোর নোলক নড়ছে একটু। মাথার চুলে তেল নেই। কুমারী মেয়ের মত আঁট শরীরে লতিফা যেন এক কিশোরী বালিকা।

দুঃখ দহনে সে লতিফার চাঞ্চল্য নেই, হাসি নেই। প্রেমে উদ্ধত স্বামীর পেয়ার গ্রহণেও সে ছোট বুকখানি দুশ্চিন্তার ভার কাটিয়ে উঠতে পারে না।

গনি বলল, 'চাল যে ভিজে ঢোল হয়ে গেছে, ভাত পাক করা যাবে না।'

লতিফা বলল, 'এখুনি রেঁধে ফেলব। জল দিয়ে রাখব ভাতে, ভোর রাতে খাবে, নষ্ট হবে না।'

নিভে যাওয়া বাতি জ্বালিয়ে লতিফা উনুন ধরাতে বসল। বলল,

'মহাজনের কাছে গেলে ?'

'না।'

গনির গলার স্বরে বিস্মিত হয়ে ফিরে লতিফা জিজ্ঞাস করল, 'কেন ?'

গনি বলল জমি নিলামে ডাকার সম্ভাবনার কথা। বলে তারপর বলল, 'তোর কথাই সাচা, পরব এবার ঘরের দুধে পায়েস করেই হবে। ছোঁড়া দুটোর জামাটামা একটুকুন ধুয়ে সুয়ে সাফ করে দিস্।'

তারপর একটু থেমে বলল, 'এ মত কার শরাফৎ আমার জমিটুকু বড়া খাজনাতে ডেকে নেবে নিশ্চয়। তারপর ...

তারপরটুকু শোনবার জন্যই লতিফা রুদ্ধশ্বাসে গনির মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

গনি তাড়াতাড়ি মাথাটা নীচু করে মাটিতে নখ দিয়ে আঁক কাটতে লাগল।

লতিফা বলল তার বালিকাসুলভ চোখে উৎকণ্ঠা নিয়ে, 'তা'পরে কী ?'

'ডোমিনীপাড়ার কলে খাটতে যাব।'

'কল ? পাটের কল ?'

'হাঁ।'

'তবে যে তুমি কসম খেয়েছেলে, মরি তো কোনোদিন কোম্পানির কলে হালাল হতে যাব না ?'

সত্যি বটে। ইতিপূর্বে যখন মুসলমানপাড়া থেকে কয়েকজন রিষড়ে এবং নতুন তেলেনিপাড়ার চটকলে কাজ করতে যায় তখন সে বলেছিল, 'পরের ঘরে 'জন্' খাটব তবু পাটকলে গোরার খোঁয়াড়ে যাব না।'

সে বলল, 'এ আল্লার মার কি না জানি না, কিন্তু কি গোস্তাকিতে আমাকে মাটি ছাড়া হতে হল আল্লাই জানে।'

লতিফার দিকে ফিরে বলল, 'যাদের কিছু নেই, তারা হালাল হয়, আমাদের কিছু নেই, তাই আমরা কলে যাব। ইজ্জৎ ঢিলা হবে মানি, কিন্তু তুই যেন সেদিনেও মুখটা গোমরা করে রাখিস্‌নে লতাবিবি।'

১০

সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই প্রায় পাইকারি হারে অনেকের জমিই নীলামে ডাকা হল। যাদের মনে কিছুটা বা সংশয় ছিল নির্মমভাবে ঘটনার মধ্য দিয়ে নিঃসংশয় হল তারা। আজ গত কয়েকবছর ধরে এ ব্যাপারটা তেমন অভিনব বা নতুন ছিল না। কিন্তু এবার সংখ্যাধিক্যে গোটা চাকলাটাতেই হাহাকার উঠল।

চাষযোগ্য জমি চাষাদের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়ে অনেকখানি মুষ্টিমেয় মহাজনের হাতে গিয়ে পড়ল। মহাজনেরা আবার সে সমস্ত জমি বন্দবোস্ত দেওয়ার জন্য লোকের খোঁজ শুরু করল।

ঠিক এসময়েই সাংঘাতিক রোগ দেখা দিল ঘরে ঘরে। অবস্থাপন্ন লোকের ঘরেও বাদ গেল না। তাদের ঘরে ফরাসডাঙ্গা থেকে গোরা ডাক্তার সাহেব এল চিকৎসা করতে। সময় অর্থে, সে রোগ এল আর গেল না। হাওয়ায় ভর করে চলার পথে যেন সে ডাইনী হঠাৎ হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ল এখানে। কেউ কেউ বলল, মা শীতলাকে তারা আকাশ পথে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখেছে। কেউ বা বলল, গত সনে ওলাই

ঠাকুরাণীর সেবায় অনাচার হয়েছে। রোগ ছড়িয়ে পড়তে লাগল পাঁড়া থেকে পাড়ায়, গাঁয়ে থেকে গায়ে এক দুরন্ত ঝড়ের বেগে সে তার দুই পক্ষ বিস্তার করে মইয়ে বেড়াতে লাগল সারা পরগনায়।... এক রোগ কাটে তো, অন্য রোগ এসে হাজির হয়। মহামারী তার নানান্ রূপে এসে আলিঙ্গন করতে লাগল মানুষ ও জানোয়ারকে।

নানান্ আলোচনা, নানান সমস্যা। কার পাপে এ মারীলীলার খেলা চলেছে? রাজার না প্রজার, রক্ষকের না রক্ষিতের? এ সমস্যার কোন সমাধান নেই।... সবাই এক দারুণ ভয়ে ও সন্দেহে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবল, না জানি কোন্ কোপে মহামারী নব ডেঁরেমুসে সাবড়ে নেবে! এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দোষারোপও শেষ রইল না।... চলল দেবীপূজা ও আরাধনার ধুম।

আইনউদ্দীন হেকিম সাহেব গাদা গাদা সুজি খাওয়ালেন দাওয়াই মিশিয়ে, কবিরাজ বটিকা দিলেন সর্বরোগ নাশক। হুগলি ব্যারাক ও ফরাসডাঙ্গার সাহেব ডাক্তারের নির্দেশমত বড়লোক ভদ্রলোকেরা কাঁটাতারের বেড়া না হলেও তার চেয়েও কঠিন হুকুমের বেড়া দিয়ে ছোটলোক পাড়াঘরগুলোকে ব্যারাক বেঁধে অবরোধ সৃষ্টি করলে। কারণ রোগটা ছোঁয়াছে ও শ্রেণী-অচেতন।

তারপর ভাটা পড়ে আসবার মুখে শুরু হল সর্বমঙ্গলময়ী শীতলা রক্ষেকালী ইত্যাদি দেবী পূজা ও আরাধনা।

সন্ধ্যা ঘনায়। অমাবস্যার দিন। অন্ধকার দল বেঁধে যেন আকাশ থেকে গলে গলে জগৎ ছেয়ে ফেলছে। অসময় পুব-দক্ষিণের এলো-মেলো হাওয়ায় গাছে গাছে সরসরানি, মাথা দোলানী বাঁশ ঝাড়ের। তবুও যেন রুদ্ধ গুমরানি, চাপা গরম। দশহরার দিনে বৃষ্টি হওয়ার দরুন সে

সাপের ডিম ফুটতে পায়নি, আজকের এমন গুমসোনিতে বোধ করি সেই ডিম বদ্ধ খোল ভেঙে স্পছাসারা অন্ধকার জগতের ছোঁয়া পেয়ে উদ্দাম হয়ে উঠতে চাইছে। আকাশে তারা ফুটছে একটা করে, জোনাকি জ্বলে উঠেছে দু'চারটে।

কিছুক্ষণ থেমে-থাকা ঢাক-ঢোলের শব্দ আবার উঠল সুবী দুলে বাগদী পাড়ার মধ্যখানে অবস্থিত। পুজামণ্ডপ থেকে।

মণ্ডপে টিমটিম করে দুটো প্রদীপ জ্বলছে রক্ষেকালীর দুই পাশে। নরনারী জমায়েত হয়েছে অনেক। ঢাকের তালে তালে নাচছে ছোট ছোট কালো ধুলোমাখা ন্যাংটা ছেলেমেয়ের দল।

কেউ কেউ শুধু তাড়িমত্ত অবস্থায় দুই হাঁটুতে মাথা পেতে বসেছিল হয় তো কালীর আরাধনা করছিল। কিন্তু কালো দুলে কালী সাক্ষী রেখে পবন চাড়াল লখাই অর্বাচীন বিধর্মিদের নামে ক্রুদ্ধ নালিশে ফুঁসছিল।

লখাই এখনও এখানে অনুপস্থিত। কিন্তু পবন অনেকক্ষণ থেকে কালো দুলের কালীসাক্ষী গালিমন্দ শুনছিল। জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে এমনিতেই তার মেজাজ কিছুদিন থেকে গরম হয়েছিল। এখানকার কথায়বার্তায় যেটা বোঝা যাচ্ছে তা হল এই যে, নীলামের উচ্চহারবশত জমির পরিমাণ অনেককেই কিছুটা করে ছেড়ে দিতে হয়েছে। কারণ ভবিষ্যতে খাজনা দেবার বেলায় অনাদায়ী মামলার হাড়িকাটে পড়ার চেয়েও এটাই সুবিধে বলে ধরে নিয়েছে অনেকে। তবে আয় তো সকলের কমলই, উপরন্তু পূর্বে সমস্ত জমির যে খাজনা তাদের দিতে হত এবার এক ঠেলাতে অর্ধেকেও প্রায় তাই দাঁড়াল। কিন্তু প্রাণধরে অনেকেই জমির সব বা বেশি অংশটুকু ছেড়ে দিতে পারেনি। যারা

ছেড়েছে তাদের জমির পরিমাণ নিতান্তই কম বলেই ছাড়তে হয়েছে। এই ছাড়ার দলের মধ্যে পবন একজন সর্বস্বহারা। ভিটেটুকু যে এখনো আছে, সেটুকুর অবস্থাও টলমল। ক্রমাগত খাজনা বৃদ্ধি এবং সেজন্য ঋণের দরুণ নগিন ঘোষের কাছে তার যে হাত দুখানি বাঁধা আছে। চক্রবৃদ্ধিহারে তার মাথা সুদ্ধ সবখানিই চক্রাকারে বাঁধা পড়চে। এ বিপদের উপর আবার শনির দৃষ্টির উপর জমিদারের নায়েবদের কটাক্ষ পড়েছে, কারণ এ বেআইনী নীলাকাশের সম্পর্কে সে স্পষ্টই ঘোষণা করে দিয়েছে, নরম মাটীতে বেরাল বিষ্টা ছাড়ে। উপযুক্ত পাত্তর হলে একবার ওদের মহারানীর কোটকাচারি ঘেঁটে ঘষে নিতুম।

কথাটা শুধু ছোট নয়, বলেছেও ছোটলোক চাঁড়ালে। তা ছাড়াও, বিধর্মী ষণ্ডা বলে তার দুর্নাম চিরকালের।

জগতে যা হচ্ছে তা মা কালীর অভিপ্রায়েই, এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী কালো দুলে তাই লখাই পবনদের উপর এত রুষ্ট। তার নাতি বিষ্টু যে নাকি রেলগাড়ী ছুঁয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছিল, কিছুদিন পূর্বে সে কোম্পানির রেলে চাকরি নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। এতবড় যে যে পাপ, তার সমস্ত দায় সে এদের উপর দিয়ে গালাগালির মাত্রা চড়িয়ে দিল।

কালী এবং কাঞ্চন, দুই জা'য়েও তারা পূজামণ্ডপে ছিল। কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে পবনের ক্রোধের মাত্রা যদিও বা একটু কমে আসছিল, কাঞ্চন তাতে ঘৃতাহুতি দিয়ে দিল বাড়িয়ে। লখাইয়ের প্রতি গালাগাল সইতে না পেরে সে পবনকে বলল, 'বসে বসে শুনছ, বুড়োকে চুপ করাও না।'

কালো দুলে ক্ষেপে উঠে কাঞ্চনকে বলল, ওলো দেওর-ভাতারি

বেবুঝে, বুড়ো মারা মরদখেপানি, মা কালী তার জিভ্ দিয়ে তোকে চেটেও নেয় না।'

পবন এতক্ষণে ধমকে উঠল, 'থাম, চুপ মার মোড়ল, শুধুমুধু মুখ খারাপ করো না।'

থামা তো দূরের কথা, বুড়ো তার হাড় কাঁপিয়ে চীৎকার শুরু করল। তার সঙ্গে যোগ দিল অধরা এবং কালো দুলের দুই ছেলের বউয়েরা।

কাঞ্চনের কাঞ্চনাক্ষি বাঘিনীর মত জ্বলে উঠিল। কালী ভল্লুকের মত দ্রুত নিঃশ্বাসে হাত নিসপিস করে কাকে কামড়ে খামচে দেবে বোধ হয় তাই ভাবছিল।

সারা মণ্ডপে মেয়েপুরুষের দুটো দল, গালাগালি চীৎকার হল্লায় মেতে উঠল। ঢাকি রগড় বুঝে নেচে নেচে শুরু করল বাজাতে।

কাঁসি বাজাচ্ছিল যে মরণ ঢুলির ছেলে নয়ন ছোঁড়া. সেও তাড়ির নেশায় বেশ খানিকটা রসালো হয়ে উঠেছে। সে হঠাৎ কাঁসিতে কাঠির বেতাল ঘা মারতে মারতে একেবারে কাঞ্চনের কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। তার তাড়িমত্ত কিশোর চোখে বান ডাকল রক্তের, নিশ্বাস হঠাৎ দ্রুত হয়ে উঠল। কাঞ্চনের দিক থেকে পলকের জন্য চোখ ফিরল না তার। হাত থেকে কাঠি পড়ে গেল, শরীর তার অবশ হয়ে এসেছে বোধ হয় কাঞ্চনবর্ণের ধারে। আশ্চর্য বটে, আচমকা সে বাদলা পোকার মৃত্যুকামী দুই পাখার মত দুহাত বাড়িয়ে কাঞ্চনের যৌবনোদ্ধত শরীর স্পর্শ করল।

কাঞ্চন প্রথমটা খেয়াল করেনি। হঠাৎ স্পর্শে সে চমকে ফিরে মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। পরমুহূর্তেই এ দারুণ বিবাদ ভুলে সে খিল্‌খিল্‌

করে হেসে উঠল। বাঘিনীর চোখে ফুটল খেলার উল্লাস।

এদিকে বিবদমান দলটা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নরনারীদের ভুলে ক্রমাগত কাছাকাছি হতে লাগল আর পরস্পরের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির কাহিনী কটুভাষায় সরবে জাহির করতে শুরু করেছে।

দল আগে বেড়ে গেল, লক্ষ্য নেই যে কাঞ্চন পেছিয়েই রইল। নয়নের কম্পিত হাত সরিয়ে দিয়ে কাঞ্চন ঢুলে ঢুলে হেসে উঠল। সে হাসি আর থামতে চায় না। সাহস পেয়ে নয়ন দু'হাতে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করে কী যেন ফিস্ ফিস্ করে উঠল।

কাতুকুতুর বেগে হাসির মত হেসে কাঞ্চন বলল, 'আ মরণ ছোঁড়ার! কী চাস্ রে-জালি চ্যাম্‌না?'

নয়ন তেমনি মুখ তুলে বলল, 'তোমাকে।'

'কি করবি আমাকে নে?'

'বে করব।'

'অ মাগো!' কাঞ্চন আবার হেসে উঠল। বলল, 'তা'পর?'

'তোমাকে নে চলে যাব।'

'কোথায় রে?'

'তেলিনীপাড়ার চটকলে। গোরাসাহেব বলেছে আমাকে যেতে।'

কাঞ্চন চোখ তুলে বলল, 'যদি তোর গোরাসাহেব আমাকে পছন্দ করে?'

নয়নের তাড়িমত্ত চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠল।—'শালার চোখ উপ্‌ড়ে লোব না?'

'সত্যি?' আবার হাসতে গিয়ে হঠাৎ খেমে কাঞ্চন একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেল। বলল, 'আমার যে বে হয়ে গেছে।'

নিমিষে কাঞ্চনের গাম্ভীর্য ও নিস্তেজভাবে দেখে নয়নের হাত-পা শিথিল হয়ে এল। তারপর কাঞ্চন ভয় পেয়েছে ভেবে সে বলল, 'সেখেনে মেয়েমানুষেও কাজ করে। কেউ জুলুম করতে গেলে সাহেব তাকে পুলুশে ধরিয়ে দেবে।'

তার সান্ত্বনার কথা শুনে আবার কাঞ্চন খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠতেই নয়ন সাহস ফিরে পেয়ে অন্ধের মত তাকে জড়িয়ে ধরে ঠেলে ফেলতে চাইল মাটিতে। একরোখা জন্তুর মত কাঞ্চনের কোমরের কাপড় ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। ক্ষিপ্ত উন্মত্ত দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য শিকারপ্রাপ্ত শ্বাপদের মত চুলিশাবক খেপে উঠেছে।

মুহূর্তে ঘটনার গতি দেখে কাঞ্চনও ক্ষিপ্ত হয়ে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে তার বলিষ্ঠ পায়ে এক লাথি কষাল নয়নকে। নয়ন একটা শব্দ করে মাটিতে পড়ে আর উঠল না। ওখানেই মুখ ঘষতে লাগল।

দেখে কাঞ্চন বলে উঠল, 'কেন্নো কমনেকার।' বলে আবার সে হেসে উঠল, 'মরণ! চটকল দেখাতে এসেছে।'

ইতিমধ্যে ওদিকে বিবাদটা একেবারে থেমে গেছে। কারণ, আকালী বাগ্‌দীর বউ ক্ষেমীর ভর্‌ হয়েছে। অর্থাৎ রক্ষেকালীর ভর্‌ হয়েছে ক্ষেমীর উপর এবং এখন কালী তার মধ্যেই বিরাজ করছে।

অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রির সমস্ত চেহারা মুহূর্তে এক অদৃশ্য প্রেত প্রেতিনীর লীলাস্থলের মত বিকট হয়ে উঠল। থমথমিয়ে উঠল সমস্ত আবহাওয়া। সবাই নির্বাক সন্ত্রস্ত, আলো-আঁধারে একদল প্রেতাত্মারা যেন বড় বড় চোখে ক্ষেমীর দিকে তাকিয়ে রইল।

আছাড়-পড়া ক্ষেমীর শরীর পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। সানুনাসিক গলার স্বর হিঁহিঁ শব্দে কম্পিত, নিষ্পেষিত আর চোখ ওই রক্ষেকালীর

মতই ভীষণ।

কে একজন বলে উঠল, 'মাগো, স্নানপাড়ার কী অপরাধ হয়েছে মা বল।'

ক্ষেমী মুখ তুলে আকাশের দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'আঁমিঁ বঁলঁছিঁ তেঁলেঁনিঁপাড়াঁরঁ চঁটঁকঁলঁ মাঁ-গঁঙ্গাঁয়ঁ খেঁয়েঁ নেঁবেঁ, ওঁসঁবঁ অঁনাঁচাঁরেঁরঁ কঁলঁ। যাঁরঁ গেঁছেঁ, ফিঁরিঁয়েঁ নেঁ আঁয়ঁ শীঁগঁগিঁর সঁব্বাঁইঁকেঁ।'

অবিশ্বাস তো দূরের কথা, সকলে ঘন হয়ে এল আরও এবং মুখ চাওয়াচাওয়ি করে সকলেরই মনে পড়ল, ক্ষেমীর স্বামী আকালী জমির উপর ভরসা ছেড়ে তেলেনীপাড়ার চটকলে কাজ করতে চলে গিয়েছে। সম্প্রতি লোকাপবাদে শোনা যায়, ক্ষেমীর সঙ্গে নগিন ঘোষের কুসম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় ঋণ শোধ হয়ে কিছু জমি মুক্ত হয়েছে। এবং এও সকলেই জানে, সে অনেক চেষ্টা করেছে লোকজন দিয়ে তেলেনীপাড়া থেকে আকালীকে ডেকে নিয়ে আসার। আকালী আসেনি।

কালো দুলে জোড় হাতে বলল, 'কেউ যদি না আসে মা?'

ক্ষেমী তেমনি করে আরও জোরে বলে উঠল, আঁমাঁরঁ হুঁকুঁমেঁরঁ কঁথা বঁলঁবিঁ। যেঁ নাঁ আঁসঁবেঁ তাঁরঁ বংশঁ নিঁব্বঁংশঁ হঁবেঁ।'

সকলেই বিস্ময়ে লক্ষ্য করে দেখল, ক্ষেমীর চোখ থেকে জল গড়িয়ে মাটিতে পড়ছে।

কেবল ভিড়ের ভিতর থেকে পবন বলে উঠল, 'আকালী না এলেই ফ্যাসাদ।' বলে খ্যাল খ্যাল্ করে হেসে উঠল।

কালো দুলে হঠাৎ আবার চীৎকার করে উঠল, 'খবরদার চাঁড়ালের ব্যাটা, ধম্মো নে বিট্‌লেমি লয়।' এতক্ষণের সমস্ত ব্যাপারটা

পবনকে বিরক্তই করেছে। সেও হঠাৎ দু'পা এগিয়ে এসে বলল, 'তুই বুড়ো পাল্‌কি-বওয়া ভুলে আমাকে খবরদার বলিস্‌?'

তারপর সে হঠাৎ কলকে লক্ষ্য করে বলল, 'ক্ষেমীর কথায় যদি মা-গঙ্গা তেলেনীপাড়া চটকল ডোবায়, আমাকে যেন রক্ষেকালী সেদিনেতেই মুখে করে নেয়।'

কাঞ্চন শিউরে উঠে অস্ফুটে ডুকরে উঠল, 'পবন ঠার-পো।'

'হাঁ, চাঁড়ালের ব্যাটা হই তো কথা ফেরাব না'—বলে অন্ধকারে দুপদাপ শব্দ তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। কেবল ক্ষেমীর একটানা গোঙানির শব্দ এক বীভৎস আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে লাগল।

১১

পুঞ্জপুঞ্জ মেঘে-ছাওয়া সকালের আকাশ। পূব থেকে পশ্চিমের দিগন্তে পাড়ি-জমানো মেঘ পলকে পলকে রূপ বদল করছে। চলার শেষ নেই। কখনো দল বেঁধে গায়ে গায়ে, কখনো টুকরো টুকরো মেঘ যেন আজ আচমকা পশ্চিম দিগন্তের ডাকে সাড়া দিয়ে মহাসমারোহে চলেছে ছুটে। দল যখন জমাট বেঁধে ওঠে মনে হয় গতিরুদ্ধ মেঘ একজায়গায় দাঁড়িয়ে ঠেলাঠেলি করছে। তারপরেই আবার ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে পেঁজা তুলোর মত। বন্দী বিহঙ্গ খোলা পেয়েছে আজ পিঞ্জরের দ্বার, মুক্ত অবাধ বিশৃঙ্খল তার গতি।

এবছর আশানুরূপ বৃষ্টি হয়নি! সকলেই বৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষা করছিল। তা ছাড়া, কয়েক বছর ধরে চাষের কাজে জলের রীতিমত অভাব

দেখা দিয়েছে। রেললাইনের উঁচু জমি দিগন্তবিস্তৃত চাষের মাঠকে দু' ভাগ করে প্রাচীর-অবরোধ খাড়া করেছে। বাধা পড়েছে জল চলাচলে। নয়ানজুলিগুলি বেশিরভাগ সময় শুকিয়েই থাকে। বৃষ্টি না হলে তো কথাই নেই। গঙ্গার জল আসার যেসমস্ত সুদীর্ঘ নালাগুলি রয়েছে সেগুলি বহুদিন কাটার অভাবে বুঁজে আসছে ক্রমাগত। একধারে জল যদিও বা আসে, অন্যদিকে যাওয়ার পথ রেললাইন বন্ধ করে দিয়েছে। মুক্তাপুরের খাল এমনিতেই ব্যাহত হয়েছে রেললাইনের জন্য। তা ছাড়া, বহুদিনের সংস্কারহীনতার জন্য খাল ক্রমাগত সংকীর্ণ ও অগভীর হয়ে আসছে। আশঙ্কা হয়, অদূর ভবিষ্যতে এ খাল মাঠের বুকে শুকনো নয়ানজুলির মত একটি ক্ষীণ রেখায় পর্যবসিত হবে।

রান্নাঘরে কাজ করতে করতে কালীবউ আপন মনেই বলে উঠল, 'পোড়ামেঘের দিনক্ষণ ঠিক নেই বাপু। আজ কোথায় ঝোলন পুন্নিমে, তা না আজকেই মেঘের ছড়াছড়ি।'

লখাই গোয়ালের কাছে বসে বিচুলি কাটছিল। সে একবার আকাশের দিকে দেখে আবার বিচুলি কাটায় মন দিল। শ্যাম বাড়ী নেই। মধুকে সঙ্গে নিয়ে সে ফরাসডাঙ্গার গঞ্জে গিয়েছে বাজার করতে।

কালী আরও খানিকক্ষণ মেঘ ঝুলন এবং অতীতের ঝুলন উৎসবের গল্প আপন মনে বক্‌বক্‌ করে জিজ্ঞেস করল লখাইকে, 'তুমি গাঁয়ে যাবে তো গো?'

লখাই জবাব দিল, 'তা, একবার যাব।'

কালী ঘর থেকে বেরিয়ে একমুহূর্ত ঠোঁট টিপে লখাইকে দেখে

ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'অমন টেনে বলছ যে?'

লখাই নীরবে একটু হাসল মাত্র।

কালী বলল, 'মোরলীবাবাজীর নেমন্তন্নে একবার যাবে কেন, মন-প্রাণ তো তোমার সব সময় গিয়েই আছে।'

মুরলী নিমন্ত্রণ করেছে লখাইকে আজ ঝুলনপূর্ণিমার। একা নয়, কাঞ্চনসহ যুগলে।

লখাই বলল, 'সত্যি, মোরলীদাদার মত মানুষ হয় না।'

ফিরে যেতে যেতে, কালী আবার একটু তাকিয়ে থেকে বলল, 'তা অত যার সেবাদাসী, সে মন্দ হবে কেন! তবে তুমি একটু সাবধান থেকো বাপু।'

ঠাট্টাই হোক, আর আশঙ্কাই হোক, কালীর একথা পুরনো। লখাই হাসল।

কালী ঘরে ঢুকে বলল, 'তা যাবে তো ওঠ, আর দেরি কেন? কাঞ্চী তো নেয়ে এল বলে।'

'হাঁ, যাই।' বলে সে বিচুলীকাটা শেষ করে সব গুছিয়ে রেখে উঠল।

কাঞ্চনকে নিয়ে লখাই যখন মুরলীর আখড়ায় এল, বেলা তখন অনেকখানি। মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে, তত টের পাওয়া যায়নি।

মুরলীর আজ বিচিত্র সজ্জা। নীল সাড়ী একখানি পরেছে দু'ভাঁজ করে কাছা না দিয়ে। গায়ে বাসন্তী বর্ণের ওড়না গলার দুপাশ দিয়ে মাটি স্পর্শ করেছে। সর্বাঙ্গে কৃষ্ণনামের ছাপ, কুঞ্চিত আধপাকা চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। নতুন তুলসীর মালা গলায়। চোখে কাজল টেনেছে। গোঁফদাড়ির চিহ্ন মাত্র নেই সারা মুখে। মুখে

তার মিষ্টি হাসি।

আখড়ারও আজ রূপ খুলেছে। লতায় পাতায় ফুলে চারদিক সাজানো। সব যেন তেল দিয়ে লেপাপোঁছা হয়েছে। এত ফুলে সাজানো হয়েছে অথচ আখড়ার কোন গাছের একটি ফুলও তোলা হয়নি। কর্পূরমিশ্রিত পায়েসের গন্ধে ভরে উঠেছে আখড়া। মুগডালের খিঁচুড়ির মধ্যে সম্বরা, বিশেষ আদার মিশ্রিত গন্ধটি, বড় অপূর্ব।

দূরাগত অপরিচিত কয়েকজন বাবাজীও এসেছে। মন্দিরের দাওয়ায় বসে তারা নিম্ন বিলম্বিত শব্দে শুরু করেছে নামগান।

কাঞ্চন লখাই এসে দাঁড়াতেই মুরলী দুখানি মালা নিয়ে তাড়াতাড়ি উভয়ের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলল, 'মন্দিরের যুগলকে মালা দিয়েছি বহুক্ষণ, এ যুগল বাকি ছিল। এত দেরি হল যে?'

মালা পরে লখাইয়েয় লজ্জা হল। সে বন্দুকধারী প্রহরী, জীবন তার দুর্ধর্ষ, তার উপর বাগদীঘরের সে আজ উদ্ধত পুরুষ। কিন্তু এখানে এলে সে যেন কেমন শান্ত হয়ে ওঠে। বিশেষ ক'রে মুরলীর সামনে।

কাঞ্চন কিন্তু তেমনি উদ্ধত, বলিষ্ঠ, বঙ্কিম হাসিতে ধারালো কাস্তের মত শাণিত। আর তার শানিত চোখের দৃষ্টি আখড়ার প্রতিটি কোণে দরজায় চক্রাকারে একবার ঘুরে এল যেন কার সন্ধানে। তারপর সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখল লখাইয়ের মুখ। দেখে মুরলীকে বলল, 'বেলা ঠাওর পাইনি। তায় আবার তোমার কান্ত যা কুড়ে, বাবা গো! সে কোন্ সকালে বিচুলি কাটতে বসেছে। ওঠার আর নাম নেই।'

মুরলী বলল অপাঙ্গে কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে, 'কান্তার মুখ চিন্তা করলে এট্টু দেরি লাগবেই তো।'

'কান্তা কেন, রাইকিশোরী না?' চোখের কোণে উদ্দাম কটাক্ষ করে কাঞ্চন বলল।

মুরলী তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বলল, 'ভুল মানি রাইকিশোরী. কৃষ্ণরানী, আমার কালো, পানকান্তর পানহারিণী! এস, বসবে এস।' সকলে হেসে উঠল সশব্দে। তার মাঝে কাঞ্চনের হাসি বেজে উঠল বেলোয়ারী কাঁচের চুড়ির রিনিরিনি শব্দে। সকলেই দক্ষিণ ভিটার বারান্দায় গিয়ে বসল।

এমন সময় আখড়ার মেয়ে সরি অর্থে সারদা, একগোছা ফুলের মালা কলাপাতায় মুড়ে মন্দিরে ঢুকতে গিয়ে কাঞ্চন-লখাইকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

লখাই সেদিকেই তাকিয়েছিল। আলোয় ভরে উঠল সারদার শ্যাম শান্ত মুখ। একহারা ছিপছিপে শ্যামল লাউডগার মত নরম নিটোল সারদা। প্রতিমুহূর্তে যেন কিসের লজ্জায় হাসি ও ত্রাসে চঞ্চল। কিসের দুরন্ত বেগে যেন সে সবসময়েই অমানুষিক পরিশ্রম করে আর দুরন্ত হাসিতে মাঝে মাঝে আখড়ার ভাবগাম্ভীর্যকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

কাঞ্চনের বঙ্কিম চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠে আরও বেঁকে উঠল। দ্রুত নিঃশ্বাসে বুক দুলে উঠল, ফুলে উঠল নাকের পাটা। ঠোঁটের দুই পাশে এক নিষ্ঠুর অভিসন্ধি থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে উঠল। লখাইয়ের মুগ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সারা মুখে তার রক্তের বান ডাকল।

পিঠের উপর খোলাচুলে ঝাঁকানি দিয়ে মুখ ঢেকে সারদা মন্দিরে ঢুকে গেল।

কাঞ্চন চকিতে বারান্দা থেকে নেমে দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেলো আখড়ার বাইরে।

মুরলীদাস ঘর থেকে বেরিয়ে কাঞ্চনকে চলে যেতে দেখে বলল, 'রাইকিশোরী কোথায় যায় গো!'

লখাই ফিরে দেখল কাঞ্চন চলে গেছে। বলল, 'কোথায়?'

মুরলী বলল, 'বাইরে চলে গেল যে!'

ধ্বক করে উঠল লখাইয়ের বুকের মধ্যে। সে তাড়াতাড়ি নেমে বাইরে ছুটে গেল। মনে তার ঠিকই লেগেছে কাঞ্চনের ব্যাপার। তাই সে উৎকণ্ঠিত হয়ে পেছন-ধাওয়া করতে গিয়ে দেখল, পরিত্যক্ত জংলাঘাসে ভরা নীলক্ষেতের উপর দিয়ে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য কাঞ্চন চলেছে।

সে তাড়াতাড়ি পেছন থেকে কাঞ্চনের কাপড় ধরে ফেলে ডাকল, 'কাঞ্চীবউ।'

না ফিরেই কাঞ্চন কাপড় টেনে বলে উঠল, 'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, মিন্‌সে। নইলে তোরই একদিন কি আমার একদিন।'

লখাই তাকে ধরে মুখের সামনে এসে বলল, 'কী হয়েছে কাঞ্চীবউ, বল্‌।'

কাঞ্চন দুহাতে প্রায় থাপড় মারার মত সজোরে লখাইয়ের মুখ চাপা দিয়ে খিঁচিয়ে উঠল: 'না না, আমি তোর কাঞ্চীবউ লই, লই। আমি তোর শত্তুর।'

'কেন কাঞ্চীবউ?'

'কেন?' সাপিনীর মত উদ্যত ফণা তুলে কাঞ্চন দুহাতে চোখের জল মুছে বলল, 'বেইমান, তুই বেইমান!'

'কাঞ্চীবউয়ের মিন্‌সে হয়ে সরি বোষ্টমীর সঙ্গে পীরিত করিস। মোন্‌সার ছেলে সাপ্‌, তোকে বিশ্বাস নেই।'

লখাইয়ের সারা মুখ নিশ্চিন্ত নিষ্পাপ, কিছুটা বা বিব্রত। সে শক্ত হাতে কাঞ্চনকে ধরে বলল, 'মিছে কথা কাঞ্চী, পীরিত লয়, সরি বোষ্টমীকে দেখে কেমন ধন্ধ লাগল।'

'সবোনেশে মিন্‌সে, ওই ধন্ধ কী, তা কি আমি জানিনে? অমনি করেই পীরিত হয়।'

'না। পীরিত লয়। তুমি থাকতে এ মনে আর কারুর ঠাঁই নেই।'

'তবে আমি যে দেখলাম।'

'ওটা পীরিত লয়। মুরলীদাদার সঙ্গে কিসের পীরিত আছে?'

'ছি, মরণ নেই আমার!'

'তবে? সরি বোষ্টমীও তাই, আমাদের বন্ধু।'

'না, মেয়েমানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বে দরকার নেই।'

'বেশ, চল আখড়ায়। তোর কথাই থাকল।'

কাঞ্চন হঠাৎ কেঁদে উঠে বলল, 'তুমি মিন্‌সে কাঁদাবে আমাকে?'

লখাই তাকে বাহুবেষ্টনে রেখে বলল, 'ও তোমার ধন্ধ কাঞ্চীবউ। বয়সও কি আমার কম হল?'

বেলা গড়িয়ে গেল। আকাশে মেঘের ভার কিছুটা কমে এসেছে। বৃষ্টি আসার লক্ষণ নেই।

ঝুলনের আয়োজনে সবাই ব্যস্ত। কাঞ্চন লখাইয়ের দ্বারা যেটা সম্ভব, সে কাজগুলো তারা করছে। ওদিকে নামগান চলছে বিরামহীন।

এমন সময় দুটি গোরা সাহেব তেলেনীপাড়ার জমিদার বাঁড়ুজ্জে-বাবুদের এক আমলার সঙ্গে জুতো পায়ে একেবারে সরাসরি মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়াল।

নামগান স্তব্ধ হয়ে গেল। মুরারী এবং মেয়েরা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কেবল লখাই এক মুহূর্ত স্থির থেকে এই স্পর্ধিত অনাচার দেখে ক্রুদ্ধ সিংহের মত ছুটে গেল সেদিকে।

গোরা দুজন হঠাৎ সেই ধাবিত বিভীষণ মূর্তি দেখে দু' পা সরে গেল সন্ত্রস্তভাবে।

মুরলী তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল লখাইকে। 'থাম থাম কান্ত লখাই, ঠাকুর সকলেই দেখতে পারে।' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে গোরাদের দিকে তাকিয়ে বলল লখাই, 'তা বলে ওই ফিরিঙ্গিরা? কার হুকুমে ওরা আখড়ায় ঢুকেছে?' গোরা সাহেবের দুটি মুখ লাল হয়ে উঠল, তারা আমলার দিকে প্রশ্নসূচক ও ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল।

মুরলী শান্ত গলায় বলল, 'আসুক কান্ত, সবাই তাঁর জীব। শোননি আণ্টুনি মহাজন বলেছেন:

খিরিষ্টে আর বিষ্টে কিছু ভিন্ন নাইরে ভাই
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই।'

রক্তে ইংরেজবিদ্বেষ। জীবনের প্রতিটি দুর্ঘটনাতে বিপদে সে প্রতি মুহূর্তেই গ্রাসোদ্যত ইংরেজকে দেখতে পায়।

কিন্তু লখাই বলল, 'তোমার আণ্টুনি মহাজন কি এমন জুতো পায়েই ভেতরে আসত? যাই বল মুরলীদাদা, এ ফিরিঙ্গিরা মানুষ লয়, ওদের আস্পদ্দারও শেষ নাই। ওরা আমাদের শত্তুর, অজাতের দল।'

আমলাও এ ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথায় শুধু বিস্মিত নয়, ঘাবড়েও গেছে খানিকটা।

সাহেব দুটি ইংরিজীতে কি যেন বলল। আমলা জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কে মুরলীদাস?'

মুরলীদাস বিপদের গন্ধ পেয়ে ব্যাপারটাকে চাপা দেবার জন্য বলল, 'কাছে পিঠেই থাকে। কী মনে করে আমলামশাই?'

আমলা তার অপমানিত মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কিছু নয়, এমনি সাহেবরা এদিকটা ঘুরে দেখতে এসেছেন, নীলকুঠির স্যাম সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলবেন।' তারপর একটু চুপ থেকে আবার বললেন, 'তোমার আখড়ার আওতায় সব মিলিয়ে কতখানি জমি পড়েছে মুরলীদাস?'

মুরলীদাস চমকে উঠে বলল, 'তা পেরায় এগার-বার বিঘে হবে।'

সাহেব দুটিও তখন লখাইয়ের দিক থেকে মাঝে মাঝে চোখ ফিরিয়ে আখড়ার চারপাশটা দেখে নিচ্ছে। কাঞ্চনও তখন লখাইয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। লখাইয়ের উত্তেজনা কমেনি মোটেই এবং আমলার কথাবার্তার ধরন দেখে সে বলে উঠল, 'এ ফিরিঙ্গীদের যদি কোন কুমতলব না থাকে তো আমার নাম নেই। এ শালার জাত সব করতে পারে।'

আমলা একটু চুপ থেকে বললেন, 'সাহেবরা বাবুদের কাছ থেকে এখানকার সব জমি নেবেন, চটকল উঠবে এখানে।'

লখাইয়ের ক্রুদ্ধ মুখ তিক্ত হাসিতে আরও ক্রূর হয়ে উঠল। বলল, 'পানভরে শুন মুরলীদাদা, তোমার আখড়া ভেঙ্গে চটকল উঠবে। ওরা যে আমাদের মড়ার 'পরে ওদের মেমরানীকে বসিয়েছে।'

বলতে বলতে দারুণ ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষে দুই হাতের একটা সাংঘাতিক ভঙ্গী করে সে বলে উঠল, 'শালার জাতের মাথাগুলো ধরে ঘাড় থেকে তুলে ফেলতে হয়।'

একটি সাহেব হঠাৎ আর সইতে না পেরে তার অপরিসীম অধ্যবসায়ের ফল বাংলাতে বলল, 'টুমি বাট কেন করে?'

লখাই রুখে উঠে বলল, 'বাত আমি করব না তো তুই করবি, সাদা চ্যামনা। কামান থাকলে তোর মাথা উড়িয়ে দিতাম।' কাঞ্চন লখাইকে ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে সরিয়ে নিয়ে এল। মোনসার গোঁ বুঝি, ঘরে চল তুমি।'

সাহেব দুটি বিস্ময়ে রাগে লালমুখ আরও লাল করে স্তম্ভিত কালোমুখ আমলার সঙ্গে দ্রুত পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

আখড়ার সমস্ত উৎসব আনন্দ নিরানন্দ হয়ে উঠল। কারো মুখে হাসি নেই। নামকীর্তনওয়ালারা বিমর্ষ। তাদের ভক্তিগদ্‌গদ্ মুখে দুশ্চিন্তা।

কিন্তু আতঙ্কে মুরলীদাসের মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। সে তাড়াতাড়ি সারদাকে বলল, 'সরি, বাইরের দরজা বন্ধ করে দে।'

তারপর লখাইকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এ কি করলে তুমি কাণ্ড লখাই, এ কি সব্বোনাশ করলে?'

লখাই বুঝতে পেরেছিল রাগ সামলাতে না পেরে সে কি করেছে। সে মুরলীদাসের দুই হাত ধরে বলল, 'পারলুম না মুরলীদাদা, এ নিমকহারামের জাতকে আমি কিছুতেই সইতে পারিনে।

সন্ত্রস্ত কাঞ্চন বারবার বলতে লাগল, 'কেন কেন গো, এমন মতিগতি কেন তোমার? এখন যদি কোন বিপদ হয়?'

'যদি হয়, হবেই।' মুরলীদাস বলল দারুণ উৎকণ্ঠায়, 'তোমাকে

পালাতে হবে কান্ত, নইলে ওরা তোমাকে ধরে লাঞ্ছনা করবে, কোতল করবে।'

'পালাব?' হঠাৎ যেন কেমন বিহ্বল হয়ে গেল লখাই পালানোর কথা শুনে। বাইরের রুদ্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে চোখ কুঁচকে সে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'আবার, আবার পালাব? কোথায় পালাব, মুরলীদাদা?'

'পেছনের বেড়া ডিঙিয়ে বড় সড়ক ধরে বাড়ী চলে যাও তুমি।'

'তোমাকে এসে ওরা যখন জিজ্ঞেস করবে?'

মুরলীদাস রুদ্ধ গলায় বলল, 'আমার বাপপিতামোর আখড়া যদি ভেঙে যায়, তা হলে আমার সবই গেল। তোমার জন্য দুটো মিছে কথা আর বলতে পারব না?'

'না।' লখাই বলল, 'ওরা তোমাকে সাজা দেবে।'

'দিক। তবু কান্ত, তুমি যাও।'

কিন্তু তার দরকার হল না। দরজায় করাঘাত হল। সকলের মুখ মুহূর্তে পাংশু হয়ে উঠল। এক দারুণ অঘটনের জন্য সকলেই আতঙ্কে শিউরে উঠল।

কাঞ্চন লখাইকে দুহাতে টেনে নিয়ে যেতে চাইল পেছন দিকে। 'চল, চল মিনসে, পায়ে মাথা কুটি তোমার, চল।' সারদাও তাড়াতাড়ি কাছে এসে বলে ফেলল 'যাও, যাও কান্ত লখাই।'

দরজায় আবার করাঘাত হল।

লখাই হঠাৎ গর্জন করে উঠল, 'যাব না, না, আর পালাব না। সব শেষ হয় তো হোক।' বলে সবাইকে রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কের সাগরে ডুবিয়ে ছুটে গিয়ে সে নিজেই দরজা খুলে দিল।

আমলা একলা দাঁড়িয়ে আছে। লখাইকে দেখে বলল, 'মুরলীদাসকে ডাক তো।'

মুরলীদাস পেছনে পেছনেই ছুটে এসেছিল। লখাইকে আড়াল করে বলল, 'কী বলছেন, আমলা মশাই?'

আমলা বললেন, 'আজকে ঝুলন, কালকেও বোধ হয় পারবে না, পরশুদিন তোমার কাগজপত্র নিয়ে একবার কত্তার সঙ্গে দেখা কর।' লখাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাহেবরা তোমার সাহসের তারিফ করেছে হে খুব। চটকলে মজুর শাসন করবার জন্য নাকি তোমার মত লোকের দরকার। তবে একটু সভ্য হতে শেখ, বুঝলে?'

যেন এতক্ষণে কিছুই হয়নি এমনি একটা ভাব করে যাবার মুখে মুরলীদাসকে বললেন, 'বিপদের ভয় করো না, তোমার ওই কাস্ত লখাই না কি নাম, ওর নাম-পরিচয়টা সাহেব চেয়েছে। পরশু দিন সেটা বলো।' বলে তিনি চলে গেলেন।

ইতিমধ্যে মেয়েরাও দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমলা চলে গেলেও কেউ একটি কথা বলতে পারল না। এমন কি, লখাইও না। সকলেই স্তব্ধ হয়ে রইল।

কেবল দমকা হাওয়ায় যুগলমূর্তি স্থাপন করার পূর্বেই মন্দিরের ঝুলনের দোলনা আপনি দোল খেয়ে দুলে দুলে উঠল।

১২

ব্যাপারটা নিয়ে শ্যামের বাড়ীতে রীতিমত তাদের একটা পারিবারিক সভা বসে গেল। এমন কি মধু পর্যন্ত আজ সে সভার শরিক। অবশ্য তার শরিকানা আটকে রাখা আর সম্ভব ছিল না। কৈশোরের সীমা সে আজ পেরুতে বসেছে, লায়েক হয়েছে। দরকার হলে শ্যামের সঙ্গে যুক্তি-তর্ক দিয়ে নিজের মতামত জাহির করতে শিখেছে সে।

সবাই যখন এ সভায় লখাইয়ের চিন্তিত মুখের দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, তখন একমাত্র তার চোখ থেকেই বিস্মিত প্রশংসা ও সম্মান ঝরে পড়ছে। লখাইয়ের দোষ তো দূরের কথা, এমন একজন সাহসী পুরুষ তার আত্মীয় এবং ঘরের লোক, এতে নিজেকে সে গৌরবান্বিত মনে করছে।

সে বলল, 'এতে কিন্তু আমি অন্যায্যের কিছু দেখিনে, যাই বল। ও-শালার জাতের বড্ড বাড় হয়েছে, কিছু মানতেই চায় না।'

শ্যাম ধমকে উঠল, 'ন্যায্য-অন্যায্যের কি বুঝিস্‌রে তুই, বড় বড় কথা বলছিস্? বিষ নেই ঢোঁড়া, তার কুলোপানা চক্কর। গোরাদের কত ক্ষ্যামতা, তুই জানিস?'

কালীবউ কিন্তু দোমনা। দ্বিধাবিভক্ত মন তার দুদিকে। ছেলে মধুর বয়স এবং পৌরুষ সে আজ আর এক কথায় উড়িয়ে দিতে পারে না। শ্যামের বিচক্ষণতাও ফেলবার নয়। মূলত লখাইয়ের ব্যাপারে সে ভয় পেয়েছে, মন তার নানান দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন।

মধু বাপের কথায় প্রতিবাদ করল, 'ক্ষ্যামতা থাকলেই তুমি যা খুশি তাই করতে পার?'

একে উৎকণ্ঠা, তায় আবার মধু পর্যন্ত বাপকে জোর করে বোঝাতে আসছে এতে শ্যাম আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল। চেঁচিয়ে উঠল সে, 'হ্যারে গুয়োটা হ্যাঁ, ক্ষ্যামতা থাকলে সব করা যায়, জগৎ ডুবিয়ে দেয়া যায়।'

মধুও বলে উঠল, 'তবে তোমার অমন ক্ষ্যামতা শেষ করে দেয়াই ভাল।'

শ্যাম এবার ক্ষিপ্ত হয়ে রুখে বলল, 'শোরের বাচ্চা, এক থাপ্পড়ে তোর চোপড়া ভেঙ্গে ফেলব আমি। ক্ষ্যামতা শেষ করবে! যা না, যা যা, খুড়ো-ভাইপোতে একবার লড়ে আয় না, দেখি ক্ষ্যামতার দৌড় কত দূর।'

লখাই মধুকে বলল, 'তুমি চুপ যাও তো বাবা, কথা বল না। ওতে বিবাদ বাড়বে।'

কিন্তু ব্যাপারটা তাকে সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছে। তার বারবার মনে পড়ল সেজবাবুর একটি কথা, কোম্পানির সম্বন্ধে যে, 'ঈশ্বর আজ ওদের সহায়, শক্তিতে ওরা আজ সিংহবাহিনী!' তাই যদি সেজবাবু, তা হলে বল, আমরা কি শেয়াল না সিংহের শিকার হরিণ। আর শিকারই যদি হই, তবে ভগবান এ প্রাণে এত জ্বালা ক্রোধ ক্ষোভ কেন দিয়েছেন, ঘৃণা কেন এত মনে—যদি কোন প্রতিশোধই নেওয়া যাবে না! আর লুকনো মনকে অনুক্ষণ পিষে রাখার মধ্যেও যদি তার একচিটে আগুন বেরিয়ে আচমকা প্রলয় বাধায়, তার জন্য এত দুশ্চিন্তার ভারও যে সহ্য হয় না।

কেবল কাঞ্চনেরই থেকে থেকে মনে পড়ছিল সেই বিচিত্র এক রাত্রির কথা। লখাইয়ের সেই দুরন্ত যন্ত্রণা, চোখে জল আর সেই সেপাই লড়াইয়ের কথা। সেই রাত্রির কথা ভাবলেই লখাই তার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে, মনে হয়, ওর মন খ্যাপামির মধ্যে কি এক অদৃশ্য সূত্র যেন সেদিনের ঘটনার মধ্যে গ্রথিত আছে। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ লখাইয়ের কাছে, সেকথা কাউকেই বলা যাবে না।

যাই হোক্ একথা সকলেই বুঝতে পারছিল, তাদের নিজেদের মধ্যে যতই বাদানুবাদ হোক, যতই তারা দুশ্চিন্তা করুক তাতে কিছুই আসবে যাবে না। যা হবার তা হবেই এবং তার জন্য তাদের দুকপুকুনি নিয়ে প্রতীক্ষা করতে হবেই।

শ্যাম কেবল আপনমনে বলতে লাগল, 'কোম্পানি হল রাজা, তার প্রজা জমিদারে আমাদের যে সব্বোনাশ করল, তাতে মুখ ফুটে একটা কথা কেউ বলতে পারল না, বলে ক্ষ্যাতা। ওই তো পবনা চাঁড়ালের দেনার কাগজপত্তর নগিন ঘোষে বিকিয়ে দিল জমিদারকে। জমিদার নুটিশ দিয়েছে পবনাকে ভিটে ছাড়তে। কে ঠ্যাকায় অ্যাঁ, কে ঠ্যাকায়?'

১৩

সত্য বটে পবনের ভিটা-ত্যাগ কেউ ঠেকাতে পারল না, আর একটি নতুন ঘটনা পবনের সমস্ত জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিল।

আতপুরের রাজাদের সেজবাবুর আরদালীর সঙ্গে ঘটনাচক্রে পবনের কিছুটা বন্ধুত্ব ছিল। অবশ্য সে বন্ধুত্বের মধ্যে একটা রাজোচিত ফারাকও ছিল। গাঁজা ডলে দেওয়া, সাজানো, মদ সংগ্রহ ইত্যাদি নানান্ কাজের জন্যই পবন তার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে ছিল। আর পবনের কৃতিত্বও কম ছিল না। সাহসী বলবান এবং সারা পরগনায় ঢেউ তুলে পরের বিয়ের আসর থেকে কনে তুলে নিয়ে এসেছিল সে নিজের জন্ম-পীরিতের বউ বলে।

ভিটা সম্পর্কে দুঃসংবাদ পেলেও পবন হেসেছে, নেশা করেছে, বউ তারাকে নিয়ে সোহাগ করেছে। তারপর মাথায় তেল জল দিয়ে পাট করে, সেজেগুজে এসেছে আতপুরে আরদালী বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। তাদের দেখা করার জায়গা ছিল মালাপাড়ার আন্না চুন্নুরির বাড়ীতে। যুবতী আন্নাকে সবাই বলে স্বৈরিণী বেবুশ্যে, 'কিন্তু আন্না বলে। 'তা যদি হতাম তবে ফরাসডাঙ্গার গঞ্জে যেতাম, নয় তো মন্মথতির রাঁড়ের ঘরের ধারে চালা বেঁধে থাকতাম। তা বলে যে পুরুষে মন ওঠেনি তার ঘরের বউ হয়ে থেকে আড়ালে বারোভাতারি করে বেড়াবো, তেমন মেয়ে আন্নাকালী নয়।'

তাই আন্নাকালী মালাসমাজের বুকের উপর ডঙ্কা বাজিয়ে পীরিত করে মেজরাজার আরদালীর সঙ্গে, প্রেমিকের দান ও খরচায় পাকা বাড়ীর মধ্যে হাত ধরাধরি করে প্রেমের গান গায়। গভীর রাতে সে গান শুনতে পায় মালাপাড়ার লোকে। চাঁদিনীরাতে গঙ্গার ধারে বসে তাদের প্রেমগুঞ্জন হয়। চুন্নুরিমেয়ে তার কালো রূপের লহর তুলে আঁধার রাতকেও আলোকিত করে তোলে।

এ আন্না পবনকে ভারি খাতির করত। বয়সে ছোট হলেও সম্পর্কের খাতিরে পবনকে ভাই বলে ডাকত।

সেদিন পবন এসে আন্না ও তার প্রেমিকের কাছে তার দুর্দশার সমস্ত কথা বলল। কিন্তু তার মুখে দুশ্চিন্তার বিশেষ কোন ছাপ না দেখে আন্না উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, 'তা হলে তুমি কী করবে ?'

পবন গাঁজায় দম দিয়ে রক্তবর্ণ চোখ নিয়ে বলল, 'তাই যদি জানব দিদি, তবে আর তোমাদের কাছে এলুম কেন ?'

আন্না বুঝল পবন ঋণশোধের টাকাটা পাওয়ার জন্যই এসেছে। কিন্তু অত টাকা তার ছিল না। তা সম্ভব একমাত্র তার প্রেমিকের দ্বারাই। কিন্তু সে বেঁকে বসল এই বলে যে, জমিদারের সঙ্গে এ বিবাদের ফল ভাল হবে না। তারপর যদি জমিদারে জানতে পারে পবন তার কাছ থেকে টাকা পেয়েছে, তখন রাজাবাবুদের কানে সে কথা আসবেই। এলে মেজবাবু তাকে তৎক্ষণাৎ মাগ্‌না বিদায় দেবেন। অতএব পবন জমিদারের কাছে ক্ষমা চেয়ে অবস্থাটা পরিবর্তন করুক।'

তখন পবন উঠে তার রক্তচোখে ঘৃণা নিয়ে বলল, 'চিরকাল জমিদারের পা টিপে মানুষ তুমি, তুমি তো তা বলবেই।'

আরদালী এ-কথায় চটে উঠে পায়ের থেকে খড়ম তুলে মারতে গেল। আন্না তাকে ধরে ফেলে পবনকে ধমকে উঠল, 'ভাই হয়ে তোমার এমন কথা ?'

পবন বেরিয়ে যাওয়ার মুখে বলে গেল, 'দুর্দিনে যারা দেখে না, তাদের ভাইবন্ধু হয়ে লাভ কি, দিদি। তবে প্রাণের টান যদি থাকে আবার আসব, বলে গেলাম।' বলে সে পথে বেরিয়ে পড়ল।

বেলা গড়িয়ে যায়। আতপুরের পালেরা বারবাড়ীর বারান্দায় কয়েকজন বয়স্ক পড়শীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করছেন। এঁরা সদ্‌গোপ

চাষী। অবস্থাপন্ন তো বটেই, অনেক জায়গাজমি কিনে এঁরা জমিদার হয়েছেন। এ সৌভাগ্যের দরজা এদের কোম্পানির দৌলতে। এ বংশের একজন কোম্পানির কমিসারিয়েট ট্র্যান্সফার বিভাগের দার্জিলিং-এর সাপ্লাই এজেন্ট ছিলেন। তখন কোম্পানির সেবার ফল অনেকেই যেমন পেয়েছে, এঁরাও তেমনি পেয়েছেন।

পবনকে যেতে দেখে একজন গড়গড়ার নল মুখ থেকে সরিয়ে হাঁক দিলেন, 'কে যায় ওটা ?'

পবন দূর থেকেই হাতজোড় করে বলল, 'এঁজ্ঞে পবন চাঁড়াল।'

'বটে!' পালকর্তার গলায় একটা গর্জনের ভাব শোনা গেল। বোঝা গেল, নামটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। বললেন, 'এদিকে আয়।'

পবন কাছে যেতেই পাশ থেকে ছড়িটা তুলে দারুণ রোষে তিনি তার মাথায় ঘা দিয়ে খুঁচিয়ে সমস্ত পাটকরা চুল এলোমেলো করে দিলেন।—'হারামজাদা, চুলের বাহার করে টেরি কেটে যাচ্ছিস এখান দিয়ে ? ঘাড় থেকে তোর মাথা নামিয়ে দেব আমি, ছোটলোক কোথাকার।'

এ আচমকা আক্রমণ ও অপমানে পবন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর সকলে টেরিচুল এবং ছোটলোকের স্পর্ধার কথা নিয়ে যা খুশি তাই বলতে লাগলেন পবনকে।

কর্তা হাঁক দিলেন চাকরকে। বললেন, 'যা তো নাপতে ডেকে এনে ব্যাটার মাথা মুড়িয়ে বের করে দে এখান থেকে।'

পবন স্তব্ধ, আড়ষ্ট, যেন পাথরের মূর্তি। কী করবে সে ভেবে পেল না। বুক পুড়ে গেল অপমানে। দৌলতের ক্ষমতার কাছে তার তপ্ত চাঁড়াল রক্তের আসুরিক বল থমকে রইল।

নাপিত এসে মাথা কামিয়ে দিল ওর। সে জানত এখানে কোন কথাই চলবে না। 'অর্থের এ পাশবিক শক্তি তাতে আরও নতুন কৌশল রচনা করবে। সে বিনাবাক্যে পথ ধরল।······ নিস্তব্ধ নিঝুম পথ। দুপাশে গাছের ঝুপসিঝাড়ের ছায়ায় ভরা। সে পথের উপর দিয়ে দ্রুত চলল সে। কিন্তু কোথায়, কেন যাবে সমস্ত যেন এলোমেলো হয়ে গেল তার মনে। অপমানে রাগে দুঃখে বুক পুড়ে যেতে লাগল। সে যন্ত্রণার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যই শুধু সে হাঁটছিল, তার কোন গন্তব্য নেই।··· একসময় তার চোখ ফেটে দরদর ধারে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। অপমানে-ঠাসা বদ্ধ হৃদয়ের ক্লেদ প্রকাশের জন্যই বুঝি এচোখের জল। তাই তার কান্না যেন আরও উদ্দাম হয়ে উঠতে চাইল। কিন্তু তাতে তার বেগ যখন মানল না, তখন হঠাৎ সে একটা গাছের কাছে দাঁড়িয়ে তার গুঁড়িতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে রক্ত বার করে ফেলল আর বার বার বলতে লাগল, 'ভগবান, এ হাতপা-বাঁধা ছোটলোকদের তবে কেন তুমি জন্মো দেও, কেন দেও, কেন দেও! আর সে জন্মো দিয়ে যদি এই তোমার খেলা হয়, তবে বলি ভগবান, তুমি গরীবের কেউ নও।'

১৪

অনেকক্ষণ পর সে যখন উঠল, তখন তার মুখটা আঘাতে জায়গায় জায়গায় রক্ত জমে ভীষণ হয়ে উঠেছে। তবু সেই আঘাত আর চোখের জলই তাকে একটু স্বস্তি দিয়েছে।

বাড়ী ফেরার পথে লখাইয়ের কাছে গেল সে। লখাই বাড়ীতেই ছিল। সব কথা পবন তাকে বলল।

তাতে পবনের চেয়ে লখাইয়ের অবস্থা বিশেষ ভাল হল না। তারও তেমনিই রুদ্ধ রাগ ফুঁসে উঠল বুকের মধ্যে। পর মুহূর্তেই মনে পড়ল শ্যামের কথা, বিষ নেই, তার কুলোপানা চক্কর। তারা বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হয়েছে। সুকৌশলে তাদের সমস্ত বিষ হরণ করেছে কোম্পানি বাহাদুর। সে বিষের কল করেছে তারা কোর্ট-কাছারি। পয়সা থাকলে সেখানে আজ এ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করা যেত। আর তা ছাড়া, যে উপায় আছে, সে উপায়ে এর প্রতিশোধ হবে যেদিন ঢোঁড়ার দল তার সে বিষ সংগ্রহ করতে পারবে।

পবন বলল, 'সবই গেছে লখাই, বাকি ছিল এটুকু। সেটুকুও হয়ে গেল। আর রয়েছে তারা। এবার ওকে নে এখানে থেকে চলে যাব।'

লখাই জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

পবন বলল, 'শুনেছি, তেলেনীপাড়ার চটকলে কাজ করতে গেলে দু'বেলা দুমুঠো খেতে পাওয়া যায়। সেখানে জমিদার-মহাজনের চশমখোরি নেই, কাজ করে যা খুশি তাই কর, বলবার নেই কেউ।'

লখাইয়ের সমস্ত মুখ কালো হয়ে উঠল।—'তুমি কোম্পানির কলে খাটতে যাবে?'

পবনের সারামুখে ব্যঙ্গহাসিতে ভরে উঠল। বলল, 'মান-অপমানের কথা বলে কী লাভ লখাই ভাই? খাটো—খাও, পেছন টানের বালাই নেই, আমি সেখানেই যাব।'

বলে সে চলে গেল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল লখাই।

তারপর তার চোখের সামনে ভেসে উঠল গাড়ুলিয়ার মুরলাদাসের আখড়া, শ্যামসাহেবের নীলকুঠির উপর উঠেছে মস্ত চটকলের ইমারৎ। মুহূর্তে সে ইমারৎ রেলগাড়ীর মত গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে ক্রমাগত শ্যামনগর পেরিয়ে, আতপুর দিয়ে এই সেনপাড়ার উপর। সমস্ত বাধা ঠেলে গুঁড়িয়ে দানবীয় গতিতে এগিয়ে আসছে। কেউ তাকে ঠেকাতে পারল না। সে ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে, গ্রাম জনপদ উচ্ছেদ করে, ক্ষেতবাগান ধ্বংস করে। না না, সে সর্বগ্রাসী রাহুকে তুমি ঠেকাতে পারবে না।

কতক্ষণ লখাইয়ের এরকম আচ্ছন্ন অবস্থায় কাটল বলা যায় না। কাঞ্চনের বমির বেগে ওয়াকপারার শব্দে সম্বিত ফিরল তার। সে শুনতে পেল কালীবউ বলছে, 'ও কিছু নয়, নে এই নেবুপাতা কটা চটকে শোঁক, কমে যাবে।'

জবাবে শুনল কাঞ্চন বলছে, 'কিছু শুঁকতে টুকতে পারব না বাপু আমি, কিছু ভাল লাগছে না আমার।'

লখাই ঢুকল বাড়ীর ভিতরে, তাকে দেখেই কাঞ্চন মুখ নামাল একটু হেসে।

লখাই দেখল কাঞ্চীবউয়ের কাঞ্চনবরন যেন কেমন তাপদগ্ধ তামাটে হয়ে উঠেছে, চোখের কোল বসা, ক্লান্তিভরা মুখ।

কালী লেবুপাতা কটা লখাইয়ের হাতে দিয়ে বলল, 'নেও বাপু, দুজনে যা করতে হয় কর, এখন আর আমাকে মুখ ঝামটা দিলে কী হবে, তখন মনে ছেল না?'

বলে সে হাসি গোপন করে চলে গেল।

লখাই লেবুপাতা চটকে কাঞ্চনের নাকের কাছে ধরল। কাঞ্চন হাত দিয়ে সরিয়ে বলল, 'ওতে আমার কিছু হবে না।'

কিন্তু লখাই সে কথা ছেড়ে বলল, 'তা হলে সত্যি সত্যি এল?'

কাঞ্চন বলল, 'না, মিছিমিছি!'

লখাইয়ের গলায় সোহাগ ফুটল এক বিচিত্র আনন্দ ও উৎকণ্ঠায়। বলল, 'তোমার শরীর কিন্তু বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'তা শরীর কি চেরকালই একরকম থাকবে?' বলে হঠাৎ মুখভার করে বলল, 'আমাকে তুমি রেখে এসো বাপের বাড়ীতে। কত দিন যাইনি।'

'বেশ, চল। কালীবউঠানের আপত্তি না থাকলেই হল।'

কালী ঘর থেকে বলে উঠল, 'আমার আবার আপত্তি কি? কাঞ্চী যখন আসেনি, একলা সমসার চালাইনি আমি? একটা ননদ ও ছেলে না, শাশুড়ীও না।'

বলতে বলতে হঠাৎ কালী বাইরে কাঞ্চন লখাইয়ের কাছে এসে কেঁদে উঠল। সেদিনে আর এদিনে কত ফারাক। ভাবলে আমার বুকটার মধ্যে যে কী হয়। ... একশো বিঘে জমি ছেল, দুজোড়া বলদ, পাঁচ-পাঁচটা দুধের গাই। আমার কী না ছেল। ...'

১৫

পরদিন কাঞ্চনকে নিয়ে লখাই গরুর গাড়ী ছাড়ল উত্তরে কাঁটাল-পাড়ার পূবকোণে দেউলপাড়ায় কাঞ্চনের বাপের বাড়ী। প্রায় তিন ক্রোশ পথ।

পথে যেতে যেতে তাদের কথা হল—তেলেনীপাড়ার সেই গোরা সাহেব ডুটোর কথা। এখনো পর্যন্ত সেখান থেকে কোন খবর বা সন্ধানে আসেনি। ব্যাপারটা কেমন অস্পষ্ট হয়ে উঠল। কাঞ্চন বার বার বলে দিল, আর যেন কোন রকম গোয়াতুর্মি লখাই না করে। আর ······

বলে সে থামতে লখাই জিজ্ঞেস করল, 'কী ?'

কাঞ্চন বলল, 'এসে যদি দেখি বা কাকপক্ষীর মুখেও শুনি সই বোষ্টমির সঙ্গে মজেছ, তবে কিছু না পারি বটি দে নিজের গলা তো কোপাতে পারব।'

লখাই হো হো করে হেসে উঠল, 'তোমার যত আন্‌কথা।'

ভাটপাড়ার পর কাঁটালপাড়ার সীমা অবধি মাঝের এ স্থান বাগান ও জঙ্গলে ভরা, নির্জন ও নিস্তব্ধ। মুক্তোপুরের খাল গিয়েছে কাঁটাল-পাড়ার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে। সেখানে মদের ভাটিখানা রয়েছে। আশে পাশে দু-একটা ছিটেবেড়ার ঘর। খানিকটা বাদ দিয়ে শুরু হয়েছে ব্রাহ্মণদের বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

ভাটপাড়া পেরিয়ে খানিকটা নির্জনে আসতেই কাঞ্চন লখাই যুগপৎ চমকে উঠল একটা মোটা গলার স্বর শুনে, 'কালী কালী বল।'

গাড়ীর মধ্যে থেকেই কাঞ্চন লখাইয়ের দিকে তাকাল। লখাই গাড়ী থামিয়ে দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে বিস্মিত চোখে দেখতে লাগল এদিক ওদিক। তারপর হঠাৎ দেখল তার সামনেই মনোহর বেদে বিশাল গোঁফের ফাঁকে মিট মিট করে হাসছে। সেই মূর্তি, সেই চোখ, তেমনি কপালে সিঁদুরের দাগ, মাথায় কাপড়ের ফালি বাঁধা।

বলল, 'কোথায় গো চাঁদ রাজার ছেলে লক্ষীন্দর!'

কাঞ্চনের বুকের মধ্যে ধক ধক করতে লাগল লোকটার চেহারা দেখে কিন্তু সে দেখল লখাই নেমে গিয়ে লোকটার হাত ধরে বলল, দাদা, তুমি এখেনে ?'

মনোহর বলল : 'আমি তো সবস্থানেই ভাই। তোমাকে দেখতে পেয়ে আর স্থির থাকতে পারলুম না। তা, ওই কি আমার লখাই ভায়ের বেউলে বউ ?'

কাঞ্চন তাড়াতাড়ি একগলা ঘোমটা টেনে দিল।

মনোহর আবার বলল, 'বাঃ ভাদ্দর বউটি আমার বেশ। কালী কালী বল। তা কোথা যাওয়া হচ্ছে ?'

'ওর বাপের বাড়ী—দেউলপাড়া।'

'দেউলপাড়ার মেয়ে ? বেশ। তা বউমা'র আমার ...'

লখাই বলল, 'ছেলেপুলে হবে।'

মনোহর হা হা করে হেসে উঠল, 'বা রে যোয়ান। বেঁচে থাকো। তা ছেলে হলে আমি দেখে আসব গে কেমন ? আর দাঁড়াব না, চলি।'

'আর দেখা হবে না, দাদা ?'

'দেখা ?' এক মুহূর্ত ভেবে মনোহর বলল, 'হবে, রাতের পেথম পোহরে যদি জেগে থাক আজ দেখতে পাবে। উত্তরে আমার নিশেনা আজ। তবে সাবধান, ভাদ্দর বউকে বলে দিও, চাউড় না হয় একথা।'

বলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। কাঞ্চন উগ্র কৌতূহলে ভেঙে পড়ল সব জানবার জন্য। লখাই বুঝল, মনোহর প্রকৃতপক্ষে কাঞ্চনকে সব কথা বলার অধিকার তাকে দিয়ে গেল। সে সব কথা বলল কাঞ্চনকে। কাঞ্চন কয়েকবার শিউরে শিউরে উঠল। একবার পেছন ফিরে দেখতে লাগল। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না।

বেলা পড়ে এসেছে।

কাঁটালপাড়ার কাছে ডান দিকে গাড়ীর মোড় ফিরতেই বলদ জুটো পথের উপর থমকে দাঁড়াল। লখাই দেখল অদূরেই এক মস্তবড় বাড়ী, মন্দিরের চূড়া। মাঝে পথ দিয়ে এক সুপুরুষ অশ্বারোহী মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছেন। কাছেই একটা চাষীমত লোক ছিল। বলে উঠল, 'গাড়ী সরাও, পাশ দেও, দেখছ না হাকিম কত্তা আসছেন ?

'লখাই তাড়াতাড়ি নেমে গাড়ীটা সরিয়ে দিল পাশে। জিজ্ঞেস করল, 'উনি কে, বললে ?'

লোকটি বিরক্ত হয়ে বলল, 'কোথাকার মানুষ হে তুমি, ওনাকে চেন না ? শোননি চাটুজ্যে ম্যাজিস্টর, মস্ত পণ্ডিত, কেতাব লেখেন ?'

বলতে বলতে অশ্বারোহী সামনে এসে পড়লেন। লখাই দেখল, 'গৌরবর্ণ নধরকান্তি, ঠোঁটের কোণ কিঞ্চিৎ বঙ্কিম, ঈষৎ আরক্ত চোখ-জোড়াতে গভীর চিন্তার ছায়া।'

সেই লোকটি ঘাড় নুইয়ে নমস্কার করল। দেখাদেখি লখাইও তুহাত তুলে মাথা নত করল।

অশ্বারোহীর ঠোঁটের কোণে বিদ্যুতের মত একবার হাসি দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। একবার সেই লোকটি এবং একমুহূর্ত বেশি তিনি লখাইয়ের দিকে দেখলেন। মন্থর খুরের শব্দ তুলে এগিয়ে গেল ঘোড়া। লখাইয়ের মনে পড়ল সেজবাবুর কথা, সেই কেতাবের কথা। কী যেন নাম ছিল সে কেতাবের ! তুগ্গা···হ্যাঁ তুগ্গানন্দিনাই বুঝি। পাচন নেওয়ার নাম করে যে কেতাবের পাতা যোয়ান ছেলেরা ছিঁড়ে নিয়ে যায় বউকে শোনাবে বলে।

কাঞ্চন লখাই বাড়ী এসে পৌছুল। ইতিপূর্বেই লখাইয়ের সমস্ত

পরিচয়ই কাঞ্চনের বাপের বাড়ীতে জানত এবং প্রকৃতপক্ষে লখাইকে কাঞ্চনের মা-বাবা জামাইয়ের মতই গ্রহণ করল।

কাঞ্চনের সই ও বান্ধবীর দল এল ছুটে দেখতে তাদের এতদিনের শোনা সেই রূপকথার পুরুষকে। ভারী একটা হৈচৈ পড়ে গেল। গান গল্প ঠাট্টা তামসা, বাড়ীটা জমজমাট হয়ে উঠল একেবারে।

কাঞ্চনের সইয়ের গাইয়ে বর গেয়ে উঠল:

'ওই কালো পুরুষ যে-সে লয়, আগুন আছে ওর সঙ্গো অঙ্গে
কামিনীকুল সাবধান থেকো, (লয় তো) পুড়ে মরবে রঙ্গে রঙ্গে।
অমন কাঞ্চন পাষাণী রাই
(ও রূপে) সেও যদি মল' ছাই
ভয় আমার কামিনীরা কুল ছেড়ে সব, পালাবে ওর সঙ্গে সঙ্গে।

মেয়েরা হেসে কুটিকুটি হয়ে কৃত্রিম রোষে সবাই গাইয়েকে বলে উঠল, 'দূর দূর দূর, মরণ! ......'

তারপর রাত্রি এল। রাত গভীর হল। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। লখাইয়ের চোখে ঘুম নেই। আধঘুমন্ত কাঞ্চন থেকে থেকে বলে উঠছে, 'এসেছে?'

লখাই বারবারই জবাব দিচ্ছে, 'না।'

একসময় হঠাৎ লখাই শুনতে পেল, মোটা চাপা গলা, 'কালী কালী বল।'

সামনে তাকিয়ে দেখল তার খোলা দরজার কাছে মানুষের মূর্তি। লখাই উঠে এল। কাঞ্চন জেগেছিল, কিন্তু সামনে আসতে ভরসা পেল না।

মনোহর বলল, 'কাছে হলে দূর, দূর হলে কাছে বুঝ। আজ কাছেই যাব। চলি।'

বলে চকিতে কিসে ভর দিয়ে লাফিয়ে সে দুটো বাঁশের উপর উঠে দশ হাত দূরে চলে গেল। অন্ধকার ফুঁড়ে দেখা গেল আরও কয়েকজন অমনি বাঁশের উপর দিয়ে তারা-ভরা আকাশের তললা দিয়ে ছুটেছে।

কাঞ্চন ফিস্‌ফিস্ করে উঠল, 'রণপায় যাচ্ছে।'

রণপায় করে সেই দল গ্রামপ্রান্তরের মাথার উপর দিয়ে, অন্ধকারে তারা-ভরা আকাশের ধার ঘেঁষে, গাছ-গাছালি খাল-খানা-খন্দর পেরিয়ে ছুটে চলেছে সুদীর্ঘ ঠ্যাং বিশিষ্ট প্রেতের মত। চোখের পলকে সেই দল চলতে চলতে ছোট হতে হতে কয়েকটি কালো রেখার মত দূর আকাশের অন্ধকার কোলে মিশে একাকার হয়ে গেল।

পরদিন লখাই দুপুরবেলা ফিরেই দেখল তার জন্য কালীবউ, শ্যাম উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছে। সে আসতেই কালী বলল, 'শ্যানবাড়ী থেকে তোমার জরুরী তলব এসেছে। বলে গেছে, আসা মাত্র পেইঠে দিতে।'

লখাই একমুহূর্ত থমকে রইল। একরাত্রির বিদায় নিয়েই সে দেউলপাড়া গিয়েছিল। তার মধ্যে এ জরুরী ডাক তার বুঝতে দেরি হল না এবং সেই গোরার মুখ দুটোই বার বার তার চোখের উপর ভেসে উঠল।

শ্যাম গাড়ীর থেকে গরু খুলতে লাগল। চোখে তার অশান্তি ও উৎকণ্ঠা। যেন উদ্বেগেই বাক্ রুদ্ধ তার।

লখাই আর বিলম্ব না করে বেরুবার উদ্যোগ করল। কালী তাড়াতাড়ি তার সামনে এসে উৎকণ্ঠায় ভেঙ্গে পড়ল, 'কী হবে তা হলে?'

লখাই বলল, 'দেখি কী হয়। আসতে যদি দেরি হয়, খবরটা নিও একবার।'

তারপর দু'পা গিয়ে হঠাৎ থেমে বলল, 'একদিন জল থেকে এনে আচ্ছয় দিইছেলে, তুমি আর শ্যামদাদা আমার মা-বাপের মতন। যদি কোন বেপদ-আপদ হয় তো বলে যাই, অন্যায্য আমি কিছু করিনি। আর যদি কোন দিন না ফিরি তো কাঞ্চীবউকে ব'লো ...'

বলতে পারল না সে কথা লখাই! গলা ভারী হয়ে এল! সমস্ত আবহাওয়াটা মুহূর্তে পরিবর্তন হয়ে যেন সত্যিই প্রিয়জনের অনির্দিষ্ট বিদায়ের বেদনায় ও উৎকণ্ঠায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

লখাই আবার বলল, 'মধু কোথায়?'

মধু বাড়ীর পেছন থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে বলল, 'তুমি যাও কাকা, আমি তোমার পেছনে আছি! সব খবর নে আসব।'

লখাই সেনেদের মনেরপাড় পুকুরের ধারে আসতেই বাসন মাজতে মাজতে অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে একটি ঝি বলে উঠল, 'কী গণ্ডগোল করেছ তুমি যে, কোম্পানি কত্তাদের চিঠি দিছে?'

লখাই কোন জবাব না দিয়ে অগ্রসর হল। বুঝল ব্যাপারটা রটে গেছে চারিদিকে। ঝি-চাকর পর্যন্ত জেনেছে। বাইরের কাছারি-বাড়ীর আমলারা সকলেই আজ নতুন করে তাকাল তার দিকে।

কেবল কোতিলবাবু নিষ্ঠুরভাবে হেসে উঠে বললেন, 'কখনো সোনা, কখনো ধুলোকণা। একদিন মোহর নিয়ে গিয়েছিলি, আজ কয়েদ-খানায় চল্।'

লখাইয়ের আজ মনে একটা সাড়া পড়ে গেল। আমলা একজন ছুটে গেলেন কর্তাকে খবর দিতে।

লখাই যেন এক আদিম বন-মানুষের মত সভ্য-জগতের দর্শকদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। খবর এল কর্তার খাস্ কামরায় যাওয়ার হুকুম আছে, আর কেউ যেন সঙ্গে না যায়।

লখাইয়ের কানে এল অন্তঃপুরের মেয়েদের ফিস্‌ফাস্, দু-একটি বিস্মিত মুখ উঁকি দিল তাকে দেখবার জন্য। কর্তার ঘরের দরজায় এসে হঠাৎ লখাইয়ের পা দুখানি যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। জোর করে কোনরকমে ঢুকে সে গড় করল। চকিতে কর্তার মুখখানি তার দৃষ্টিপথে পড়েছিল। সর্বনাশ! মানুষের মুখ নয়, যেন চাপা রাগে স্ফীত সিংহের গম্ভীর মুখ। দিবাবিশ্রামহীনতায় চোখ জোড়া ঈষৎ লাল, মুখও তাই। কুঞ্চিত ভ্রূ, দৃষ্টি স্থির।

লখাই উঠল কিন্তু মাথা তুলল না।

কর্তার গম্ভীর গলা গম্ গম্ করে উঠল, 'মুরলীদাসের আখড়ার ঘটনা তুই তো আমাকে বলিস্‌নি।'

স্তিমিত গলায় জবাব দিল লখাই, 'ভরসা পাইনি হুজুর।'

'আজ তোর ভরসা কোথায়?'

লখাই নিরুত্তর।

কর্তা আবার বললেন, 'গোরাদের সঙ্গে বিবাদের দুঃসাহস তোর হল কোত্থেকে? সেদিন যদি গোরারা তোকে কিছু বলত তুই কী করতিস্? ওদের মারতিস?'

লখাই সত্যি কথাই বলল, 'হুজুর, বোধ হয় তাই।'

কর্তার ক্রোধের চেয়ে বিস্ময়ের মাত্রাই অপরিসীম হয়ে উঠল। একটু

থেমে তিনি হঠাৎ বললেন, 'তোকে আমি কয়েদ করব হতভাগা. কোম্পানির ইংরেজদের গায়ে হাত তুলতে যাস্ তুই! জানিস, তোর কর্তা কোম্পানির দেওয়া দৌলতেই তোকে পোষে!'

লখাই নির্বাক। নত হয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল শেষ হুকুমের প্রত্যাশায়।

কর্তা একখানি কাগজ নিয়ে কী এক রহস্যে যেন নরম গলায় বললেন, 'এতে কী লিখেছে আমাকে, জানিস? লিখেছে, তোমার ধর্মান্ধ দুঃসাহসী প্রহরী আমাদের এবম্বিধ বিধর্মীর আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে মারতে এসেছিল। আমাদের বলেছে, কামান থাকলে সে আমাদের মাথা উড়িয়ে দিত। আমরা জিজ্ঞেস করি তার মনিব শ্রীযুত সেন মহাশয়ের গৃহে ক'খানি কামান আছে?'

বলতে বলতে তার গলার স্বর চেপে এল। বললেন, 'এ অপমানের অর্থ তুই বুঝিস্? তারা জুতো পায় দিয়ে এসেছিল, মুরলীদাস তাদের বলতে পারে, তুই কেন ক্ষেপলি? তোর মনে ছিল না তুই সেনেদের হুকুমবরদার?'

লখাই হঠাৎ সেনকর্তার পায়ের কাছে বসে পড়ে বলল, 'আমার পান মানেনি, হুজুর!'

কর্তার মুখ আরও লাল হয়ে উঠল। কিন্তু সে লালমুখ জ্বলন্ত নয়, অস্তমিত সূর্যের পশ্চিম আকাশের মত তা ম্লান। তাঁর ক্রোধ কোথায়? অপলক চোখে তিনি তাকিয়ে রইলেন লখাইয়ের বলিষ্ঠ শরীরটার দিকে। তারপর খানিকক্ষণ পায়চারি করে বললেন, 'আগের দিন হলে তোকে হয় তো কয়েদ করতুম, কিন্তু আজ আর সে ইচ্ছে নেই, সে দিনও নেই। আইনত, ইংরেজ আমাদের কয়েদখানার অধিকার নষ্ট করে

দিয়েছে। দেওয়ানি ছেড়ে আমরা সব কোম্পানির চাকুরে হয়ে পড়েছি। আমাদের—'

বলতে বলতে তিনি হঠাৎ থামলেন। এ কি করছেন তিনি! পরোয়া কথা বলছেন তিনি তাঁর এক বন্দুকধারী প্রহরীর কাছে? নিজের প্রতি ধিক্কারে স্তব্ধ হলেন। কিসের এত দুর্বলতা তাঁর লখাইয়ের প্রতি? মনসার সন্তান বলে?

মনসার সন্তান! হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'মনসার ছেলে তুই! না, তোকে আমি আর কিছু করব না, খালি বরখাস্ত করলাম। চটকলের সাহেবরা আমাকে কোন নির্দেশ না দিলেও তোকে আমি জবাব দিলাম। তবে সাহেবরা লিখেছে, তোর মত লোক যদি তাদের বিশ্বস্ত হয়ে কাজ করে, তবে তোকে চায়। তোর অতীতের ইতিহাস তারা চেয়েছে আমাদের কাছে। তুই যাবি সাহেবদের কাজে?'

লখাই মাথা নীচু করে নিরুত্তর রইল। কর্তা কী ভেবে বললেন, 'আচ্ছা, তুই যা, তোর উপর বাকি হুকুম তুই কাল সকালে কাছারিতে জেনে যাস্'।

আবার রয়ে গেল বাকি হুকুমের ধুকপুকুনি।

পরদিন কাছারিতে একজন বৃদ্ধ কর্মচারী একটি কাগজে তার টিপসই নিয়ে চারটি টাকা দিয়ে বললেন, 'তোমার মাসিক বেতন।' বলে আর একখানি কাগজ নিয়ে পড়তে লাগলেন। পূর্ব প্রতিজ্ঞামত আমি লক্ষিন্দর মৈত্রকে বসতবাটি স্থাপনের জন্য হালিশহর পরগনাস্থ জগদ্দলের আগুড়িপাড়ার সন্নিকটে তিনবিঘা জমি দানপত্র লিখিয়া দিলাম।' তারপর লখাইয়ের জীবনবৃত্তান্তটুকু পড়ে কর্মচারীটি শেষ

কথাটি পড়লেন, 'প্রকৃতপক্ষে উক্ত লক্ষিন্দর আমার শত্রুর কাজ করিয়া থাকিলেও আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অনুচিত জ্ঞানেই এই দান দেওয়া হইল।'

সেনবাড়ী থেকে ফেরবার পথে কোতলবাবু কুটিল হাসি হেসে বললেন, 'ব্যাটা, যাদুটা আমাদের একটু শিখিয়ে দিতে পারলিনে, তরে যেতাম! তবে খুব সাবধান, এখান থেকে পার পেলেও গোরারা তোকে ছাড়বে না।'

১৭

সেনকর্তার কথানুযায়ী সত্যই আজ শুধু সেনেরাই নয়, গোটা সেনপাড়ার মত বর্ধিষ্ণু গ্রামখানিই পূর্বের সেই গৌরব যেন হারিয়ে ফেলেছে। অনেকেই দূর বিদেশযাত্রী হয়েছেন কোম্পানির নানান চাকুরি গ্রহণ করে। সেনেদের অবস্থাও প্রায় তাই। অনেকের বিশ্বাস, সেনেরা গোঁসাইদের মত বিস্তর জমিদারী ক্রয় করেননি বলেই ক্রমাগত তাঁদের অবস্থা ভেঙ্গে যাচ্ছে। সরস্বতীর আরাধনাটা একটু বেশি হওয়ার দরুনই সম্ভবত লক্ষ্মীদেবী তাঁর অঞ্চল সরিয়ে নিচ্ছেন। তা ছাড়া সম্পত্তির বিভক্তিও একটা কারণ বটে।

পালপার্বণে আজও দানধ্যান আছে, দোলদুর্গোৎসব বারোমাসের তের পার্বণে গানবাজনা যাত্রা কিছুই শেষ হয়নি। তবু ঐশ্বর্যের সেই গৌরব ও আলোকোজ্জ্বল যুগ অনেকখানি ম্লান হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, চাকুরি ব্যতীত কোম্পানীর সঙ্গে নতুন কোন সম্পর্ক গড়ে তোলা ছাড়া অর্থাৎ ইংরেজের সাহায্যার্থে নতুন কোন কলকৌশলে তারা অগ্রসর হননি।

আশ্চর্য, গঙ্গাও সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। ওপারের গঙ্গার ধার জুড়ে তৈরি হয়েছে চালের আড়ত। সিরাজী পীরের থান আড়তের ভিড়ে একপেশে হয়ে পড়েছে খানিকটা।

আগুরিপাড়ার ঘাটে কালোদুলে এসে আর বসে না—সেই যেদিন থেকে তার নাতি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেছে। তার সেই রূপকথার শ্রোতারাও আজ খানিকটা বেসামাল হয়ে পড়েছে জীবনযাপনে।

ফরাসডাঙ্গার বড় সাহেবের কুঠি থেকে রাজকীয় টড়তিবাজনা ঝমর ঝম ঝমর ঝম্ করে বাজিয়ে যায় গঞ্জের কাছে গঙ্গার ধার দিয়ে। কালো দুলে আগুরিপাড়ার ঘাটে বসে সেই শব্দের তালে ঘাড় নাড়ত, ঝর ঝর ঝর, ঝর ঝর ঝর। আজও তেমনি বেজে ওঠে রাত্রির প্রথম নাকাড়া থানায় থানায়। এপারের লোকেরা অনুমান করে ফরাস-ডাঙ্গার উত্তর দক্ষিণ সীমান্তের দ্বার বন্ধ হল।

১৮

লখাইয়ের ব্যাপারটা এমনভাবে শেষ হল, ঠিক যেন শেষ নয়। ঝুলে থাকার মত অস্বস্তিতে সকলেই পীড়িত। জমি পাওয়ার আনন্দের চেয়ে এমন বিচিত্র ঘটনায় দুশ্চিন্তাটাই যেন চেপে রইল বেশি করে।

লখাইয়ের যেন হঠাৎ কাজকর্মহীন দিনগুলি বড় দীর্ঘ অবসরময় হয়ে উঠল। সে প্রায় রোজই গাড়ুলিয়া মুরলীদাসের আখড়ায়, কাঠুরেপাড়া শ্রীনাথের কাছে যায়। খানিকক্ষণ বসে থাকে, কথা বলে। এদিক

ওদিক ঘোরে। কিন্তু কোন কিছুরই ঠিক নেই। কাজের নয়, চিন্তারও নয়।

কয়েক দিন এমনি ঘোরার পর সেজবাবুর কথা মনে হতেই লখাই সেখানে গেল।

জগদ্দলের হালদার বাড়ীতে সেদিন কলকাতা থেকে কোন এক আচার্য এসেছেন ব্রাহ্ম বৈঠকের ও অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করতে। এ অঞ্চলের মধ্যে জগদ্দলেই ব্রাহ্মদের একটিমাত্র শাখা এবং তার কার্যস্থল হালদার বাড়ীতেই বরাবর রয়েছে।

সেজবাবুরাও ব্রাহ্ম। তিনি সেখানে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। গোল বাধিয়েছে তার প্রিয়তম বন্ধু ভাটপাড়ার বনমালী এসে।

সেজবাবু বললেন, 'একে তো তুমি ভট্টপল্লীবিদ্বেষী, আবার ব্রাহ্মদেরও টিটকারি দেবে, তবে তোমার মতে উচিতটা কী?'

বনমালী তার বিশাল চোখ ধ্যানস্থ করে তুলল। বলল, 'আমার মতে ফোর্ট গ্লাস্টার!'

সেজবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ফোর্ট গ্লাস্টার মানে?'

'ইংরেজের একটা ব্যাবসায়ী কোম্পানি!'

'তা তো বুঝলাম, তার ব্যাপারটা কী?'

বনমালী চোখ বুঁজে বলল, 'ব্যাপারটা ওখানেই। সে ভাটপাড়ার আমার বাপঠাকুর্দারা যতই তাদের বৈদিক মহিমার গুণকীর্তন করুন, আর তোমার বেহ্মজ্ঞানীরা যতই হিন্দু যীশু খাড়া করুক, ফোর্ট গ্লাস্টারের পূজো আজ কে না করবে?'

এসময়ে লখাই ঢুকল। সেজবাবু ও বনমালীকে আলোচনা করতে দেখে নীরবে এককোণে বসে পড়ল সে। সেজবাবু তা দেখলেন। কিন্তু বনমালী চোখ বুঁজেই ছিল বলে লক্ষ্য করল না।

সেজবাবু বললেন, 'তা মানুষকে উদরসংস্থানের দিকটা তো দেখতেই হবে। তবে তো—'

'ধর্ম কর্ম।' বলে বনমালী হো হো করে হেসে উঠল। 'অর্থাৎ কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো? আমার বক্তব্য সেখানেও ঠিক নয়। ব্রহ্মজ্ঞানীরা সেদিক থেকে ইংরেজী শিক্ষা ও আদবকায়দা বেশ রপ্ত করে নিয়েছে। বলছি, তোমাদের নিরাকার ব্রহ্মের কাছে তবে জাতিভেদই বা কেন, উৎকৃষ্ট বামুন না হলে আচায্যি হওয়া যায় না কেন, আর তোমার চালকলার নৈবিদ্যি—সেও তো দেখি ঢোলকাঁসি বাজিয়েই হয়।'

ঠিক এসময়েই দরজার আড়ালে সেজগিন্নির চুড়ির ঝনৎকারে আগমন টের পেয়ে বনমালী বলে উঠল,

'তৎকালস্খলদঙ্গভঙ্গিমাচলামালিঙ্গ্য সেজলক্ষ্মীং বলাদ্
আলোলানজবিম্বচুম্বনপরঃ প্রীণাতু সেজবাবুঃ ।

গতকাল বৃহস্পতিবারে নিশ্চয় সেজঠাকুরানী নারায়ণপত্নী লক্ষ্মীর পূজো করেছেন এবং তার প্রসাদকণিকার কিয়দংশ তুমি কপালে ঠেকিয়ে ভক্ষণ করেছ ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েও?'

এবার সেজবাবু তো বটেই, সেজগিন্নিও খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলেন।

বনমালী হাসল না। 'তেমনি গলায় বলে চলল, 'আর শাস্ত্রজ্ঞ আমার বাবার কাণ্ডটা দেখ। আমি বেচারীর কী দোষ ছিল যে টোলে পাঠিয়ে আমাকে এমন একযুগের মূর্খ তৈরি করে রাখা? পুরোহিতগিরি আর পরস্ত্রীর প্রণাম নেওয়া ও গুরু হওয়ায় আমার আপত্তি ছিল না কিন্তু পেট তাতে মানবে কি?'

কথাগুলো দুঃখেরই বটে, কিন্তু বনমালীর বলার ভঙ্গিতে হাসি চেপে রাখা সম্ভব হল না। হাসছে না শুধু লখাই কেন না সে সব কথা ঠিক ধরতে পারছে না।

বনমালীকে নিতান্তই কথায় পেয়ে বসেছে। বলল, 'এ তো গেল একদিকের কথা, অন্য দিকের কথাটা একটু শোন। সেদিন দেখি জ্যাঠামশাই সকাল থেকে ঘরের মধ্যে অধ্যয়নে ব্যস্ত। কি ব্যাপার! গোপনসন্ধানে টের পেলাম, বঙ্কিম চাটুয্যের এক উপন্যাস। হায় পোড়াকপাল, ওই বইটি আমার এক বিবাহিতা যুবতী ভগ্নির, স্বামীর দেওয়া উপহার। ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তার কাছ থেকে পুড়িয়ে ফেলার জন্য ওই ইংরেজী অনুবাদ, অশ্লীল কুসাহিত্য বলে।'

এদিকে স্বামী স্ত্রীর হাসির ঝরর্ণা বইতে লাগল। বনমালীর তখনো থামার নাম নেই। বলল; 'বলব কি, আমি একদিন বন্ধুজনের কাছে রাধার রূপ বর্ণনা করছিলাম। আমাদের এক নীতিশাস্ত্রের পণ্ডিত তো আমাকে মারে আর কি। অপরাধ? না, ওসব পরনারীর যৌবন-মুগ্ধ একদল গোঁসাইয়ের কেচ্ছাকাব্য। আসলে রাধার উল্লেখ নাকি কৃষ্ণচরিতে বর্জনীয় ছিল। ভাল কথা, কিন্তু শুনলে বিশ্বাস করবে না, সেই পণ্ডিতকেই একদিন তাঁর দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়াকে মিষ্ট এবং নিম্নস্বরে কাব্য বলতে শুনলাম, হরিমভিসর সুন্দরি সিতবেষা, রাকা রজনিরজনি গুরুরেষা।'

সেজবাবু আর হাসতে না পেরে এবার বলে উঠলেন, 'দোহাই তোমার, এবার একটু থাম বনমালী, পাগল হয়ে যাব।'

'কেন, তোমাদের আচার্যদের ব্যাপারটা একবার শোন।'

'দোহাই তোমার, আর পারিনে।' গিন্নিকে বললেন, 'হালদার

বাড়ী আমি একটু পরে যাব। তুমি বনমালীর জলযোগের ব্যবস্থা কর।'

তারপর লখায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী খবর তোমার লক্ষীন্দর, শুনেছি এবার তুমি নতুন কীর্তি কি সব করেছ?' লখাই বিসন্নভাবে একটু হাসল।

ওর উপর নজর পড়তেই বনমালী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্। তুমি বল্লভীচিত্তহারা, এখানে কি করে?'

লখাই হাতজোড় করে বলল, 'এঁজ্ঞে?'

সেজবাবু বললেন, 'চেন নাকি?'

'বিলক্ষণ। তবে একলাকে নয়, সেদিন দূর দেহলীতে ছিল উন্মত্তা সুবর্ণকাঞ্চনী রাধা। অহো, অপরূপ সেই রূপ দেখেই বলেছিলাম দেবী আপনজন গণনাতে আমার নামেও একটি দাগ অঙ্কিত করো। টোলে আমার সেই শেষদিন, অদ্যাবধি চরিত্রের সে কলঙ্ক আমার দূর হয়নি।'

বলে কালীবাড়ীর সেই ঘটনা বিবৃত করল। লখাইয়ের মনে পড়ল, কাঞ্চন তাকে বলেছিল এক পুরোতের তাকে দেখে মন্ত্র বলার কথা।

সেজবাবু তখন লখাইয়ের সবকথা বললেন বনমালীকে। এমন কি, সেদিনের দুর্ঘটনা ও বিতাড়নের কথাও।

বনমালী সব শুনে বলল, 'এই এদের আমি কিছুটা বুঝতে পারি যারা আজকের সবকিছুকেই বিদ্বেষের চোখে দেখে। একে সাহেবরা যতই ধর্মান্ধ বলুক না, আসলে সে ইংরেজ-বিদ্বেষী কিন্তু নকলনবীশ হিন্দুর তাৎপর্য আমি বুঝিনে। এ দেখছে এর সবই ডুবে যাচ্ছে।

একে এখন যতই বলি, ফোর্ট গ্লাস্টার আর শিবঠাকুর সেবা যুগপৎ চালাতে হবে, তা মানবে কেন? অথচ লক্ষ্য করবার বিষয়, বিবাহিতা বাগ্‌দী-নারীকে নিজের অঙ্কশায়িনী করতে ওর বাধেনি।'

খাবার এল বনমালীর! সে খাবার খেতে বসল।

সেজবাবু কিন্তু তখন অন্য কথা ভাবছিলেন। তিনি বললেন লখাইকে, 'লক্ষিন্দর, কাল আমি কলকাতা চলে যাব, তার আগে তোমাকে দুটি কথা বলে যাব। যেখানেই যাই, তোমার কথা আমি ভুলতে পারবো না। কিন্তু তোমার অবস্থা যা দেখে যাচ্ছি তা আমাকে বড় ভাবিয়ে তুলেছে। তোমার মতলবে এ দেশ চলবে না, আজকের কেউ তোমাকে বুঝতে চাইবে না। চাইলেও সাহস পাবে না। সাহস যদিও বা হয়, তাকে পরিকল্পনা দেওয়া আজ সম্ভব নয়। এদেশে তুমি যা চাও তা কোন দিন হবে কি না জানি না। যদি কোন দিন হয়, তার জন্য তোমাকে যে কত জন্ম অপেক্ষা করতে হবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।'

বলে একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'এ যদি শুধু মাত্র একতরফের ব্যাপার হত তবে কথা ছিল না, কিন্তু মনে রেখো, আজ যাদের তুমি এদেশের মাটিতে সইতে পারছ না, তাদের সঙ্গে এদেশের কিছু মানুষও যোগ দিয়েছে। সুতরাং যখন তখন ঘরে বাইরে বিপদ ডেকে এনে নিজের সর্বনাশ ঘটিও না।'

বনমালী বলে উঠল, 'আর যদি ঘটাও, তবে এ বনমালীকে ডাকতে সেদিন ভুলো না।'

বলে সে হঠাৎ খাওয়া থামিয়ে বলল, 'আমি কি দেখতে পাচ্ছি, জান সেজ? শিবমন্দির আর গঙ্গার, প্রাচীনধর্ম আর উপবীতের অবরোধে ঢাকা ভাটপাড়া যেন শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় ছুটে চলেছে।

তার মধ্যে আমিও ডিগ্‌বাজি খাচ্ছি আর ভাবছি সেখানটা আর যাই হোক্, পুরোনো নয়, একেবারেই নতুন।'

বলে সে খাওয়া শেষ করে হাতমুখ ধুয়ে উঠতেই অবগুণ্ঠনবতী সেজগিন্নি চট্ করে দরজার আড়াল থেকে এসে গলবস্ত্র হয়ে তাকে প্রণাম করল।

বনমালী সেজবাবুর দিকে চেয়ে টেপা ঠোঁটে হাসল। সেজবাবুও তাই।

লখাই বলল সেজবাবুকে, 'বাবু, কান্থ ভড়ের বউয়ের একটা দরখাস্ত লিখে দেবেন বলেছিলেন?' সেজবাবু বললেন, 'হঁ্যা, সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে একটা চিঠি লিখে দেব বলেছি। কিন্তু কিছু হবে কি?'

লখাই বলল শান্ত অথচ ক্ষুব্ধ গলায়, 'কাটুনি নিজের পেট চালাতে সামান্য তুলো যদিও বা পেল, বিলিতি সুতোর হলবানিতে তাঁতীরা তার সুতো নেয় না। তবে সে কি মরবে?' এ প্রশ্নের যে নির্মম জবাব হওয়া উচিত ছিল তা না বলে সেজবাবু বললেন, 'সন্ধ্যায় এসো, আমি লিখে রাখব।'

লখাই গড় করে উঠে দাঁড়াল। বনমালী বলল, 'তোমার কাঞ্চন সঙ্গিনীকে বলো, কালীবাড়ীর সেই বামুন তাকে মন্দ কথা বা অপ্রিয় কিছু বলেনি। তবে একটু ভুল বলেছিলাম। আজ সেই রূপ স্মরণ করে সখীর উক্তিই করতে ইচ্ছে হচ্ছে:

পশ্চোন্মত্তে বরিবভিযযৌ নাধুনাপি প্রতীচীং

মা চাঞ্চল্যং কলয় কুচয়োঃ পত্রবল্লীং তনোমি।'

লখাই অবুঝ হেসে ফিরে যেতে যেতে দরজার কাছে হঠাৎ থেমে

ঘুরে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল বনমালীকে, 'দাদাঠাকুর, আপনি ওই ফোর্ট গেলাসটার না কি বলছেলেন, সেটা কী?'

বনমালী বলল, 'সেটা এক ইংরেজ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নাম। শুনছি সে কোম্পানি শীঘ্রই জগদ্দলে পাটের সুতোর একটা কারখানা খুলবে।'

পাটের সুতোর কারখানা। হঠাৎ খোঁচা-খাওয়া ঘুমন্ত সিংহের মত লখাইয়ের চোখজোড়া জ্বলে উঠল, শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল। হাত দুটো মুঠি পাকিয়ে উঠল, পাকিয়ে উঠল শরীরের পেশী। যেন হাত-পা বাঁধা এক দুরন্ত জাম্বুবান যন্ত্রণায় ছটফট করছে!

কিন্তু কিছু না বলে এক মুহূর্ত পরে পিছন ফিরে সে চলে গেল দুপদাপ করে।

সেজবাবু আর বনমালী একবার পরস্পর, তারপর লখাইয়ের চলার পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

১৯

সন্ধ্যাবেলা সেজবাবুর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে লখাই এল কানু ভড়ের বাড়ী।

বাড়ীটা যেন ভূতুড়ে পোড়ো বাড়ীর' মত নিস্তব্ধ খাঁ খাঁ করছে। মানুষ আছে কি-না বোঝবার উপায় নেই। অথচ এ বাড়ীতে একদিন ছিল কত লোকের আনাগোনা। মহাজনরা এসেছে, পাইকারী বিক্রেতা এসেছে কানু ভড়ের বাপের, ছেলের নামকরা কাপড় নিতে। সবাই বসে গল্প করেছে, ধামাভরতি মুড়ি খেয়েছে, জল খেয়েছে, পান

চিবিয়েছে, তামাক টেনেছে দু চোখ বুঁজে। বসে থেকে মাল নিয়ে গেছে। ··· আর আজ!

সুতো কেটে পেট চালাবে, তাও কানু ভড়ের বিধবা বউয়ের উপায় নেই। তুলো পাওয়া যায় না। জমিজমা এমন কিছু কোনকালেই ছিল না। অনাদায়ে সে জমিও বেহাত হয়ে গেছে। আজ অবশিষ্ট শুধু এ ভিটেটুকু আর নিজের হাত-পা। ভিটে ধুয়ে জল খাওয়া যায় না। আর আছে একটি মেয়ে, বছর পনর-ষোল বয়েস। সে মেয়েও আজ প্রায় মাসাধিক শয্যাগত।

মজুমদারদের সেজকর্তা একসময় লখাইয়ের মুখ থেকে এ দুর্দশার কথা শুনে বলেছিলেন, কলকাতার সংবাদপত্রে কানুভড়ের বউ একখানি আবেদনপত্র ছাপতে দিক, যাতে কাটুনির জীবিকানির্বাহের মত তুলোটুকু বিনামূল্যে সরকার সরবরাহ করেন ও সুতোর ক্রেতা হন। লখাই সেকথা বলেছিল কানু ভড়ের বউকে। বউ বলেছিল, তোমরা পড়শী লোকজন ছাড়া আমার তো কেউ নেই, যা করতে হয় কর। কোন রকমে বেঁচেবর্তে মেয়েটার বে' তো আমাকে দিতে হবে। তারপর মরি তাতে দুঃখ নেই।' বলে ঘরের যে বাঁশটায় কানু ফাঁসি লটকে মরেছিল, সে বাঁশটার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, কোম্পানি সব কেড়ে নিতে পারে, গঙ্গার জল তো নিতে পারে না।'

লখাইরা বাগদী ছোট জাত, তবু কানু ভরের বউ তাকে মান্য করত। শুধু লখাই কেন, শ্যামের সঙ্গে ত কানুর বন্ধুত্ব কিছু কম ছিল না। আর লখাই স্বেচ্ছায় কানুর বউকে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করার জন্য নিজেই এগিয়ে এসেছে। সাহায্যের জন্যই শুধু নয়, দায়িত্ব এবং বিচিত্র জ্বালা-বোধেই কানুর বউয়ের জন্য সবকিছু করতে রাজী আছে সে।

পশ্চিমাকাশের লালিমা কালো হয়ে আসছে। পাখীরা ফিরে চলেছে দল বেঁধে।

লখাই দেখল সন্ধ্যার আবছায়াতে কানুর বউ ঘরের দরজার কাছে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। বয়স বেশি নয়, গৌরবর্ণ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ঘোমটা খসা, জট বাঁধা চুল খোলা, অপলক চোখের তারা স্থির। লখাইকে দেখেও ঘোমটা টানল না।

লখাই বলল: 'সে চিঠি নে এসেছি কাটনিদিদি। বাবু যা লিখে দিয়েছেন, যোদ্দা এটু শুইনে যাই।'

তবু কাটুনিবউ একটি কথা বলল না। কেবল যেন কিছুই বুঝতে পারেনি এমনি অর্থহীন শূন্য দৃষ্টিতে লখাইয়ের হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইল।

লখাই দাওয়ায় উঠে এল। এদিক ওদিক দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, 'বাতি জ্বালোনি দিদি এখনো, রোগা মেয়ে ঘরে শুয়ে আছে।'

কাটুনিবউ হঠাৎ হাত বাড়িয়ে লখাইয়ের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে লেখাগুলো দেখতে লাগল।

আরও তাজ্জব হয়ে লখাই জিজ্ঞেস করল, 'তুমি পড়তে পার?'

কাটুনিবউ অত্যন্ত নীচু গলায় যেন কত দূর থেকে আপন মনে বলতে লাগল: 'আমার শউড়কে হুগলির সাহেবরা একবার পিটেছেল, সেই থেকে আমাদের এত দুদ্দশা। এতদিনে তার শেষ হতে বসেছে। এ চিঠিতে কি সে সবকথা লেখা যাবে না?'

বলে আবার তাড়াতাড়ি নিজেই বলল, 'থাক, তার দরকার নেই। সেজবাবুকে ব'লো আমার জবানি দে আর একখানা চিঠি লিখে

দিতে যে, গায়ের জোরে যারা সব নিল তাদের কাছে দয়া মেগে কি কিছু পাওয়া যাবে?'

বলে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'এ চিঠি আমার মরা মেয়ের শিয়রে থাক, চিতায় পুড়বে।'

আচমকা লখাইয়ের বুকটা সাপের দংশনে, বিষের বেদনায় ও যন্ত্রণায় আড়ষ্ট হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখল মরা মেয়ে এলিয়ে পড়ে আছে। বোধ করি রোগের যন্ত্রণাতেই গায়ের কাপড় খোলা। হায় রে, মরা মেয়েরও এত পুষ্ট যৌবন ও রূপের বাহার থাকে। মনে হয়, জ্যৈষ্ঠ রাতের গরমে ঘরের মেয়ে কাপড় সরিয়ে ঘুমিয়ে আছে।

লখাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। পুড়ে যাচ্ছে তার বুকের মধ্যে। এক দানবীয় হিংস্রতায় হাত দুটো তার পিস্‌পিস্ করছে। যেন খুঁজছে কার গলা টিপবে। মাথায় যেন আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে।

বেরুবার মুখে কানাচে সে দেখল কে একজন হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে রয়েছে। সে ডাকল, 'কে?'

মুখ তুললে দেখা গেল, 'মধু। মধুর চোখ লালটকটকে, জল ভরা, রেণরুদ্ধমান, কান্নায় করুণ।

'কি হয়েছে তোর মধু?' লখাই কাছে এসে তাকে টেনে তুলল।

মধু সেই ঘরটার দিকে তাকিয়ে একবার কেবল বলল, 'ওর বাঁচবার বড় সাধ ছিল।'

মধুর চোখ দেখে, গলা শুনে চমকে উঠল লখাই। হৃৎপিণ্ডটা তার যেন কেউ ছুরি দিয়ে বিদ্ধ করেছে। ওহো। ওই মরা মেয়ে মধুর পীরিতের মেয়েমানুষ। ··· কি দিন আজ লখাইয়ের! কি দেখতে হচ্ছে তাকে, কি শুনতে হচ্ছে তাকে এসব!

বাইরে বেরিয়ে এল সে। মাথার মধ্যে তার কারা যেন তুমুল কলরব তুলেছে, কোম্প্যানি, সেপাই, গোরা; সেনকর্ত্তা, সেজবাবু, কান্নু ভড়, আখাড়া, মহারানী, চটকল, রেললাইন, ফোর্ট গোলাস্টার ফোর্ট গেলাসটার

বাড়ীতে এল সে। তাকে দেখে কালীবউ চমকে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে গো' ?'

সে এক মুহূর্ত শান্ত হয়ে খালি বলল, 'কান্নুর মেয়েটা মরে গেল।'

'কি বললে ?' তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেল।

শ্যাম ঘর থেকে নেমে উঠোন পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাকরুদ্ধ, নিশ্চল। চুপচাপ কালীর পথের দিকে হা করে তাকিয়ে রইল, একটি কথাও বলল না!

কিন্তু লখাই চলে গেল। তাকে যেন পেছন থেকে কারা তাড়া করছে, জ্বলন্ত মশালের ঝাপটা মারছে গায়ে মাথায়। কাঞ্চনা-কাঞ্চীবউ কোথায়। ··· কাঞ্চীবউকে কি এখন একটু পাওয়া যায় না।

অন্ধকার নামছে। লখাই ছুটেছে গঙ্গার ধার দিয়ে নাড়ুলিয়ার দিকে। মানুষ, না, দানো ছুটছে বোঝা যায় না অন্ধকারে।

ভাটাপড়া গঙ্গা ছুটেছে দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে। ছুটেছে আকাশের তারা তার সঙ্গে। ছুটেছে লখাইও, বোধ করি সে জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

শেয়াল ডেকে উঠল জঙ্গলপীরের দহ থেকে, কালপ্যাঁচার ছলনার ডাক শোনা যাচ্ছে হুম্ হুম্ হুম্। চণ্ডু গুলির ধোঁয়ার গন্ধ উঠছে পীরদহের খাল থেকে। নেশাখোরের কুৎসিত গলার খ্যাল্ খ্যাল্ হাসি এক বিচিত্র ক্লেদাক্ত রসে ভরে তুলছে হাওয়া।

ফরাসডাঙ্গা সীমান্তের দ্বার বন্ধের প্রথম সঙ্কেত নাকাড়া বেজে উঠল ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্ ......: কালীবাড়ীর সন্ধ্যারতির কাসর ঘণ্টা শেষ হয়নি তখনো। ... তবুও যেন মনে হল নাটমন্দিরে দেবপুত্তলীর নৃত্যনাট্যের নূপুরধ্বনি শোনা যায়। না, নূপুরধ্বনি নয়, নহবৎখানায় সানাইয়ের সুরে বাজছে বেহাগ রাগিণী।

গঙ্গার বুকের উপর গুড়, গুড়্ ঘড় ঘড় করে চলেছে স্টিমার। গঙ্গার নৈঃশব্দ্যকে ভেঙ্গে শিঙ্গা ফুঁকছে সারেঙ্গ। গাড়ুলিয়ার নীলকুটির ইমারৎ ভাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। কাল হয় তো শেষ হবে। তারপর আখ্ড়ার বাড়ী।

লখাই যখন আখড়ায় ঢুকল, তখন মুরলীদাস খোল বাজিয়ে পুনি ও সরিকে নিয়ে গান ধরেছে ঃ

আমার চরণ পূজন শেষ হল না।
ফিরে কেমনে যাব বল,
প্রভু, মানি লাজহীনা আমি, সাধনা আমার শেষ হল না,
সবটুকু না নিয়ে দিয়ে, ফিরে কেমনে যাব বল।

লখাইকে দেখেই তাদের গান স্তব্ধ হয়ে গেল। মুরলী দাস তার হাত ধরে দাওয়ায় উঠিয়ে বসিয়ে উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে তোমার কান্ত? তোমার চোখ এত জলছে কেন, হাঁপাচ্ছ কেন?'

লখাই বসে পড়ে চোখ বুজে বলল, 'কি হয়েছে তা যদি বলতে পারতাম মুরলীদাদা, তবে তো বাঁচতাম। শুধু মনে হয়, পান জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে!'

মুরলী দাসের উৎকণ্ঠা বাড়ল। জিজ্ঞেস করল, 'আমার রাইকিশোরী—'

লখাই বলল, 'ভাল আছে।'

'তবে—'

তখন সে আজকের দিনের সব কথা ধীরে ধীরে বলে গেল। ফোর্ট গেলাস্টার, কান্তুতাঁতীর বউয়ের সেই চিঠির কথা, মধুর কথা। বলে সে বলল, 'তোমরা গাও মুরলীদাদা, আমি শুনি এট্টু।'

বলে সে চোখ মেলতেই দেখল সারদা অপলক ব্যাকুল চোখে অনেকখানি সামনে এসে তার দিকেই ঝুঁকে আছে। পুনি অর্থাৎ পূর্ণিমা খঞ্জনিজোড়া দুহাতে নিয়ে মুরলী দাসের পাশে বসে রয়েছে। মুরলী দাস তাকিয়ে আছে মন্দিরে তার যুগল মূর্তির দিকে।

মুরলী বলল, 'গান আমার আর জমবে না কান্ত। কাল থেকে সব গোছাতে হবে, আর মাত্র সাত দিন সময়। সবই তো ফেলে যেতে হবে, কেবল ওই যুগল ছাড়া। তাই ভাবি, হয়েছি বৈরাগী, কিন্তু এতদিনের সব ফেলে যেতে হবে ভাবলে বুকটা ভেঙ্গে যায়।'

বলতে বলতে সে উঠে পড়ল। পূর্ণিমাও চলে গেল। রইল শুধু সারদা।

সরদার মাথায় ঘোমটা নেই। আঁট করে খোপা বাঁধা, কপালে উজ্জ্বল রসকলি। ঝুঁকে পড়া শরীরের ভারে ঈষৎ উন্মুক্ত স্তনের সুডৌল রেখা যৌবন সুষমায় মনোহর। নিরাভরণ দুই নিটোল হাতে শরীরের ভার রেখে প্রশস্ত নিতম্ব বাঁকিয়ে পেছনে পা জোড়া মুড়ে রেখেছে। এ সেই হাসিত্রাসে চঞ্চলা সারদা নয়, মেঘভরাতুর শরৎ আকাশের মত গম্ভীর অথচ বর্ষণের বেগে অস্থির তার চোখ।

লখাই এক মুহূর্ত তাকিয়ে চোখ নামিয়ে বলল, 'তা হলে, কেউ গাইবে না তোমরা?'

সারদা বলল, 'আমি গাইব। তুমি আগে কিছু খাও, ঠাণ্ডা হয়ে ব'সো। গোঁসাই মন্দির বন্ধ করুক।'

মুরলী দাস মন্দিরের দরজা বন্ধ করে বলল, 'কান্ত, আজ রাতে তোমার যাওয়া হতে পারে না। খাওয়া দাওয়া করে গান শোন, ও পাগলী যেদিন নিজেরই ইচ্ছায় গায়, সেদিন কখন থামবে তার ঠিক নেই। গান শুনে তুমি শুয়ে পড়ো। সরি তোমাকে ঘর দেখিয়ে দেবে।' বলে লখাইয়ের হাত দুটি নিয়ে একটু চাপ দিয়ে চোখের ভাবে যেন কিছু মিনতি করল। তারপর বলল, 'আমি যাই।'

সারদা দুধ-খৈ আর কয়েকটা কলা, কয়েক টুকরো ফুটি নিয়ে এসে লখাইয়ের সামনে এনে রাখল।

মুরলী ডাকল, 'সরি!'

সারদা বলল, 'বল।'

'এদিকে আয় একবার।'

'কান্তকে খাওয়াব না?'

'খাওয়াবি। একটুস্‌খানিক শুনে যা।'

সারদা তাকাল লখাইয়ের দিকে। লখাইও তাকিয়েছিল।

সারদা বলল, 'একটু বস। আমি আসছি।'

একটু পরে সে এল। দু'চোখ যেন তার ঈষৎ লাল, মুখখানি যেন জলে ধুয়ে এসেছে এই মাত্র। বলল, 'খাও।'

লখাই বলল, 'খেতে মন নেই, তুমি গান গাও।'

'না, তুমি খাও আগে।'

জোর করেই লখাই যা পারল তা খেল। এঁটো বাসন সরিয়ে

হাত ধুয়ে বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে এল সারদা। ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে বসল সে।

দপ্ করে প্রদীপটা নিভে যেতেই লখাই চমকে উঠল। অন্ধকারে একবার লক্ষ্য করে সারদাকে দেখল, তারপর চোখ বুজিয়ে রাখল জোর করে। জগৎ সংসারে ধন্দের ঘোর, ধন্দ লাগে সারদাকে দেখে। সারদা তার মিষ্টি গলায় গান ধরল :

সখা, জানি জানি কি মিনতি আছে তোমার বাঁশীতে।
ব্যাকুল হৃদয়, আকুল শরীর
যাতনা গলিয়ে নয়নের নীর
সহে না সহে না ডাকিবে তবু, তোমাকে হয় না সহিতে।
বলি এত যদি ডাকাডাকি
পাখা দিয়ে কেন করনি পাখী
গোপন প্রেমের জ্বালা দিয়ে (হরি) রেখেছ শুধু দহিতে।

বিরহের কান্নায় বিলম্বিত সে সুরে লখাইয়ের সব ধন্দ কেটে গিয়ে যেন এক ব্যথিত সান্ত্বনায় তার পীড়িত উদ্দীপ্ত মন অপরিসীম ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে এল। প্রদীপ নেভানো ও সারদার নিরন্তর টান, অসহায় ও ক্ষুব্ধ প্রাণ ঢলে পড়ল অপরূপ বেদনার অতলে। তার দ্রুত নিঃশ্বাস হয়ে এল স্বাভাবিক, উষ্ণতা ঠাণ্ডা হল। হাত পা' যেন শিথিল হয়ে এল। বুজে এল চোখের পাতা। গানের এ সুর শান্তি ও বেদনার বিচিত্র রসে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে দেয়।

সারদার থামার নাম নেই। সে শুধু গেয়ে চলেছে একটার পর একটা, আর একটা। ক্লান্তি নেই। গায়ের কাপড় খসে গেছে,

চোখে কশ্রুর ঢল নেমেছে, কখনো কান্নায় ভেঙে যাচ্ছে গলা। তবু থামবার নাম নেই। অবশেষে সে গাইল ঃ

প্রণয় প্রমোদবনে ভ্রমি হে কান্ত কেমনে,
বিচ্ছেদ কালো ভুজঙ্গ আছে সদা বিষ ঢালে প্রাণে।'

গান শেষে সে নীচু গলায় ডাকল,' কান্ত!'

লখাই যেন তন্দ্রার অতলপার থেকে জবাব দিল, 'উঁ?'

সারদা তার হাত ধরে বলল, 'শুতে যাবে না?'

লখাই হঠাৎ চম্‌কে উঠল। মুখের কাছেই সারদার মুখ, তার নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে লখাইয়ের চোখে মুখে। অন্ধকারে লখাই দেখল সারদার চোখ ব্যথিত ও ব্যাকুল।

একমুহূর্ত লখাই থম্‌কে রইল। তারপর খপ্ করে সারদার হাত ধরে বলল, 'সই, এ জীবনের পোড়ানি কাটবার লয়, তুমি আমাকে শান্তি দেও।'

সারদা লখাইয়ের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সেখানেই ঘুম পারিয়ে সারারাত জেগে রইল। ভোরবেলা লখাইকে জাগিয়ে—স্নানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল।

২০

লখাই যখন ফিরে এল বাড়ীতে তখন সেখানে কেউ নেই। কেবল

শ্যাম একলা আপন মনে বসে বসে মাটীতে দাগ কাটছে। লখাইকে দেখে একবার জিজ্ঞেস করল, কোথায় ছেলে কাল রাতে?

লখাই বলল, 'মুরলীদাদাঁর আখ্ড়ায়।'

একমুহূর্ত লখাইয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার চোখ ফিরিয়ে অর্থহীন শূন্য দৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। হ্যাঁ, এমনি হয়েছে আজকাল শ্যাম। প্রকৃতপক্ষে সে কারুর সঙ্গেই কথা বলে না। যেন সব সময়ই নেশার ঘোরে ভাম্ হয়ে বসে আছে। যেন জগৎটাই তার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। মন্ত্রপূত জীন ভূতের মত যথানিয়মে মাঠের কাজ করে। করতে গেলে তার শেষ নেই। বিশ্রাম নিতে গেলে ক' দণ্ড গেল ঠিক থাকে না। খেতে বসলে কালী ভাত দিয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারে না। নিজের ভাতগুলো দিয়ে তারপর সে শ্যামকে উঠতে বলে। আশ্চর্য! খাওয়ার হিসাবও নেই শ্যামের!

কেবল কান্না বাড়ে কালীর।

লখাই গেল কাঙুর বাড়ীতে। সেখানে তখন কাঙুদের কয়েকজন জাতভাই মরা মেয়ে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করছে। লখাই দেখল শুষ্ক চোখ স্থির দৃষ্টি কাটুনিবউয়ের পাশে কালী বসে আছে। মধুর মড়া স্পর্শ করার অধিকার নেই, তাই মড়া বওয়ার মই বাঁধছে সে।

তারপর হরিবল ধ্বনি দিয়ে যখন মরা তোলা হল তখনো কাঙুর বউয়ের চোখে এক ফোঁটা জল দেখা গেল না। সে সকলের সঙ্গে গঙ্গা ধারের পথ ধরল। জলভরা চোখ নিয়ে সে মুখের দিকে কালী হতবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল।

দুপুর বেলা মরা পুড়িয়ে সবাই গঙ্গায় স্নান করে ফিরে এল।

কালী বার বার কিছু মুখে তুলতে বলল কাটুনিবউকে। কাটুনিবউ বিচিত্র হেসে বলল, অনেক খেয়েছি, আর কত খাব! ভাল চাও তো এবার তোমরা পালাও!

কান্নাহীন বিবিচিত্র হাসির সে কথা শুনে সকলেই এক অদ্ভুত ভয় ও অশান্তি করা চোখে বউয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

পরদিন সকালে আকাশে মেঘ করা গুমোট। রাত্রির শেষে এসে দিন যেন আটকা পড়ে আছে। লখাই কান্নুর বাড়ীতে এসে দেখল দাওয়ার উপর কালকের সেই জায়গাটিতেই তখনো কাটুনিবউ তেমনি বসে আছে। ফরসা রং পোড়া হয়েছে, কালী পড়েছে চোখের কোলে। কালো রং লাগানো পাটের মত চুলগুলো রুক্ষধূসর। তবু সারা শরীরে তার যৌবনের ছাপ সুস্পষ্ট। ছাই-মাটী-লাগা ভরা-কুম্ভের মত সে রূপ অপরূপ হয়ে উঠবে না আর কোনদিন। বিস্রস্ত বসন, ঢাকবার বালাইও নেই। কেবল চোখ জোড়ায় যেন চোখ-ধাঁধানো ধিকৃধকানি। লখাইয়ের নির্নিমেষ দৃষ্টিতে একটু বা সঙ্কুচিত হল সে। পরমুহূর্তে সেই বিচিত্র হেসে বলল, 'লখাই, এবার?'

লখাই চোখ নামাল, কিন্তু তার বড় অস্বস্তি লাগল কাটুনিবউয়ের হাসি দেখে। সে বলল, 'তুমি অমন করে হেস না কাটুনিদিদি।

হায়! সে কথা শুনে মিষ্টি বাজনার মত শব্দ করে এবার হেসে উঠল কাটুনিবউ। সে হাসি এক মূর্তিমান সর্বনাশের মত। আর চোখ পুড়ে গেল লখাইয়ের আচমকা হাসির দমকে আঁধার ফাটা আলোর মত কাটুনিবউয়ের অপরূপ মুখ দেখে।

কথা ফুটল না লখাইয়ের গলায়। জিভ্ আড়ষ্ট হয়ে গেল, ধুক পুক করতে লাগল বুকের মধ্যে।

হাসি থামিয়ে কাটুনিবউ লখাইয়ের আপাদমস্তক একবার দেখে বলল, 'কি নে থাকব, বল লখাই। মহাজনের ট্যাঁকে ভিটে, জমি নেই এক ফোঁটা, মেয়েমানুষের সব সোয়ামি সন্তান, তাও খেয়েছি। এবার যাব কোম্পানির চটকলে।

চটকলে? কেমন বিভ্রান্ত হয়ে উঠল লখাই। এই হাসি এই কথা, তারপরে চটকলে যাওয়ার ইচ্ছা, এ সবই যেন লখাইকে কেমন বিচলিত করে তুলল। বলল, 'চটকলে আর যে যাক, কাটুনিদিদি, তুমি যাবে কেমন করে? তোমার মত মেয়েমানুষের জায়গা সে নয়।'

'আমার মত মেয়েমানুষের—' বলতে বলতে আবার সেই দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটল বউয়ের মুখে। বলল, 'লখাই, নিজের ইচ্ছেয় কিছুই করিনি, আজ নিজের মতলবে কাজ করব আমি। আমাকে আট্‌কো না, আমি উঠি। আমার মত মেয়েমানুষের কি আর জায়গা-অজায়গা আছে?'

বলে সে উঠে পড়ল। যে ঘরে কানু গলায় ফাঁস দিয়েছিল সেই ঘরে গিয়ে সেই ফাঁসির বাঁশটার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মুখ তুলে বলল, 'কে জানত কোম্পানির 'পরে গোঁসা করে তুমি পানঘাতী হবে? যদি হলে, আমাকে জানতেও দিলে না। তুমি আজো আছ, কিন্তু অন্য জগতে। তোমার মেয়ে মরেছে, তবু আমি আছি। কত সাধ ছেল—তোমার মেয়ে হয়েছে, এবার ছেলে হবে। এ পোড়ামুখে বলি, এ রাক্ষুসে পেটে সেদিন ছেলে ধরতে তোমার চে বেশি সাধ ছেল আমার। তুমি যাওয়ার পরেতে, কেবলি ভেবেছি, বুঝিন মনের আসা পেটে রয়েছে। না, তা নেই। কিন্তু—'

ঊর্ধ্ব দেহ নগ্ন করে দু'হাত তুলে ফিসফিস্ করে বলল, 'দেখ, দেখ, আজও তেমনি আছি। তুমি বেঁচে থাকলে—'

সে চুপ করল। তবু চোখে একফোঁটা জল নেই। অসহ্য জ্বরের ঘোরে ও যন্ত্রণায় তার মুখ যেন আগুনের তাপে জ্বলছে। চোখ বুঁজে সে যেন কান পেতে শুনল তার জগৎ-দর্শনকামী অজাত শিশুরা গর্ভের মধ্যে ছটফট করে কোলাহল করছে। খানিকক্ষণ বাদে চোখ খুলে বলল, 'আজ সব রেখে থুয়ে পথ ধরেছি চটকলের, জানি না কি হবে ··· পরের গলার কাঁটা হয়ে তো থাকতে পারব না। তুমি গে পথের বার হলুম আজ ··· পথ দেখিও।'

বলে সে ফিরতেই দেখল লখাই দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

মৃত স্বামীর কাছে যে এমন করে বিদায় নিয়ে পথে বেরোয় তাকে ঠেকাবার কথা লখাই আর ভাবতে পারল না। কেবল বলল, 'কাটুনি-দিদি, যদি পর ভাব, তবে তোমাকে গলার কাটা হয়েই থাকতে নাগবে। তবু বলি, আমরা তোমার পর লই। আর ··· কান্নুদাদা যেদিন বলেছেল, এবার কোম্পানীর কলে চট বুনতে যাব, আমি বলেছিলুম, তার চে তাঁতীর মরণ ভাল।'

আচমকা যেন কাটুনিবউকে পুড়িয়ে ছাই করে দিল। সে চোখ বড় বড় করে লখাইয়ের দিকে তাকাল ফিরে। কি [illegible] চোখের চাউনি। বোধ করি লখাইয়ের বুকটা ফুঁড়ে দেখল। তারপর ঘোমটা তুলে দিয়ে বলল, 'এসবই তোমার কাছে রইল, দেখ।' বলেই হেসে ফেলল। আবার কি ভেবে হাসি থামিয়ে ঘরে ঢুকে মাথার ছাউনির মাচা থেকে একটা মুখ ঢাকা কলসী পেড়ে তার ভেতর থেকে বার করল একখানি নয়নমোহন উজ্জ্বল শাড়ী। মেঘ-চাপা দিনেও সে শাড়ীর কি বাহার।

যেন তার একেক ভাঁজে একেক রং। কয়েকটা ভাঁজ খুলে সে একবার সেই শাড়ী বুকে এলিয়ে দিল, আবার দুলিয়ে দিল কোমরের পার্শ দিয়ে, তারপর মাথায় দিয়ে ছড়িয়ে দিল কাঁধের উপর দিয়ে বুকের উপর। হেসে বলল, 'তোমার দাদার হাতে তয়েরী। আমার জন্যে। রোদ থাকলে মনে লাগত যেন আগুন লেগেছে গায়ে। হ্যাঁ গো, ঠিক আগুনের রকোম।' বলে চোখের কোণে কটাক্ষ করে অপরূপ হাসিতে যেন নবীনা প্রেমবতী হয়ে উঠল। তারপর ঘরের শিকল তুলে শাড়ীটা গুটিয়ে বুকে নিয়ে বেরুল।

হাতে তখনো কয়েকগাছা রূপোর চুড়ি। আঁচলে বাঁধা কয়েক গণ্ডা পয়সা।

লখাই যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে মায়ামুগ্ধ, নির্বাক।

কাটুনিবউ বেরিয়ে গঙ্গার পথ ধরে আতপুরের ঘাটের দিকে এগিয়ে চলল।

২১

কাটুনিবউয়ের অন্তর্ধানের পর কয়েক দিন লখাই যেন অস্থিমজ্জাহীন স্থবিরের মত পড়ে রইল। যখনই কাটুনিবউয়ের চলে যাওয়ার দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে সেই মুহূর্তেই স্বামীর কাছ থেকে তার বিদায় নেওয়ার দৃশ্যটিও এসে হাজির হয়েছে সামনে। তবু তার মনে এক দারুণ দহন শুরু হয়েছে, কান্থু তাঁতীকে চটকলে খাটতে যাওয়ার বদলে তার মরতে বলার সেই কথা মনে করে। সেইসঙ্গে

কাটুনিদিদির সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার বুকের মধ্যে শেলের মত বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। তার কেবলি মনে হচ্ছে, যে বিভীষণ বেগে আজ ইংরেজের কলকারখানা দেশে গেড়ে বসছে তার সেই উদ্দাম বেগকে ঠেকিয়ে রাখতে কি সে পারবে? না কি কানুতাঁতীর মত আর যারা আজ দলে দলে জমির ঠাঁই হারিয়ে ফেলে যাচ্ছে তাদের সে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে? তবে কোন্ রোখে সে কানুতাঁতীকে বলেছিল মরতে! এ দুরূহ চিন্তায় এসেই আবার ভাবছে, কানুর নিজের মন প্রাণ বলে কি কিছুই ছিল না, ছিল না কি কোন মান-অপমান বা কষ্টবোধ! যে কানু অমন মনভোলানো কাপড়ের কারিগর, সে যাবে চট বুনতে তাই বা কেমন করে সহ্য হয়। ··· তবু বার বার সেজবাবুর কথাই তার মনে পড়ল, রাত্রির পর দিন আসার অদৃশ্য বেগের মত আজ এ দেশের যুগ বদলাতে বসেছে, তাকে ঠেকিয়ে রাখা বোধ করি ঈশ্বরেরও দুঃসাধ্য। আর এও সত্য লক্ষ্মীন্দর, আমাদের পুরনো ঘর ভেঙ্গে যাচ্ছে ঠিকই; কিন্তু জগতের কাছে তো আমরাও আর পেছিয়ে থাকতে পারিনে। নতুন ঘর বাঁধতে লাগবে আমাদেরও। তবুও ···। হ্যাঁ, সেজবাবু সেই তবুও বলে যে বিলম্বিত টান দিয়েছেন সেই সুরে সুর মিলিয়ে লখাই বলেছে, নতুন ঘর বাঁধব কোথায় বাবু, আমার ভিটে যদি অপরের দখলেই রইল। আমার যে দিনরাত একাকার। সেজবাবু বলেছেন, সেটা জাতির উপর ভগবানের অভিশাপ। কবে তা খণ্ডাবে বলতে পারিনে, কিন্তু আজকের যুগকে আটকানো ঠিক হবে না, পারাও যাবে না।

যার দেশ নেই, তার আবার যুগ কিসের? আগে তবে সেই অভিশাপই খণ্ডন হোক। এই হল লখাইয়ের মনোভাব। তবুও

কাম্নুতাঁতীর সংসারের ছারেখারে যাওয়ার যন্ত্রণা তার বুক থেকে গেল না। সেজবাবু থাকলে আজ তার কাছে গিয়ে দুদণ্ড মনের কথা বলতে পারত। কিন্তু সে নেই। পবন চাঁড়াল নেই ভাটপাড়ার সেই দাদা-ঠাকুরকে পেলেও বকে বকে দুদণ্ড শান্তি পাওয়া যেত। কালীবউ একা এ সংসার ও শ্যামের ভার নিয়ে বেসামাল। লখাইয়ের গুম খাওয়া দেখে সে আরও ভেঙ্গে পড়েছে। মধুও হঠাৎ দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। কাম্নুতাঁতীর মেয়ের জন্য দুদিন কেঁদেছে সে। কে জানত সে মেয়ে তার শৈশবের ভাবভালবাসার সাথী। আবার সে খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে কাজেকর্মে মন দিয়েছে কিন্তু বাড়ীতে তার পাত্তা থাকে না বড় একটা খাওয়া শোয়ার সময়টুকু বাদে।

আর কাঞ্চীবউ তো এখানে নেই। সংবাদ এসেছিল, সে যমজ পুত্র সন্তান প্রসব করেছিল। তার মধ্যে একটি পাঁচদিন পরে মারা গিয়েছে, অপরটি জীবিত এবং ভালই আছে। সন্তানের জন্য নয়, কাঞ্চীবউয়ের জন্যই প্রাণটা ছটফট করে উঠছে লখাইয়ের। কয়েকবার ভেবেছে সে সোজা দেউলপাড়া চলে যাবে কি না কাঞ্চনের কাছে। কিন্তু কি মনে করে থেমে গিয়েছে। আজকের এ দুর্দশার দিনে কাঞ্চন কাছে থাকলে মুখ ঝামটায়, হাসিতে আদরে অভিমানে তাকে একরকম ভরে রাখতে পারত। শুধু তাই নয়, এ কদিনের সমস্ত ঘটনাগুলোর গতি তার মস্তিষ্কটাকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। সে যত ভাবতে যাচ্ছে, তত তার চিন্তার দৌড় ঝিমিয়ে আসছে, এক অপরিসীম অবসাদে ভেঙ্গে পড়া বুকটা তার বড় খালি হয়ে গিয়েছে। এই যে খালি এবং ফাঁকা ভাব, সেটাই তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে আরও। তাই বারবারই

কাঞ্চনের কথা মনে পড়ছে তার, যার কাছে গিয়ে সে তার সব ভার-টুকু নিশ্চিন্তে ফেলে দিতে পারে।

এর মধ্যেই মেঘের বুকে বিদ্যুতের মত সারদার মুখটিও বারবার ঝিলিক মেরে উঠেছে তার মনে এবং এক বিচিত্র আবেগে বুকের মধ্যে ঝড় উঠেছে তার। বিশেষ করে, সারদার সেদিনের সমস্ত জীবনবৃত্তান্ত এবং কান্ত লখাইয়ের কাছে অতীত জীবনের অন্ধকারের কথা বলে বারবার তার নিজের গ্লানি প্রকাশও তাকে মর্মে ঘা দেওয়া—এ সবই তাকে অস্থির করে তুলছে মনে মনে। সেই সঙ্গে তার অবাধ ও নিঃসংশয়ে প্রেম-নিবেদন, আকাঙ্খার গৌরবে তার সেই শান্ত মধুর জলভরা মুখ, অন্য দিকে প্রাণের অকপট স্বীকৃতি ও মানবীর রুদ্ধ বাসনার ব্যাকুলতা—সমস্ত মিলিয়ে লখাইয়ের হৃদয়ে নিজেকে অঙ্কিত করে রেখেছে সে।

ইতিমধ্যে আখড়ার উচ্ছেদ কাজও শুরু হয়েছে। মনে এবং বাইরের এ দুঃসময়ে মুরলীদাদার লখাইয়ের সঙ্গ পাওয়ার ইচ্ছা থাকা খুবই স্বাভাবিক।

শেষ পর্যন্ত সারদার টানই তার কাছে বড় হয়ে উঠল। সে আখড়ায় এসে হাজির হল।

সে এসে দেখল, আখড়ার বড় বিশৃঙ্খল অবস্থা। বহু জিনিসপত্র বাইরে ইতস্তত ছড়ানো। একটা গরুর গাড়ীতে মাল ওঠানো হচ্ছে। মুরলীদাস বসে রয়েছে মন্দিরের সামনে। শুধু ঠাকুরের ঘরটিতেই এখনো হাত দেওয়া হয়নি এবং সে স্থানটি তেমনি পরিষ্কার ঝকঝকে রয়েছে।

সারদা শাড়ীতে গাছকোমর বেঁধে গাড়ীতে মাল তুলছে।

লখাইকে দেখামাত্র তাঁর চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল হাসি। ক্লান্তি চাপতে ঠোঁটের উপর দাঁত চেপে মোহিনী হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করল সে লখাইকে। মনে হয় সে-রাত্রির বেদনার পাষাণ তার বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই সে যেন ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে।

লখাই সোজাসুজি তার কাছে এসে দুর্বোধ্য চোখে তাকিয়ে রইল এক মুহূর্ত, তারপর মুখ ফিরিয়ে মুরলীদাসের কাছে এল।

মুরলীদাস তাড়াতাড়ি হাত ধরে বিষাদভরা গলায় বলল, 'এ্যদ্দিনে তোমার সময় হল কান্ত? রোজই ভাবি আজ আসবে। কালকে যে শেষদিন!'

বলতে বলতে মুরলীদাসের চোখে জল এসে পড়ল।

লখাইও নীরব। তার কোন সান্ত্বনা নেই।

কেবল আজ চোখে জল নেই সারদার। সে যেমন তেমনি নীরব হাসিতে ভরপুর। আখড়া ত্যাগে ওর যেন কোন দুঃখ নেই মাঝে মাঝে সে গুনগুনিয়ে উঠছে, ক্ষণে ক্ষণে চোখের কোণের বঙ্কিম কটাক্ষে লখাইয়ের মেঘভারাতুর বুকে এঁকে দিচ্ছে বিদ্যুতের রেখা।

লখাই জিজ্ঞেস করল মুরলীকে, 'আর সব কোথায় মুরলীদা?'

মুরলী বলল, 'আর সবার মধ্যে পুনি গেছে নতুন আখড়ায়।' কনি রান্না করছে। মালটা বোঝাই হলে আমিও সেখানেই যাব। তুমি সেখানে যাবে না কান্ত?'

'যাব বৈকি, মুরলীদাদা। তোমরা তো সব গোছগাছ কর, তা পরে যাবে।'

বাইরের দরজার পাল্লা দুখানি গাড়ীতে ওঠানোর পর গাড়ী

ছাড়ল। মুরলীদাস বলে গেল, 'তুমি থেকো কান্ত, ও বেলা আমি আসব।'

মুরলীদাস চলে গেলে সারদা কাছে এসে বলল, 'নেয়ে এসো, বেলা অনেক হয়েছে। তেল গামছা দিই?'

কিন্তু লথাই কথা বলতে পারল না, অপলক চোখে সে সারদার দিকে তাকিয়ে রইল।

সারদা সে চোখের দিকে তাকিয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। 'অ মা গো! অমন করে চেয়ে আছ যে?' বলেই সে তার ঘর্মাক্ত মুখখানি কাপড়ে মুছে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে, ঘাড় বাঁকিয়ে লখাইয়ের দিকে তাকিয়ে গেয়ে উঠল :

হায় বড়াই, কে জানিত তোমার রাখালের এমন কুমতি,
লোকে ভরা পথবাঁকে, হাত দিয়ে ধরে রাখে,
ছাড়ালেও ছাড়ে না, আমি বুঝিনে এ পিরিতির রীতি।'

লখাই শুনল রান্নাঘরে কনকের খুন্তি নাড়ার শব্দ। সে হঠাৎ উঠে এসে সারদাকে দু'হাতে তুলে ঘরে নিয়ে একটা তক্তাপোশের উপর বসিয়ে দিল।

হাসি ও ত্রাসে চঞ্চল সারদা বলে উঠল, 'কান্ত ছাড়, কান্ত!'

লখাই মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে সারদার কোমর বেষ্টন করে তার মুখের দিকে তাকাল।

হাসি ও লজ্জায় অপরূপ হয়ে উঠল সারদা। বিন্দু বিন্দু ঘামে আবার ভরে উঠেছে তার সারা মুখ। এলো চুল খুলে পড়েছে একপাশে হেলে। আঁট করে গাছকোমর বাঁধা শাড়ীর রেখায় তার দীর্ঘজীবনের সঞ্চিত যৌবন মোহিনীময়ী হয়ে উঠেছে। কিশোরী

বয়সের বর্ধিত যৌবন, যৌবনের লগ্নে আঁধারে উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

কথা বলতে গিয়ে লখাইয়ের হেঁড়ে গলা কেঁপে গেল, 'সই, তোমার কাছেই এসেছি আমি।'

সারদার চোখে রক্তের আঁচ, নিঃশ্বাস দ্রুত। বুকের ধুকপুকুনি শুনতে পাওয়া যায়। তার জীবনে প্রথম পুরুষের আবির্ভাব। বিশাল ও শক্তিশালী কালো পুরুষ, একমাথা দীর্ঘ চুল, মনসার বরপুত্র, এক বিচিত্র মানুষ। চওড়া মুখে তার যেন বহু যুগযুগান্তের ঝড়ের চিহ্ন বর্তমান, গুহামানবের মত যেন অন্ধ ও সরল।

সে দুই হাতে লখাইয়ের মুখ তুলে ধরে বলল ফিসফিস করে, 'কান্ত, আমি তোমারি জন্যে পথ চেয়ে বসেছিলুম। তুমি যদি দুঃখ না পাও—'

মুহূর্তে লখাই পিষে ফেলল সারদাকে বুকের মধ্যে নিয়ে।

সারদা বলল তার কানে, 'এ যে দিনমান।'

দিন কাটল, রাত্রি এল। নিদ্রার অন্তরালে এক দারুণ উৎকণ্ঠা ও ভাবনা নিয়ে মুরলীদাস তার কুড়নো সারদার মিলনের সাক্ষী রইল।

রাত্রি শেষে লখাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সারদা বলল লখাইকে, 'আজকের জন্য কোন দিন দুঃখ পাবে না তো?'

কি ভেবে সারদা বলল একথা লখাই হয় তো তা বুঝল না। সারদার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দুঃখু ছাড়া জীবন নেই, নইলে আজ এত সুখ কেন?'

লখাইয়ের মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে সারদা বলল, 'তোমার দুঃখের দিনে আমার কাছে এস।'

২২

পরদিন ফেরবার পথে জঙ্গলপীরের কাছে এসে হঠাৎ লখাইয়ের শ্রীনাথের কথা মনে পড়ে গেল।

তার সঙ্গে দেখা করা মনস্থ করে লখাই জঙ্গলপীরের ভেতর দিয়ে কাঠুরেপাড়ার মধ্যে ঢুকেই শুনতে পেল শ্রীনাথ চীৎকার করে বেসুর গলায় গান ধরেছে :

'কত যে ঢলালি ঢলানি কুলকলঙ্কিনী,
তোর বে উপলক্ষ, ঘটক এল লক্ষ লক্ষ
হয়ে রাজার শত্রুপক্ষ বিপক্ষ হাসালি।'

লখাই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে দেখল দুই বউ সহ তিনজনে এই সকাল বেলাতেই তাড়ি খাওয়া শুরু করেছে। লখাইকে দেখে দুই বউ মত্ত হেসে কাপড় সামলাতে গিয়ে আরও বেসামাল হয়ে উঠল। শ্রীনাথ সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল, 'আরে বা বা বা। লখাই এস, লখাই এস, বসে পড়।'

লখাই বলল, 'আজ সকাল বেলাতেই শুরু করেছ?'

শ্রীনাথ বুক ফুলিয়ে বলল, 'আমার খুশি, কারুর সাহস থাকে বলে যাক্ কুকথা, কেরামতিটা দেখি একবার।' তারপর হো হো করে হেসে উঠে বলল, 'আর কি কাজ আছে বল? চাল নেই, তাই রান্না নেই। গাছ নেই, তাই কাটাও নেই।'

'গাছ নেই কেন?'

'কত্তারা বন্ধ করে দিয়েছে।'

'কেন, খাজনা দিতে না বনের?'

'কোন্ শালা বলবে। একপয়সা খাজনা বাকি আছে ছিনাথের? কিন্তু মহাজনে ডেকে নিল চড়া দরে।'

কি কথা বলতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল লখাই।

শ্রীনাথ সে কথা ছেড়ে বিড়বিড় করে বকতে লাগল, 'আর শালী দুটো যে কি? ছাখ্ তো লখাই, মাগী দুটো মেয়েমানুষ কি না?'

লখাই তাকিয়ে দেখল বেসামাল বউ দুটো হঠাৎ ভয়ে কুঁকড়ে উঠেছে শ্রীনাথের কথা শুনে। আর মার খাওয়ার ভয়ে পানের মাত্রাও বেড়ে গেল তাদের।

লখাই বলল, 'মেয়েমানুষই তো।'

'ঠিক দেখেছিস?'

'হ্যাঁ গো।'

'আর আমি? ব্যাটাছেলে কি না?'

লখাই তাকিয়ে দেখল, শক্ত শ্রীনাথ খানিকটা দুমড়ে গেছে যেন। হাড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে। বলল, 'সে কথা বলে! তুমি হাজারবার পুরুষ।'

'তবে মাগীদের ছাওয়াল হয় না কেন, অ্যাঁ?'

বউ দুটো যত শুনছে তত গিলছে ঢকঢক করে।

লখাই এসব কথায় শান্তি পেল না। গভীর উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু ছিনাত্‌দা, তাড়ি খেয়ে তো পেট ভরবে না। তুমি কি করবে?'

ছিনাথ হাত ঝটকা দিয়ে ঠোঁট উল্টে বলল, 'আমার একটা তো পেট। কোনরকমে—'

লখাই অবাক হয়ে গেল। 'একটা পেট কি রকম ?'

'ও দুটোকে তো বিলিয়ে দে যাব।'

লখাই তাকিয়ে দেখল, ওদুটোর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা একনিষ্ঠ ভাবে পান করে চলেছে। সে বলল, 'বিলিয়ে দে কোথায় যাবে।'

'যাব চটকল মটকলে।'

চটকল মটকলে ? দুনিয়াশুদ্ধ লোক কি ওই এক কথাই ভাবছে ? চটকল আর চটকল ! হঠাৎ যেন শ্রীনাথের উপর তার মায়াদয়া দূরে থাক রাগ হতে লাগল। সে উঠে পড়ল।

শ্রীনাথ তার হাতটা ধরে ফেলে বলল, 'একটুস্খানিক খেয়ে গেলিনি ?'

'না, ছেড়ে দেও।'

'ছাড়ব না একটুস্ খা।'

'তুমি চটকলে গে মর, 'ছেরাদ্দে খাব।'

'তা খাস্, এট্যুস্ খা।'

'ধ্যাৎতরি তোর এট্যুস।' বলে লখাই লাথি দিয়ে তাড়িপূর্ণ ভাঁড়টা ফেলে বেরিয়ে গেল।

বউ দুটো আঁতকে উঠে সেই তাড়ির উপর পড়ে মরাকান্না জুড়ে দিল।

শ্রীনাথ চীৎকার করে ডাকল, 'লখাই, লখাই, লক্ষীন্দর ! ...'

লখাই ফিরল না।

শ্রীনাথ ক্রন্দনরতা বউ দুটোকে ধমকে উঠল, 'এ্যাই চুপ কর। ক'দিন কাঠ না কাটা হাত সুড়সুড় করছে, শেষটায় তোদেরই আমি চেলা করব কেটে।'

তারপর নিজের মনেই বলতে লাগল, 'এঃ শালা পেটটা এখনও চস্‌চস্ করছে।' বলতে বলতে ঘরে গিয়ে কুড়ুলটা বের করে নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল। বউ দুটো ভয়ে জড়সড় হয়ে বসল।

শ্রীনাথ বলল, 'এ্যাই হারামজাদীরা, চল্ তো জঙ্গলপীর থানে। ওখানকার জমি আর গাছ তো মানুষের নয়, দেবতার। ওখানেই গাছ কাটব আজ।'

বউ দুটো আতঙ্কে ডুকরে উঠল।' 'হেই সব্বোনাশ, দেবতার থানে গাছ কাটবে?'

'তা মানুষের থানে না পেলে কি করব?'

বলে সে সেই কুটিল দেবদেবীর আস্তানা জঙ্গলপীরের দিকে অগ্রসর হল।

বউ দুটো ভয়ে ভয়ে উঠল। এগুলো, আবার পেছুল। একটা বউ বলল, 'চল্ পাইলে যাই।'

'কোথায়?'

'তেলেনীপাড়ায়।' 'মেয়েমানুসে কাজ করে সেখেনে।'

'চল।'

বলে তারা গঙ্গার ধারের দিকে দ্রুত চলতে শুরু করল।

জঙ্গলপীর থেকে বউ দুটোকে ছুটতে দেখে প্রথমে ভীষণ রাগ হল শ্রীনাথের। তারপর ভাবল, না আসতে চাওয়ার মারের ভয়ে পালাচ্ছে— যেমন পালায় অন্য সময়ে মারের ভয়ে! তারপর মনে মনে হেসে, বলতে লাগল সে, 'ছেলেপুলে হবে না, সে ভয়ে মাগীরা দেবতার থানে গাছ কাটবে না।'

বলে হাসতে হাসতে কুড়ুলটা রেখে বসে পড়ল, 'থাক, কাটব না।

২৩

দুপুরবেলা।

একটা গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল শ্যামের বাড়ীর দোরগোড়ায়। বলদের গলায় ঘণ্টার শব্দে কালী বাইরে এসে দাঁড়াল। বাড়ীতে তখন আর কেউ নেই। কালী ভাল করে উঁকি দিয়ে দেখল কাঞ্চন ছইয়ের ভিতর বসে মিট মিট করে তার দিকে চেয়ে হাসছে। কোলের ভিতর থেকে তার দুটি কোমল কচি কচি হাত মুখের দিকে উত্থিত হচ্ছে। সে খবর আগেই এসেছিল যে, কাঞ্চনের যমজ ছেলে হয়ে একটি মারা গেছে, অপরটি জীবিত আছে এখনও এবং ভালই আছে। সেও আজ দুমাস আগের কথা।

খুশির বেগে কালী ফিসফিস্ করে উঠল, 'হারামজাদী ঠাট করে বসে আছিস কেন, নেমে আয়।'

বলে সে ছুটে গিয়ে ছোঁ মেরে তার কোল থেকে শিশুকে তুলে নিয়ে চুমোর আদরে অতিষ্ঠ করে তুলল। কিন্তু ছেলেটা তাতে বিশেষ অস্বস্তি পেল বলে মনে হল না। সে তার উজ্জ্বল অপলক চোখ দিয়ে সব দেখতে লাগল। কালীর কোলে পা দিয়ে গুঁতিয়ে ড়িঙি মেরে উঠে, কালীর নাক চোখ মুখ সব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হাঁয়ের মত গিলে নেওয়ার চেষ্টায় নালে ভরে তুলল। আর এইটুকু ছেলে হাঁ করে মাড়ি দেখিয়ে হাসতে লাগল কেমন খিল্ খিল্ করে।

সে হাসি শুনে কালী পাগল হয়ে গেল, 'ওরে সব্বোনেশে, মোনসার নাতি।'

আশেপাশের বাড়ীর মেয়ে-বউরা ভিড় করল এসে। ছেলে দেখে যে যার মন্তব্য করতে শুরু করল। কেউ বলল, 'অবিকল কাঞ্চনের মত দেখতে হয়েছে। কেউ বলল, কাঞ্চনের রং পেয়েছে, কিন্তু হয়েছে বাপের মতই।' কালী বলল, 'চোখে মুখে একেবারে ওর মা, নাকটা শুধু বাপের পেয়েছে।'

কাঞ্চনের রূপ কমেনি কিন্তু কেমন যেন শুকনো ভাব একটু। হয়তো এতখানি পথ আসতে এমন দেখাচ্ছে! তার চোখ ব্যাকুল অস্থির কাকে যেন খুঁজছে সে। থেকে থেকে তার সারা মুখে বিচিত্র গোপন হাসি খেলে যাচ্ছে আর বাইরের দিকে দেখছে কেবলি। তারপর কালীকে বলল, 'জানো দিদি, তোমার দেওরপুতকে মাঝে মাঝে কাঁদিয়ে কান্না শুনতে নাগে। ছোঁড়া শুধু হাসে।'

'হাসুক, আমি তাই দেখে মরব।'

বলতে বলতে তার চোখে হু হু করে জলের ধারা ফেটে বেরুল। শিশুর গালে গাল দিয়ে সে বলে উঠল, 'এ সমসারে আর কেউ হাসে না, কেউ না। ও হাসুক রাতদিন, হেসে হেসে সবার ঘুম অবধি কেড়ে নিক।'

মেয়েদের ভিড় কমে গেলে কাঞ্চন জিজ্ঞেস করল, 'দিদি, ভাসুর কোথায়? মধুকেও দেখিনে?'

কালী বলল, 'ওরা মাঠে গেছে। আর লখাই—'

তাকে চুপ করতে শুনে কাঞ্চন উৎকণ্ঠিত চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকাল।

কালী বলল, 'কাজ নেই, সে তো শুনেছিস। কোনদিন মাঠে যায়, কোনদিন যায় না! এখানে সেখানে ঘোরে, কি যেন ভাবে, নোকজনকে

বলে, চটকলের গোরাদের কেউ জমি বিবিও না। লোকে বলে বিবব না কিন্তু মনে মনে সবাই জানে, চাইলে বিকতেই লাগবে। আর মুরলীদাসের আখড়া ভেঙে সেখেনে চটকল হয়েছে। আখড়া উঠে গেছে পুবে, পেরায় মাঠের ও পরে। সেখানেও যায়, থাকে কোন কোন দিন।'

থাকে? আখড়ায়? চমকে উঠল কাঞ্চন। চোখ জ্বলে উঠল, ফুলে উঠল নাকের পাটা। সারা মুখ যেন প্রবল জ্বরের ঘোরে থম্থমে হয়ে উঠল। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

তার চোখের উপর বারবার ভেসে উঠল সরি বোষ্টমির হাসিখুশি মুখ। যে হাসি দেখে লখাইয়ের ধন্দ লাগে। সেই ধন্দের ঘোরে বুঝি আজকাল রাত্রিযাপন করেও আসতে হয়। মিন্‌সে! কাঞ্চী বউয়ের শিয়রে তুমি এমনি করে মরণকাটি বয়ে আনছ?

২৪

ভোরবেলা।

তেলেনীপাড়ার চটকল।

মস্তবড় উঁচু দেয়ালের একটানা লম্বা ঘর, পেটানো ছাদ। গোল গোল ইটের থাম ও চৌকো কাঠ দু'ফুট স্কোয়ার, তার উপরে কড়ি। হলের এক অংশে পাট পেঁজা করা ও সুতোর মেশিন বসান। মাঝে একটা চওড়া ছেদ পড়েছে। তারপর শুরু হয়েছে তাঁতের সারি। হলের কিছুটা পুবে বয়লার ঘর; তার সঙ্গে পাইপ সংযুক্ত স্টিম এঞ্জিনের পাথর বাঁধানো দোতলা ঘর।

ভোর ছ'টা বেজে গেলেও এখনো মাত্র কয়েকজন মেয়েপুরুষ এসেছে। তারাও এসে কারখানার মধ্যে ঢুকে নিজেদের মধ্যে গাল-গল্প শুরু করল। অনেকেরই ধারণা হয়তো ছ'টা বাজেনি এখনও। বাজলে কলের বাঁশী এতক্ষণ বেজে উঠত নিশ্চয়ই।

কারখানার অদূরেই পূব-দক্ষিণ কোণ ঘেঁষে গোরা সাহেবদের কুঠি। রাজপ্রাসাদের মত দোতলা অট্টালিকা। একতলার পেছনে ও সামনে কত সারি সারি জোড়া জোড়া থাম চলে গেছে। সুপ্রশস্ত ঝকঝকে বারান্দা। দেয়াল প্রায় দু'ফুট চওড়া। দরজার মাথায় কোন চৌকাঠ নেই, দুর্গের মত অর্ধগোলাকার দেয়ালের মাথায় মাথায় দরজাও গোল করে কাটা। কারখানার দিকের দরজাজানলাগুলি বন্ধ, খিলানে কার্নিশে অসংখ্য পায়রার ভিড়। সেই দরজাবন্ধ প্রাসাদ থেকে পিয়ানোর মিষ্টি শব্দ আসছে ভেসে ভেসে। সেই বাজনার শব্দে ও আকাশের গায়ে হেলান দেওয়া ঢেউ খেলানো আলসে দেখে মনে হয় জগতের সমস্ত ভিড়ের বাইরে যেন একটি সুপ্ত স্বর্গপুরী। সামনে বিস্তৃত জমির উপর দেশী বাগান। কয়েকটি এ দেশীয় লোক নিয়ে এক সাহেব বাগানের কাজকর্ম দেখছে। বাঁধাকপির চাষটার দিকেই সাহেবের নজর বেশি। বাগানের গেটে একজন বন্দুকধারী প্রহরী।

কারখানার অদূরের উত্তর কোণে কোম্পানির জায়গাতেই একটা লম্বা ব্যারাকের মত সুদীর্ঘ চালাঘর। ছোট ছোট আলাদা ঘর করা হয়েছে তার মধ্যে বেড়া দিয়ে। সেখানে থাকে যারা অন্যত্র থেকে এখানে এসেছে। কোম্পানির পয়সায় বাঁশ মাটি দড়ি বিচুলী ইত্যাদি কিনে বাসিন্দারা নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছে এ ঘর।

ম্যানেজার রবাসেন আর মিস্তিরি আহের আলী অর্থাৎ রবার্টসন্ এবং ওয়ালিক আসতেই কিছুটা তাড়া পড়ল কারখানার মধ্যে। কিন্তু আসল যন্ত্রই এখনও চালু হয়নি—কাজ সবাই করবে কি?

ওয়ালিক তাড়াতাড়ি স্টিম ঘরের দিকে গেল। সেখানে মেশিনের ধারে খানিক বাঁধানো জায়গায় জনা দুয়েক অপটু মিস্ত্রি শুয়ে আছে। সাহেবকে দেখেই লাফিয়ে উঠে বলল, 'কেদার এখনও আসেনি সায়েব।'

কেদার হল এখানকার সাহেবদের চোখের মণি। শুধু স্টিম বলে কথা নয়, সারা চটকলের সমস্ত মেশিন তার নখদর্পণে।

ওয়ালিক জিজ্ঞেস করল, 'নারান কাহাঁ, নারান?

মিস্তিরি দু'জন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে একজন বলল, 'সে এখন সগেগ আছে, মিস্তিরি সায়েব।'

'ক্যায়া?'

'মদ—বুঝলে? দারু খেয়ে ঘর মে পড়ে আছে।'

রবার্টসনও সেখানেই এসে হাজির হল। রবার্টসন অপেক্ষাকৃত গম্ভীর এবং অহঙ্কারী। সে কোন মতে কখনোই তুষ্ট নয়। তার ধারণা এদেশের লোকগুলো শুধু নয়, পৃথিবীর সমস্ত কালো মানুষকেই একদিন সাদা হতে হবে। কারণ এদের মনুষ্যজন্ম খুব বেশিদিনের নয়। আর কালোই হচ্ছে মানুষের আদিম রূপ। যে জাতির অগ্রগতি সেদিক থেকে বেশি, সে জাতিই সাদা হয়েছে। সেইজন্যই সে এ দেশীয় কোন ফরসা মানুষ দেখলেই তার বংশ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে। তা ছাড়া, এরা ধর্মান্ধ তো বটেই, এবং এক দুরন্ত ধর্মান্ধর পাল্লায় তাকে একবার পড়তেও হয়েছিল ওপারে গাড়ুলিয়ার এদেশীয় এক ব্ল্যাক দেবতার মন্দিরে। সে লোকটার কথা সে জীবনে

কোন দিন ভুলবে না। সে চেয়েছিল লোকটাকে খুনী বলে পুলিশের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু আর কেউ ব্যাপারটাকে আমল দিল না বলে সে রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সে বেশ খানিকটা তাজ্জব হয়ে যায়—ওয়ালিক এবং তার অন্যান্য কর্মীরা অনেকেই রীতিমত ঠাণ্ডা মাথায় এদের সঙ্গে কথা বলতে পারে।

সে যখন ওয়ালিকের মুখে শুনল, কেদার আসেনি, স্পষ্টই বলল, 'ওকে পুলিশের হাতে দিয়ে দাও, কারখানার দায়িত্ব সে পালন করেনি।'

ওয়ালিক একটু হেসে তাকে নানান্ কথা বুঝিয়ে বাইরে নিয়ে গেল। তারপর সে কুঠির আস্তাবলে ঢুকে এক্কার সঙ্গে নিজের হাতেই ঘোড়া জুতে বেরিয়ে গেল মাথার উপর চাবুক ঘুরিয়ে।

যে সব মেয়েপুরুষ বাইরে দাঁড়িয়েছিল রবার্টসন তাদের ধমকে ভিতরে পাঠিয়ে দিল। তারপর নিজে সে এগুল চালাঘরটার দিকে। যে সব ঘরের দরজা তখনো ভিতর থেকে বন্ধ, সেগুলো ধাক্কা দিতে লাগল।

একটা ঘরের দরজা খুলে উঁকি দিল মদনে কৈবর্তের বউ কাতু। সদ্য ঘুমভাঙা আরক্ত চোখ, বিস্রস্ত বেশবাস, দরজা খুলেই রবাসেনকে দেখে রুষ্ট হয়ে উঠল সে। বলল, 'আ'মলো মুখপোড়া, দরজা ধাক্কাচ্ছ কেন?'

রবার্টসন বাংলা দূরের কথা, এখনও হিন্দিই ভাল বলতে পারে না। বললে', 'হোয়াট?'

কাতু বলল, 'বলছি কেয়া হুয়া?'

'টুম কাম মে নই গিয়া কেঁও?'

'তোর বাঁশী বাজেনি তো যাবো কি।' বলে সে মুখ টিপে হেসে আবার বলল, 'শ্যামের বাঁশী তো নেহি হুয়া।'

রবার্টসন্ বুঝল না কিছু। বলল, 'নারান কাহাঁ?'

কাতু এবার ঝেঁঝে উঠল, 'আ মলো, নারান কি আমার ভাতার যে ওর কথা এসে আমাকে জিজ্ঞেস কর?'

রবার্টসন কিছু না বুঝে কাতুর গায়ের উপর দিয়ে জানালাহীন অন্ধকার ঘরটার মধ্যে ঢুকে গেল। গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল দুটো মেয়েমানুষ প্রায় অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় শুয়ে আছে কাঁচা মেঝের উপর। এবং দুজনেই যে অন্তঃসত্ত্বা তা বুঝতে রবার্টসনের দেরি হল না ওদের গোল এবং উঁচু পেট দেখে।

জিজ্ঞেস করল কাতুকে, 'ইলোক কৌন্ হ্যায় ক্যান্ মে কাম কয়টা হ্যাঁয়?'

'হ্যাঁ গো সায়েব, কারখানার কামিনদেরও চেন না?'

'টুমকো রিলেটিভ্ হ্যায়?'

'তোমার মরণ হ্যায়।' বলে কাতু ঘরের মধ্যে ঢুকে সাহেবকে বলল, 'তুমি যাও সাহেব, হাম্ যাতা হ্যায়।'

রবার্টসন্ বলল, 'গেট্ আপ্, জল্‌ডি চল।' মগর নারান কাহাঁ?

কাতু বউ দুটোকে ধাক্কা দিয়ে তুলে বলল, 'চল তাড়াতাড়ি, সায়েব এয়েছেল। বলিহারি ঘুম বাপু তোদের। ছিনাথ কেঠুরে তোদের ঘুম ভাঙ্গাত কি করে?

এ সেই শ্রীনাথের পলাতকা জোড়া বউ, চোখ বড় বড় করে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গার চমকানি নিয়ে উঠে বসল! শ্রীনাথের ঔরসে হাজার চেষ্টাতেও সন্তান পেটে ধরতে পারেনি ওরা। আর আজ একটা একটা নয়, দুটো বউয়েরই পেটে সন্তান এসেছে। নিজেদের নারীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ ঘুচেছে, তা ছাড়া, তারা আজ স্বাধীন ভাবে রোজগার

করে পেট চালায়। কিন্তু যত দিন ঘনিয়ে আসছে তত ওদের দুশ্চিন্তা বাড়ছে!

সেই সঙ্গে কাতুরও দুশ্চিন্তা। তা হলে পূর্বের কথা একটু বলে নিতে হয়।

নারান কাতুকে নিয়ে প্রথম রিষড়ের চটকলে গিয়েছিল। কিন্তু রিষড়ে শুধু দূর নয়, চেনাশোনা লোকের মুখ পর্যন্ত একটা দেখতে পেত না সে। আর যে কাতু অধরার ছেলের বউ এবং দুর্দান্ত নারানের তাঁবে একেবারে ভয়ে কুঁকড়ে থাকত, একবার ঘরের বাইরে এসে সে অকস্মাৎ সমস্ত ভয় সঙ্কোচ কাটিয়ে সোজাসুজি নিজের ইচ্ছেয় চলতে লাগল। নারান তাকে মেরেছে, সে মার খেয়েছে। কিন্তু বেশি দিন সে মার সইল না। নারানের বিরুদ্ধে সে অপর পুরুষকে খেপিয়ে দিল। সেই দিন থেকে নারান বুঝেছিল, কাতু আর সে সেনপাড়ার সন্ত্রস্ত মদনের বউটি মাত্র নয়, তার হাতেও আজ অস্ত্র আছে। তখন নারানের একবার ইচ্ছে হয়েছিল বাড়ী ফিরে যাবার। কিন্তু যে মুহূর্তে সবকথা মনে পড়ে গেল, কাঞ্চন-লখাইয়ের কথা, মারামারির কথা এবং কাতুকে নিয়ে চলে আসার কুৎসিত অপবাদের কথা, তখন সে সে-বিষয়ে নিরস্ত হয়ে কাতুর প্রতি ব্যবহার পরিবর্তন করল। কিন্তু কাতু ঘা-খাওয়া মেয়ে। সে সহজে টললো না।

ইতিমধ্যে তেলেনীপাড়ার চটকল চালু হতে নারান কাতুর আশা ছেড়ে একলাই চলে এল এবং দু-একজন বেশ পরিচিত লোক যে পেল না তা নয়। কিন্তু তার যেন সমস্ত বুকটা খালি হয়ে গেছে, সমস্ত বোধশক্তি শেষ হয়ে গেছে মনের। এখানে এসে সে

অন্যান্য সমস্ত কিছু ভুলে কাজে মনোযোগ দিল খুব। ওয়ালিকের নজর পড়ল তার প্রতি। কেদার মিস্ত্রি তখন সর্বেসর্বা, আজও অবশ্য তাই। কেদারের সম্পর্কে লোকে বলে মরাকে বাঁচাতে পারে সে। অর্থাৎ এত ওস্তাদ মিস্ত্রি যে কাটাকে ভাঙ্গাকে জোড়া লাগাতে পারত সে। ওয়ালিক কেদারের সাকরেদ করে দিল নারানকে। নারানও তা মেনে নিয়ে কেদারকে দাদা বলে সম্মান দিল। কেদারও খুশি হল।

ওয়ালিক এ টমাসডম্ কোম্পানির একজন সত্যকার কর্মী। সে প্রতিমুহূর্তে ভাবত কি করে এ যন্ত্রবিদ্বেষী ও বিরোধী কালা মানুষগুলোর কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেবে। সে সবসময় এদের সঙ্গে মিশত, কথা বলত। দরকার হলে মদ খাওয়াত, পয়সা দিয়ে ফরাসডাঙ্গার মেয়েমানুষের ঘরে পাঠিয়ে দিত কিন্তু কাজের বেলা চেপে ধরে ঠিক! ফলে এ অলীক সায়েব আফিমের মত মিষ্টি ও মধুর ছিল সকলের কাছে।

নারানকে প্রায়ই থম্ ধরে বসে থাকতে দেখে সে বারবারই বলত, 'কি হয়েছে আমাকে বল!'

শেষটায় নারান তাকে বলেছিল কাতুর কথা। ওয়ালিক সাহেব সেই দিনই টাকা দিয়ে লোক পাঠিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে আনিয়েছিল কাতুকে রিষড়ে থেকে!

কিন্তু আশ্চর্য, নারানের কিছু পরিবর্তন হল না। কাতুকে নিয়েই রইল সে কিন্তু এত নিস্পৃহ ও নির্বিকার যে কাতু পর্যন্ত অবাক মানল। মনের বালাইহীনা কাতু তার চোখের সামনে পরপুরুষের সঙ্গ করে দেখেও কোন নালিশ জানাল না নারান। উপরন্তু ওয়ালিককে নিরাশ করে কাজের দিকে ঝোঁকও তার কসে এল। প্রায় সব সময়েই তাড়ি

মদে ডুবে থাকে। কোন কোন সময়ে দেখা যায় মত্ত অবস্থায় কামাতুর রক্তচক্ষু নিয়ে কাতুকে টেনে নেয়। একটু আদর সোহাগ করে পর-মুহূর্তেই ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পাগলের মত ঘুরতে থাকে এদিকে সেদিকে দিগ্‌বিদিক ভুলে।

পবন চাঁড়াল যেদিন এল তার বউ তারাকে নিয়ে সেদিন সে কিছুটা লুব্ধভাবে তাকিয়েছিল—যেন কতদিন সে মেয়েমানুষ দেখেনি। তারা একটু হেসে তাকে কাতুর কথা জিজ্ঞেস করতেই এক ধমকে পবন তাকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, 'কারুর কথা জানবার তোর দরকার নেই এখেনে। থাকবি, রাঁধবি, খাবি।

এ সময় বোধ করি তাদের তিনজনেরই সেই ফেলে আসা গ্রাম, তাদের বাল্যকাল, খেলাধুলো, গানবাজনা মনে পড়েছিল। তাই সেই ধমকে তারা কেঁদে ফেলেছিল, পবন ধমকে উঠেই নারানের দিকে ক্ষমাপ্রার্থনার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আর নারান নির্বাক হয়ে তাকিয়েছিল শূন্যে।

সেই থেকে নারান আর একদিনও যায়নি পবনের কাছে। পবনও আসেনি তার কাছে। বরং তারাকে দেখা গেছে দূর থেকে দেখে হাসতে নারানকে। নারানের কাছে সে হাসি অর্থহীন। সুখ দুঃখের অতীত ভাঙাচোরা মুখটা তুলে অর্থহীন চোখেই সে তারার দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

কি বিচিত্র আবহাওয়া এখানকার। এখানে সমাজ সংসার সব থেকেও যেন তার কোন বালাই নেই। মানুষ রাত পোহালে মাঠে যায়, সেখানেও তাদের সুখদুঃখের কথা হয়, নানান চর্চা হয়। এখানকার কারখানাতেও তা হয়। কিন্তু তার রূপ যেন ভিন্ন।

কথা হাসি গান সবই যেন পাট পিষ্ট করার মত বিরাট লৌহচাকাটার মত কঠিন, পেঁজা পাটের মত শ্বাসরোধী নরম, স্টিম এঞ্জিনটার বিচিত্র বহু অংশ ও গায়ের বিদ্‌ঘুটে তেলের গন্ধের মত। ওই এঞ্জিনটার জন্যই মানুষের বেঁচে থাকার দরকার। ওই সিলিণ্ডার আর পিস্টনের নিছক ওজন, মাপা ও মসৃণ, অবিরত গড়ানো লৌহজীবন।

মাঠের ও যন্ত্রের সমাজের ফারাক আছে। যন্ত্রকে তার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তুষ্ট করলেই দায়িত্ব শেষ, তারপরে তুমি যা খুশি তাই করতে পার। কোন বাধা নেই। বারোমাসের তেরো পার্বণ বা প্রকৃতির সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ নেই। নাই বা থাকল তোমার কোন সমাজ-সংসার, না থাক্ প্রীতি-ভালবাসা-স্নেহ। কিছু আসে যায় না।

যন্ত্রকে চালাতে যন্ত্র-হিসাবেই তোমার দাম। তুমিও যন্ত্র। একথা মানতে মানুষ পারে না। সে ছুটতে চায় তার জীবনের দিগ্‌বিদিকে। কিন্তু কি অদ্ভুত ভাবে সে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে যন্ত্রের সঙ্গে। সে প্রতিমুহূর্তে অবরোধের প্রাচীর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে সামনে।

অলীক সায়েব বলে, 'যব্ তুম্ মেশিন মে হাত লাগায়েগা, সমঝো তুম্‌ভি মেশিন।'

পবন মাথা মুড়িয়ে এসে দেখল সেই মাথাই আবার মুড়িয়ে দিতে চাইছে যন্ত্রের অনুশাসন। থির পাড়ার মাটি ও রসে গড়া জীবনের স্বাভাবিকতা একটা বেয়াদপি মাত্র যন্ত্রের কাছে। অতএব সাবধান! একটি সূক্ষ্ম প্যাঁচ-কাটা বলটুর মত নিজেকে স্বস্থানে লাগিয়ে রাখ। বিচ্যুত হলে অদরকারী মালের স্তূপে ফেলে দেওয়া হবে।

কিন্তু না, যন্ত্র ততখানি শিকড় এখনও গাড়তে পারেনি এ দেশের

মাটিতে। হাড্ডিসার প্রেতিনী তখন সবেমাত্র কাঁচা পয়সার ওড়না ঢেকে মিছে ভাবনাহীন জীবনের ডাক দিয়েছে। তবু একবার তার বক্ষলগ্ন হলে মুক্তি নেই।

পবন কিছু দিন কেবলি ভাবল ফিরে যাবে। কিন্তু কোথায়? ভাবতে ভাবতেই এক একটি সপ্তাহ অতিক্রম করে গেল। পেটে দানা পড়তে লাগল। আবার ভাবল, কিন্তু কোথায়? কি আছে? আবার সপ্তাহের বেতনে ঘাড়ে করে চাল নিয়ে এল। একটু মাংসও বা। কিংবা ফরাসডাঙ্গার রকমারি মদের দোকানে কয়েক পাত্র উজাড় করে দিল। লখাইয়ের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে আন্নাচুন্নুরীর কথা, আর্দালি বন্ধুর কথা। না, সে যেন কতদিনের কথা, আর অনুরাগ ও বিরাগ এক সঙ্গেই কাতর করে তোলে তাকে। ... অসহ্য জ্বালায়, এক বিচিত্র কটু তিক্ততায় তার জন্মো পিরিতের বউ, সবগিয়েও যা এবং যে রয়েছে সেই তারাকেও হঠাৎ মারধোর করে বসে। তারা কাঁদলে তার আরও খারাপ লাগে। যখন সোহাগে আদরে সে হাসে তখন পবন বলে, 'তারি, চল্ কোথাও চলে যাই।'

সে কথায় তারা আরও ভয় পায়। পবন তার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। ভরসা করে সে আর প্রাণ খুলতে পারে না তার কাছে। কিন্তু তার বলিষ্ঠ শরীরের মধ্যে উদ্বেলিত চাঁড়াল-রক্ত প্রবাহিত। মারের পর পবনের সোহাগ তার কাছে অসহ্য অপমানকর হয়ে উঠল। সে পবনের মুখের উপর বলে দিল, অমন পিরিতে তার দরকার নেই। ... কি এত বড় কথা? সাঁড়াসীর মত দুটো হাত দিয়ে গলা টিপতে গিয়েও পবন হঠাৎ থেমে গেল। অবাক বিস্ময়ে নিজের হাত দুটো দেখে দু হাতে তারাকে বুকের কাছে টেনে এনে বলল, 'আমাকে তুই

ঘেন্না করিস, না রে তারি?' তারপর একটু থেমে বলল, দাঁড়া কোন রকমে করে-কম্মে কিছু টাকা জমিয়ে গাঁয়ে চলে যাব আবার। ভিটে ছাড়বি, অ্যাঁ? ··· ফিরে যাব, তখন দেখিস—

পবনের বুকে মুখ রেখে প্রাণভরে তারা কাঁদল।—'হ্যাঁ চল ফিরে যাই। ধান ভেনে শাকপাতা কুড়িয়ে খাব। পরের জমিতেই না হয় তুমি খাটবে।'

নারান কিন্তু দেখল অন্য জিনিস। সে দেখল কুরুসেন সায়েব অর্থাৎ ক্রুকসান ফাঁক পেলেই তারার কাছে গিয়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে। নিষ্কর্মার ধারি এ কুরুসেন নাকি এ কোম্পানির মালিকের ভাগিনেয়। লোকে বলে, কোম্পানির ভাগনে। লোকটার বউ নেই এখানে, আছে নাকি তাও কেউ জানে না। সুন্দরী-অসুন্দরী পর্যন্ত বাছে না এক এক সময় এমন, ভাবে কামিনদের পেছনে কুরুসেন লেগে থাকে। তার এ দুষ্কার্যের সহায় এখানে কাতু।

লোকটা ফিটফাট সেজে মুখে একটা পাইপ লাগিয়ে একটা ছড়ি হাতে ঘুরে বেরায়। মেয়েমানুষ দেখলেই ইসারা-ইঙ্গিত করে। কারখানার মধ্যে মেয়েরা যেখানে কাজ করে, সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে চেষ্টা করে কুৎসিত আলাপ জমাবার। সুযোগ পেলে ছড়ি দিয়ে কারুর শাড়ী তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে, হাত দিয়ে গায়ে থাবলা দিলে আপরিসীম আনন্দে হো হো করে হেসে ওঠে।

এজন্য যে তাকে কোন বাধা পেতে হয় না, তা নয়। অনেক সময়েই অপমান সইতে হয়। কোন এক মেয়ে তাকে মেরেছিল পর্যন্ত। কিন্তু তার অপমান জ্ঞান যেমন নেই, তেমনি আছে জানোয়ারের মত ক্রোধ।

ছিনাথের বউ দুটো যখন এল কাতুই তাদের আশ্রয় দিয়ে নিজের ঘরে তুলল। কুরুসন খুব খুঁশি। কিন্তু নারান সাক্ষাৎ যমদূতের মত দাঁড়াল তার সামনে। ভীতু কুরুসেন গতিক দেখে সরে দাঁড়াল। কিন্তু নারান নিজেই তার মনের ভাব বোঝে না। উৎফুল্ল হয়ে দুদিন সে বউ দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করল! তার পরে আবার যেমন তেমনি।

বউ দুটো পড়ল কুরুসেনের পাল্লায়। কাতু বলেছিল বউ দুটোকে পেট পুরিয়ে ফেলতে, কিন্তু বউ দুটো ঘর ছেড়ে শুধু মুখরা নয়, উদ্দাম হয়ে উঠেছে। বলেছিল, 'মরে গেলেও পেট পোড়াব না, সে তোমার পেটে সাপই আসুক আর বাঘই আসুক!'

জীবনভর আকাঙ্খার চরম পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হল। পেটে তাদের সন্তান এল। কিন্তু কুরুসেন হল তাদের কাল। সে সবসময় চেষ্টা করছে কি করে এ গর্ভবতী বউ দুটোকে সরিয়ে দেওয়া যায়। ফলে এখন বউ দুটো সবসময়েই লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়।

নারান একবার ভাবল কুরুসেন সম্পর্কে সে পবনকে সাবধান করে দেয়। আবার ভাবল, তারাকেই সে বুঝিয়ে দেবে।

কিন্তু তা সে পারল না। ভাবল, তারা কি কুরুসেনের মন বোঝে না? সে কি বলে সায়েবের সামনে দাঁড়ায়। আর পবন হয় তো তাকে বিশ্বাসই করবে না। থাক্, মানুষ তার পথ নিজেই করে। নারানকে তার জন্য কিছু করতে হবে না।

রবার্টসনের ডাকে শেষ পর্যন্ত নারানকে খুঁজে পাওয়া গেল অন্য একজনের ঘরে। সে চোখ মুছতে মুছতে স্টীম ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

লোকজন আবার সব সামনের মাঠে এসে ভিড় করেছে। কুরুসেন-

তার ছড়ি নিয়ে ঘোরাফেরা করছে মেয়েদের আশেপাশেই। কয়েকবার চেষ্টা করেছে শ্রীনাথের বউ দুটোর পেটে ছড়ি দিয়ে খোঁচা দেওয়ার। বউ দুটোও সেয়ানা। তারা পুরুষের ভিড়ের মাঝখানে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল ওয়ালিকের এক্কা ছুটে আসছে চাবুকের সপাং সপাং শব্দে ধুলো উড়িয়ে।

ওয়ালিকের পাশে বসে আছে কেদার।

লোকজন সব হৈ হৈ করে কারখানার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ওয়ালিক আর কেদার এসে দেখল নারান স্টীম দিয়ে মেশিন প্রায় তাতিয়ে ফেলেছে। টাইট দিচ্ছে সিলিণ্ডার।

কেদার বলল, 'বাঃ সাকৃরেদ, চালাও। বেরথা কেন ডেকে নে এলে সায়েব। শুয়োরের বাচ্ছার নড়িটা ধরে আমি ছিঁড়তুম ওখেনে।

ওয়ালিক নারানের পিঠ চাপড়ে, কেদারকে নিয়ে পড়ল। সে পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'টুমার ছেলে শুয়ার কি বাচ্ছা হোবে কেন, টবে শুয়র টুমি হলে কিনা?' তারপর হেসে বলল, 'হামাকে বোলো টুমার ছেলে কেনো এটো ডিগতারি কোরে, কামে কেনো আইসে না।'

কেদার বলল, 'সায়েব, সে হারামজাদা এখন মেয়েমানুষ চিনেছে, ওকে বে দিতে হবে।'

'হাঁ, জরুর ডিটে হোবে। সাডি কেন দিচ্ছে না টুমি?'

কেদার চুপ করে রইল।

ওয়ালিক বলল, 'টাকা চাই? কেট্‌না বোলো, বলো কিডার। শও টাকা?'

কেদার হতভম্ব হয়ে সায়েবের দিকে তাকিয়ে রইল।

ওয়ালিক তার পিঠে চাপড় দিয়ে বলল, 'দেড়শো টাকা ডিবে হামি, ছেলের সাডি ডেও টুমি, হাঁ উন্‌কো টুমার কাম শিখাও, অওর দু-চারটো ছোক্‌রাকে কাম বুঝাও।'

কেদার আবেগে ওয়ালিকের হাত ধরে বলল, 'ভগমান তোমাকে রাজা করবে সায়েব। একটা ঘর তুলতে পারলে আমার ছেলের বে আটকাবে না।'

হঠাৎ ভীম গর্জনে একটা শব্দ করে মেশিন চলতে আরম্ভ করল। ওয়ালিক ও কেদার বিস্মিত আনন্দে নারানকে জড়িয়ে ধরল।

নারান এই প্রথম নিজের হাতে মেশিন চালাল।

ওয়ালিক বলল কেদারকে, 'টুমার সাকরেড্ আছে।'

কিন্তু নারান কপাল থেকে ঘাম ঝেরে ফেলে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

কেদার বলল, 'চললি যে?'

নারান বলল, 'ভাল লাগে না। গাঁয়ের চটকল হলে সেখেনে কাজ করব। এখেনে আর থাকব না।'

ওয়ালিক বলল, 'কেনো কি তখলিফ্ আছে হামাকে বোলো।'

নারান একবার সাহেবের দিকে তাকিয়ে, মাথা নেড়ে চলে গেল। ওয়ালিক আর কেদার পরস্পরের দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল।

নারান বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল অধরার ছেলে মদন মাঠের উপর দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকাচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়েই মদন কাছে ছুটে এল।

নারান বলল, 'কি রে মদ্‌না?'

মদন নারানের হাত দুটো ধরে বলল, 'নারান, ভাই, কাতু কোথা ? আমি সব ছেড়ে ছুড়ে চলে এসেছি। আমি এখেনেই থাকব, কাতুর কাছে। আর সেখেনে যাব না।'

নারান তার কাছে তাদের বাড়ী ও গ্রামের সব কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে তারপরে বলল, 'কাতুর কাছে থাকবি ?'

মদন বলল, 'হ্যাঁ। মা আমাকে আর এট্টা বে দিইচে। সে বউকে আমার ভাল্ লাগে না।'

'এ বউকে ভাল্ লাগবে ?' বলে বিচিত্র হেসে নারান তাকে কারখানার দরজাটা দেখিয়ে দিয়ে কাতুর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

এমন সময় রবার্টসন্ বাইরে এসে মদনকে দেখে বলল, 'কেয়া, কাম মাংটা ?'

মদন বলল, 'না, কাতু কোথায় সায়েব, কাতুমনি ?'

'কাতুমনি ? অণ্ডর দেখো।' বলে রবার্টসন্ কুঠির দিকে চলে গেল।

মদন এক পা এক পা করে ভিতরে গিয়ে মেশিন চলা দেখে হা করে দাঁড়িয়ে রইল। কতক্ষণ এমন দাঁড়িয়ে থাকত বলা যায় না। হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে তার সম্বিত ফিরল। দেখল কাতু দাঁড়িয়ে তার সামনে।

কাতু বলল, 'মরণ! এখানে কি করতে এসেছ ?'

মদন আবেগে আনন্দে বলে উঠল, 'তোর কাছে। আমি তোর কাছে থাকব। মাকে ছেড়ে এসেছি আমি।'

'কেন, আর একটা বউ রয়েছে যে ?'

'থাকুক, সে আমার কেউ নয়।'

আশ্চর্যরকম গম্ভীর হয়ে কাতু বলল, 'মিন্‌সে জান না, আমি খারাপ মেয়েমানুষ ?'

মদন বলল, 'সে তো মায়ের দোষে।'

'সেদিন বোঝনি সে কথা?'

করুন মুখে মদন বলল, 'মাকে তো তুই চিনিস্।'

কাতু বলল, 'কিন্তু আজ আর মায়ের দোষে নয়, আমি খারাপ হয়ে গেছি একেবারে।'

উদ্বেগে আবেগে অস্থির গলায় মদন বলল, 'খারাপ হলেও মদন তো তোর পর নয় কাতু। তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।'

কাতু বাবুলোকের প্রেম-পীরিতের কথা শুনেছে কিন্তু তার রীতি দেখে ওই বস্তুটি তার কাছে ঘৃণিত ও ক্লেদাক্তই মনে হয়েছে। কিন্তু মদনের এ পিরিত যেন সৃষ্টিছাড়া। এও কি তবে পিরিত! চোখ ফেটে জল আসতে চাইল তার। ভাবল, এ মুখপুড়ির জন্য ও আবার কোন মানুষের প্রাণ পোড়ে? বলল, 'তোমার পান চাইলে কেন থাকবে না? তুমি রাখতে পারনি আমাকে এবার আমিই তোমাকে রাখব।'

২৫

একদিন বিকাল বেলা। তখনো কারখানায় কাজ চলছে।

কুরুসেন এদিক ওদিক দেখে পবনের ঘরে ঢুকে পড়ল।

তারা তখন বিনুনি বেঁধে খোঁপা আঁটছিল। কুরুসেনকে দেখেই লাফ দিয়ে উঠে ঘোমটা টেনে সরে দাঁড়াল।

কুরুসেন হেসে বলল, 'ভাগ্ যাটা কেঁও, আঁই? কাম্ অন্। ফুর্তি কর, টাকা ডিবো।

তারা মুখ ঝমটা দিয়ে উঠল, 'আ ম'লো যা, বাঁদরটা আস্কারা পেয়ে মাথায় উঠতে আসছ।'

তারার মুখ চোখ এমন কিছু ভাল নয় কিন্তু দেহ সৌষ্ঠবের মহিমায় সে অপরূপ। আলতা পায়ে চুল বাঁধতে বাঁধতে উঠে কোনরকমে বুকে কাপড় চাপা দিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। ঘোমটা কপাল অবধি এসে পৌঁছেছে। কিন্তু তার নগ্ন হাত ও কাঁধের দিকে কামাতুর লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কুরুসেন দু'পা এগিয়ে এসে বলল, 'বাঁদর নহি, দেখো, সায়েব আছে, কিস্‌কা ঘর টুমার, পবন কো? উটো কম সে আছে। কাম অন্, ডর লাগে টো হামার কোটি চল।'

তারা দু-পা পিছিয়ে বাঘিনীর মত তাকিয়ে বলল, 'চ্যাম্‌না, দুদিন কথা বলেছি তাই তোর এত। আমার সোয়ামী শুধু জাতে চাঁড়াল নয়, মনেও। যদি বলে দিই, তোর কাঁচা মাংস খাবে সে।'

কামোন্মত্ত কুরুসেন ছড়ি দিয়ে তারার স্তনে হঠাৎ খোঁচা দিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।—'পহেলে টুমার কাঁচা মাংস আমি খাবে।'

খোঁচা খেয়ে ক্ষিপ্ত ভল্লুকের মত তারা গর্জন করে উঠল, 'মা বোন-খেগো চ্যামনা, সোরের বাচ্চা!...'

এদিকে কুরুসেনকে নারান আজ ঢুকতে দেখেই পবনকে খবর দিয়ে দিয়েছিল।

পবন যখন এল তখন কুরুসেন তারাকে চিৎ করে ফেলে, কাপড়টা খুলে ফেলার চেষ্টা করছে। পবন একমুহূর্ত ভাববার অবসর পেল না। গলা দিয়ে একটা শব্দ পর্যন্ত বেরুল না। লাফ দিয়ে পড়ে সে সমুদ্রের কাঁকড়ার দাঁড়ার মত দুই হাতে কুরুসেনের গলা টিপে ধরল।

মুহূর্তে নীল হয়ে কুরুসেন আঁ করে উঠল।

তারা উঠে পড়ে কুরুসেনের মুখ দেখে আতঙ্কে ডুকরে উঠল, 'মরে যাবে যে ?'

সেকথা কানে যেতেই পবনের হাত শিথিল হয়ে এল। কুরুসেন মুক্তি পেয়ে মাটি ঘস্‌টাতে ঘস্‌টাতে প্রাণভয়ে পবনের দিকে তাকিয়ে, দরজার দিকে সরে যেতে লাগল।

কিন্তু পবন নির্বাক নিশ্চল। সেই রক্তচোখে ভাবলেশহীন দৃষ্টি নিয়ে তারার দিকে তাকিয়ে রইল।

সে-চোখের দিকে তাকিয়ে প্রথমে তারার বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠল, তারপরে প্রাণ শিউরে উঠল তার। একি চোখ পবনের! মনে হল যেন, খুন করতে চায় পবন, রক্ত চায় খেতে। সে হঠাৎ বলে উঠল, আমার কোন দোষ নেই, বিশ্বাস কর।······

কুরুসেন ততক্ষণে কোনরকমে একবার বাইরে গিয়ে কুঠিতে পালিয়েছে।

তারার কথা শুনে পবনের সেই বিচিত্র ভাবের চোখ আরও বড় হয়ে উঠল!

তারা আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে আবার বলে উঠল, 'আমার কোন দোষ নেই, কোন দোষ নেই।' বলতে বলতে হঠাৎ এক লাফে দরজার কাছ গিয়ে পূব দিকে ছুটতে আরম্ভ করল সে।

পবন একমুহূর্ত থমকে থেকে বাইরে এল। দেখল নারান দাঁড়িয়ে আছে।

নারান বলল, 'যাও, ফিরে নে এসো। ভয় খেয়েছে।'

'অ্যাঁ, ভয়? কেন?'—পবন যেন হঠাৎ চমকে উঠে ছুট দিল পূব দিকে। চীৎকার করে উঠল, 'তারা, তারি ফিরে আয়, ফিরে আয়।···'

কিন্তু সে যত ছোটে, তারাও ছোটে তত। ছুটতে ছুটতে গঙ্গার ধারে নেমে গেল সে। পবনও নামল। চীৎকার করে ডাকল, 'তারি··· তারি ফিরে আয়; তোর কোন দোষ নাই। ফিরে আয়।···

কিন্তু তারা তা শুনতে পেল না। ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণভয়ে সে ছুটে চলেছে।

অন্ধকার নেমে আসছে। অমাবস্যার দিন। জোয়ারের ভরা টাবুটুবু গঙ্গা।

হঠাৎ কিসের গোঁ গোঁ শব্দে পবন থমকে দাঁড়াল। কিসের শব্দ? বান! বান আসছে অমাবস্যার গঙ্গাকে প্লাবিত করে।

তারা একবার তাকিয়ে দেখল পেছনে। পবন অনেকখানি কাছে এসে পড়েছে। সেও তার শেষ শক্তিতে ছুটল। গলায় জোর নেই, তবু বিড়বিড় করছে, 'আমার কোন দোষ নেই···কোন দোষ নেই।···'

বলতে বলতে সে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তে জোয়ারের তীব্র স্রোত তাকে কুটোগাছার মত নিয়ে গেছে।

দূরে টেনে নিয়ে গেল।

অদূরেই মস্ত উঁচু ফেনা তুলে বানের জলরাশি ছুটে আসছে গোঁ গোঁ করতে করতে।

পবন আর্তনাদ করে উঠল। যেখানে তারা লাফ দিয়ে পড়েছে, সেখানেই লাফ দিয়ে জলে পড়ল সে। ডাকল, 'তারি···তারি ···'

মুহূর্তে বান এসে ঝাপটা দিয়ে ডুবিয়ে দিল তাকে।

দূরে দুখানি কাঁচের চুড়ি পরা হাত যেন ঠেকাতে চাইল বানকে। কিন্তু চকিতে সে বাধা আত্মসাৎ করে বান ছুটে গেল হা হা করে।

অসম ক্লেশে ও শক্তিতে পবন মাথা তুলল আবার। জোয়ার

তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। তবু সে ডাকল, 'তারি···তারি আমার জম্মো-পীরিতের বউরে ···'

কিন্তু কোথায় তারা! অসংখ্য তরঙ্গরাশি বন্যায় ফুলে উঠে মাথা তুলে নাচছে। জোয়ারের তীব্র স্রোত তাকে টেনে নিয়ে চলেছে দূরে হু হু করে।

২৬

কাঞ্চনের বাপের বাড়ী থেকে আসার দিন সন্ধ্যায় যখন লখাই ফিরল, সে দুরন্ত ক্রোধে ছেলেকে কোলে নিয়ে আড়াল করে রাখল নিজেকে।

তাদের আসার কথা শুনে লখাইয়ের প্রাণটা আকুল হয়ে উঠল। কাঞ্চীবউ এসেছে! এসেছে তার ছেলে। ছেলের কথা মনে হতেই অস্থির হয়ে সে ঘরের মধ্যে ঢুকল। কিন্তু কাঞ্চন তার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তখন সে কালীকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েচে বৌঠান?'

কালী মুখ ভার করে বলল, 'জানিনে।'

কাঞ্চন ঘরে থেকে ছুটে যাওয়ায় দোলানি পেয়ে দামাল শিশু ভেবেছে তাকে নিয়ে খেলা হচ্ছে। সে তার কচি গলায় একটা বিচিত্র শব্দ করে হেসে উঠল।

সে শব্দে লখাইয়ের বুকটা যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে উতলা হয়ে উঠল, সে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেল কাঞ্চনের সন্ধানে।

কাঞ্চন ঢেঁকি ঘরের পাশ দিয়ে গোয়ালের পেছন দিয়ে বাগানে ঢুকে পড়ল।

কাঞ্চী সবই দেখছিল ঘরের দরজা থেকে। সে বলে উঠল, 'ওলো মুখপুড়ি, ছেলে নে তুই যাচ্ছিস কোথায় এ সন্ঝে বেলাতে?

কথাটা কানে যেতেই জামরুল তলায় কাঞ্চন থম্‌কে দাঁড়াল। একবার উপর নীচ দেখে ছেলের বুকে থুথু ছিটিয়ে ফিরে দাঁড়াল ছেলেকে কাপড়ের আড়াল করে।

লখাই এসে ধরে ফেলল তার আঁচল। 'ডাকাল, 'কাঞ্চীবউ!'

কাঞ্চন এক হ্যাঁচকায় কাপড় টেনে নিয়ে চলে যেতে যেতে বলল, 'লাজ নেই তোমার মিন্‌সে! ও মুখ পচে যাবে কাঞ্চীর নাম নিলে। পচে যাবে।'

ছেলেটা মাঝে মাঝে উল্লাসে নানান্‌ শব্দ করে উঠছে। লখাইয়ের প্রাণ আরও ব্যাকুল হয়ে উঠল। গোয়ালের পেছনে এসে কাঞ্চনকে সাপটে ধরল সে ছেলেশুদ্ধ দুহাতে। বলল, 'কি হয়েছে তোর কাঞ্চী বউ? ছেলেটাকেও দিবিনে একটু আমার কাছে?'

কাঞ্চন লখাইকে ধমক দিয়ে ফুঁসে উঠল, 'মরেছে তোমার কাঞ্চী, ও নাম তুমি নিও না। কি বলেছেলে সেদিন মিথ্যুক বেহায়া মিনসে? আমার য্যাত অ্যানকথা—না? ও মুখ পচে যাবে, পচে যাবে।' বলে সে লখায়ের মুখের দিকে একবারও না দেখে জোর করতে লাগল ছাড়াবার। হাসিয়ে উঠল, 'ছাড়, আমার ছেলের লাগবে।'

'ছেলে কি আমার লয়, কাঞ্চীবউ?'

'কেন, সরি বোষ্টমি দিতে পারেনি ছেলে একটা?··· তাই, তাই

আমার মন সারাদিন ওই কথা গেয়েছে। পুরুষের ধন্দলাগা, সে কি আমি জানি নে?'

কাঞ্চনের মুখটা দুহাতে ধরে বলল লখাই, 'পাণ মানেনি আমার। তুই থাকলে এমন হত না।'

'অমন পাণ তোমার'—বলতে গিয়ে থমকে গেল কাঞ্চন। লখাইয়ের মুখের দিকে তার চোখ পড়ল। মুহূর্তে নিভে গেল তার চোখের আগুন। একি মুখ হয়েছে লখাইয়ের! সন্ধ্যার আবছায়াতেও স্পষ্ট দেখতে পেল সে, লখাইয়ের গাল ঝরে গেছে। চোখের কোল বসা। চুলগুলো উস্‌কোখুস্‌কো। কপালের সামনে কয়েকগাছা চুলে পাক ধরেছে। ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে লালায়িত চোখে। এ চোখ দেখে মেয়েমানুষে কি পারে পাণ ধরে চুপ করে থাকতে? সে ছেলেকে লখাইয়ের কোলের উপর তুলে দিয়ে বলল, 'সে রাক্কুসী কি পীরিত করে এমন হালুই করেছে তোমার?'

সে কথার কোন জবাব দিতে পারল না লখাই শিশুকে বুকে পেয়ে। আলোর সামনে এনে লখাই রাজ্যের বিস্ময় ও আনন্দ নিয়ে সেই শিশুকে দেখতে লাগল। তার চোখ মুখ, তার পা নাড়া, হাত খাওয়া। আর শিশুর বিচিত্র গলার স্বরে নিজেও সে হেঁড়ে গলায় কাকলি গাইতে সুরু করল।

কালী হাসতে হাসতে দাওয়ায় গিয়ে শ্যামের গায়ে ঠেলা দিয়ে লখাইকে ইসারায় দেখিয়ে দিল। মধু তখনো বাড়ী ফেরেনি।

কেবল কাঞ্চনেরই হাসি কান্নায় মুখ অদ্ভুত হয়ে উঠল।

এমনি দেখতে দেখতে লখাই কেমন যেন গম্ভীর এবং উদাস হয়ে উঠল। কোলে তার নিজের ঔরসজাত ছমাসের ছেলে খেলা করতে

লাগল হাত পা ছুঁড়ে। তার মন ফিরে গেল বাইশ বছর আগের সেই দিনগুলিতে। বিশেষ মরুভূমির সেই ধূসর প্রান্তর। পাকাচুলভরা মাথা এক বুড়ি, তার মা। আর সোনার টিকুলি দোলানো একখানি ঘোমটা ঢাকা মুখ কঙ্কনপরা হাতে কলসী বেষ্টন করে চলেছে পাতকুয়োর ধারে। কেমন ছিল সে মুখ? ভাবতে গিয়ে একবার কাঞ্চন, আর একবার সারদার মুখই বার বার ভেসে উঠল চোখের উপর। তারপর সেই যুদ্ধক্ষেত্র। কামান গোলা বন্দুক—। কবে ··· কোনদিনের ইতিহাস সে সব! সবই যেন ঝাপসা হয়ে গেছে। কেবল আগ্নেয়গিরির অগ্নিগর্ভ থেকে অনুক্ষণ একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী যেন পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে।—

হঠাৎ সে বলে উঠল, 'ওর নাম কী? ছেলের নাম রেখেছ?'

কালী বলল, 'তুমিই বল একটা নাম।'

'বলব? আমি বলি ওর নাম থাক্ হীরালাল।' মনে মনে বলল, যে হতভাগ্য বিদ্রোহী সিপাহী হীরালাল নবজন্মে লক্ষীন্দর হল, তার ছেলে সে নামেই পুরো জীবনটা বহন করুক।

কয়েকদিন পরে, রাত্রে লখাই একদিন সারদার কথাই কাঞ্চনকে বলছিল। কেন সে পারেনি তার প্রাণ চাপতে। সে শুধু ধন্য নয়, কাঞ্চন বা সারদা কাউকে ছাড়াই পূর্ণ নয় লখাইয়ের জীবন। কাঞ্চন তার সুখ দুঃখের মিলিত সঙ্গিনী, সারদা শুধুই দুঃখের দিনের জন্য বসে থাকবে।

এমন সময় উঠোনে মানুষ মূর্তি দেখে চমকে উঠল তারা। লখাই তাড়াতাড়ি আলো নিয়ে এসে দেখল জলে ভেজা ক্লান্ত পবন।

পবনকে বসতে দিল সে। শুকনো কাপড় দিল পরতে। তারপর একটু সুস্থ হতে পবন তার সব কথা বলে বলল, 'লখাই, তারা ছাড়া আর কেউ ছেল না। তাও হতভাগী মিছে ভয়ে ডুবে ম'ল।'

লখাই ঘর থেকে একটা ধারালো কাটারি এনে পবনের হাতে দিয়ে বলল, 'তুই পবন যেভাবে খুসী মরিস, আমার আপত্য নেই, সে শোরের বাচ্চা ফিরিঙ্গিকে এক চোপে শেষ করে দে আয়।'

কাঞ্চন শঙ্কায় কেঁপে উঠে তার হাত ধরে বলল,' এসব কি বলছ?'

'ঠিকই বলছি।' তীব্র জ্বালায় ফুঁসে উঠল লখাই, 'এ রাতেই তুই এ কাটারি নে' যা। না পারিস্ কাল যাবি।'

পবন খানিকক্ষণ হতভম্বের মত লখাইয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তাতে কি লখাই, তারা ফিরে আসবে? আর সয়েবকেই বা কেমন করে......'

আচমকা হাত তুলে সজোরে এক থাপ্পর কষিয়ে দিল লখাই পবনের গালে। 'শালা পারবিনে তো, এখানে এসেছিস কেন? মাগের মান রাখতে পারিস্‌নি, গলায় দড়ি দিগে যা।'

সে রাত্রেই পবন গলায় দড়ি দিয়ে মরল আগুরিপাড়ার তেঁতুল গাছে।

২৭

পবনের আত্মহত্যা প্রায় দুরারোগ্য ব্যাধির মত লখাইয়ের মনে চেপে বসল। ঘোরা ফেরায়, আহারে নিদ্রায় প্রতি মুহূর্তেই তার চোখের সামনে পবন চোখের জল ভরা মুখে যেন মাথা নেড়ে নেড়ে

বলছে, 'ঠিক ঠিক ঠিক, তবে তাই হোক!' আগুরিপাড়ার দিকে সে ভুলেও যায় না। এমন কি যেদিন পবনের মৃতদেহ দেখতে সারা সেনপাড়া জগদ্দল ভেঙে পড়েছিল সেদিনও সে যায়নি।

কাঞ্চনকেও লখাইয়ের মতই দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় পেয়ে বসেছে পবনের আত্মহত্যাকে ঘিরে। তার প্রতিমুহূর্তের আতঙ্ক, যেকোন মুহূর্তে তার জীবনে এক সাংঘাতিক দুর্ঘটনা বয়ে নিয়ে আসবে অপদেবতা। কখনো একটু হাওয়া লাগলে চমকে ওঠে সে। পুকুরে ডোবায় গঙ্গায় নামতে গিয়ে যেন জলে কি দেখেছে এমনি অপলক তীক্ষ্ণ চোখে দেখে। পুত্র হীরালালকে আগলে আগলে রাখে সব সময়। লখাইয়ের থাপ্পর খেয়ে সে রাত্রে পবনের চলে যাওয়ার কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে একলা থাকতে আর পারে না সে। আর লখাইকে আড়ালে আবডালে পেলেই খালি বলে, 'তোমার জন্যেই, তোমার জন্যেই, তুমি পাতকী।'

তখন লখাই পুব কোণ বরাবর মাঠ ভেঙে সোজা আখড়ায় সারদার কাছে চলে যায়। সারদাও লখাইয়ের পথ চেয়েই বসে থাকে তার সব দুঃখ জ্বালা অশান্তির লাঘব করতে। তাকে আদরে আপ্যায়নে সোহাগে সেবায় ভরে তোলে। কিন্তু লখাইয়ের কোথাও তৃপ্তি নেই, শান্তি নেই। তার আজ গভীর সংশয়, সেও কাউকে তৃপ্ত করতে বা শান্তি দিতে পারেনি। জীবনটা এক নিরর্থক বস্তু মাত্র। যেন তার সমস্ত বেগও স্তব্ধ হয়ে আছে। সমস্ত জীবনটা এখন এসে ঠেকেছে তার মাত্র তিনজনের মধ্যে। হীরালাল কাঞ্চন আর সারদা। তাও সবসময়েই যেন মনে হয়, এ তিনজনও তার কাছে থেকেও দূরে রয়েছে। পুরো নাগাল কিছুতেই পাওয়া যায় না।

তা ছাড়া, কাঞ্চনের জীবনও এক বিচিত্র অবস্থায় এসে ঠেকেছে। তার চরিত্রগত যে বিশেষত্ব তাতে লখাইয়ের মনে সারদার স্থান মুখে মেনে নিলেও বুকের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী অভিমানে পুড়ে যাচ্ছে তার। লখাইয়ের সমস্ত বুকের একপাশ তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। হীরালালকে নিয়ে সে পোড়ানি শান্ত করতে চেয়েছে। কিন্তু এ পোড়ানির নিরন্তর দহন থামতে চায় না। বিদ্রোহের কথা মনে হয়েছে তার, কিন্তু কার বিরুদ্ধে? তার সারা বুক জুড়ে যে রয়েছে লখাই!

এ অবস্থাতেই পেটে সন্তান নিয়ে সে মারা গেল গঙ্গার ঘাটে নাইতে গিয়ে। আগুরিপাড়ার ঘাটে নেয়ে উঠে হঠাৎ পবনচাঁড়ালের ফাঁসঝোলানো সেই তেঁতুলগাছের দিকে নজর পড়তেই কেমন ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে উঠল তার হাত পা। কথা বলতে গিয়ে স্বর ফুটল না গলায়। দু'হাতে পেট চেপে ধরে পড়িমরি করে বাড়ীর দিকে ছুটল সে।

কিন্তু দাওয়ায় আর উঠতে পারল না। উঠতে গিয়ে হঠাৎ ধপাস করে মাটিতে মুখ দিয়ে পড়ল। রক্তের বন্যায় কাপড় উঠল ভিজে।

কালী ডুকরে চীৎকার করে উঠে তাকে সাপটে তুলে ধরল। কিন্তু কাঞ্চন কেঁপে কেঁপে উঠল, চোখ পাকিয়ে পাকিয়ে তাকাল আর বার বার বলতে লাগল, 'পবন···পবন···'

লখাই বাইরে ছিল। মধু তাকে খুঁজে নিয়ে এল যখন, তখন কাঞ্চন বোধ করি তার স্পর্শটুকুর জন্যই মরতে পারছিল না!

লখাই যেন একটা বাজপড়া মাথা-মুড়নো বৃহৎ বনস্পতির মত হীরালালকে বুকে নিয়ে কাঞ্চনের চিতা পোড়ানো দেখল।

শ্মশান থেকে যখন সবাই ফিরে চলেছে তখনও লখাইকে চলতে না দেখে কালী ডাকল, 'ঘরে চল।'

লখাই তাকিয়েছিল মাঝ গঙ্গার দিকে বড় বড় চোখে। বলল, 'ঘ্যাখো তো বৌঠান, মাঝগঙ্গায় ওটা কে?'

কালী অবাক হয়ে একমুহূর্ত গঙ্গার দিকে তাকিয়ে কিছু না দেখে শিউরে উঠে লখাইয়ের হাত টান দিয়ে বলল, 'কি আবার ছাই! চলে চল তাড়াতাড়ি।'

লখাই তেমনি গলায় বলল, 'পবন আর তার বউ যেন কাঞ্চীবউকে নে কোথা যাচ্ছে, ওরা হাসছে আমার দিকে দেখে।'

কালী এবার জোর করে টেনে নিয়ে গেল লখাইকে।

কিন্তু লখাই পথে যেতে ফিরে আগুরিপাড়ার ঘাটে তেঁতুলতলায় এসে দাঁড়াল। যে ডালটায় পবন ফাঁস লটকেছিল, সেদিকে তাকিয়ে সে ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল, 'যা দিয়েছিস্ তার বাড়া আর কিছুই নেই, কিন্তু আমার ঘেন্নায় তুই পাপঘাতী হবি, তা তো আমি জানতুম না ভাই!...'

২৮

তারপর দিন গেল, মাস গেল, বছর গেল।

গাড়ুলিয়ার চটকল চালু হয়ে গেছে। জগদ্দল আগুরিপাড়ার ঘাট বরাবর গাঁয়ের ভিতরে কালোদুলের আমবাগানের ধারে উঠেছে তেহতি কলের কারখানা। সদর্পে বয়লারের চিমনি দাঁড়িয়েছে মাথা উঁচু করে। প্রতিমুহূর্তে সোঁ সোঁ শব্দে যন্ত্র তার জয়গান ঘোষণা করছে।

কালোদুলে মরে গেছে। অধরা ছেলের বউ নিয়ে কাজ করে

তেহ্যত্তির কলে। সাহেবদের সে খুব প্রিয়। অনেক কাজের মেয়ে জুটিয়ে দিয়েছে সে কারখানায়। কেউ কেউ চলে গেছে হুগলীর পুল তৈরীর কাজে।···মা গঙ্গার উপর দিয়ে ইতিপূর্বেই হাওড়ায় তৈরী হয়ে গিয়েছিল পুল! অবিশ্বাসও কম ছিল না তবু, বিশেষ যারা সে পুল দেখেনি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যখন দেখা গেল তার উদ্যোগ আয়োজন, তখন স্থানীয় ছোট জাতের লোকেরা কুতূহলী দর্শকের মত দল বেঁধে হাজির হতে লাগল।

খবর ছড়াল পুলবাঁধার কাছখান থেকে নাকি প্রায়ই গঙ্গার জলে ভেসে ওঠে নরমুণ্ড, কাটা হাত পা। অর্থাৎ এও সেই হাওড়ার পুলেরই অভিজ্ঞতা যে, গঙ্গার তুষ্টিসাধনে শতমানুষ বলি দিতে হয়েছে পুলের জন্য। অতএব সাবধান।

তবু ও পেট বড় দায়। অনেকেই গেল কাজের জন্য।

গিয়েছিল নয়নও, কাঞ্চনের রূপপাগল সেই নেশামত্ত কিশোর ঢুলীশাবক।

সবাই যখন তাকে চলে আসার কারণ জিজ্ঞেস করল, সে বলল হাতের ঝটকা দিয়ে, 'ধুর শালা! কোম্পানি দিল ক্যাঁটালপাড়ার ভাঁটিখানাটা উঠিয়ে। কোন্ মরদ খাটবে সেখানে?'

সত্যিই তখন পুলে খাটা মজুরদের অতিরিক্ত মাতলামোর জন্য মুক্তাপুরের খালের ধারে নৈহাটির মদের ভাঁটিখানা তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু নয়নের মনের তল আরও গভীরে। সে সকলের কাছে ঘুরে ঘুরে কাঞ্চনের মৃত্যু সংবাদ সংগ্রহ করল এবং একদিন দেখা গেল কবিয়াল হয়ে বসেছে নয়ন।······ মানুষের মন এতই বিচিত্র বুঝি তাই! নইলে ক্ষণিকের মস্‌করাতে

যে কিশোর রূপবতী বাগ্দিনীর রূপ এঁকে রাখে বুকে, সেও এ পৃথিবীরই। আর দশটা ঢুলীর ঘরের ছেলের মতই মানুষ হয়েছে। কাঞ্চনের পদাঘাত নয়ন বুকে নিয়ে এমনি করেই তার শোধ দিল। লোকে অবাক্ মানল নয়নের কবিয়াল হওয়া দেখে আর নয়নের ভণিতারও হদিস পেল না কেউ। সে এখানে সেখানে ঘোরে, নানান্ জায়গার কথা বলে গানে গানে। সে বলে এই জগদ্দলের কথা, ফরাসডাঙ্গার কথা, চাঁপদানির কথা, বলে সেনেদের কথা। সকলেই তার গান শোনে। গানের শেষে ভণিতা করে: 'বলে জগদ্দলবাসী লয়ন কাঞ্চন।' কিংবা 'কহে ঢুলী কাঞ্চন লয়ন'। সাঁটে অথবা পদে মিল খুঁজতে গিয়ে অনেক সময় 'আমি যে গো কাঁচার লয়ন।'

লখাইয়ের সঙ্গেও তার ভারি ভাব। সে যে গায়,

'কত ছিল কত গেল বলে শেষ আর পাই না
ঢোলক ছেড়ে গায়েন হলেম, শাপশাপান্ত কর না,
বলিহারি দুনিয়াদারি বেক্ষার মাথায় দিল বাড়ি
মোর্লীদাসের আখড়া গেল রসাতল।
কালের বস্তু রইল না এ দিনও তো রবে না
সেথা—উঠেছে টমাসডমের চটকল।'

লখাই মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, 'কাঞ্চন লয়ন কি হে?'

একমুহূর্ত নির্বাক থেকে বিলম্বিত সুরে নয়ন জবাব দেয়:

'দেবীর অঙ্গ পরশ পেয়ে পাথর পেল প্রাণ—
(আমি) দেবীর পদাঘাতে গান বাঁধি
পেয়ে লতুন জ্ঞান।
আমি যে গো সেই দেবী কাঁচার লয়ান।'

বলে শ্রোতা ও গায়ক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। অনেকক্ষণ পর লখাই বলে, 'সোন্দর, এই সোন্দর।'...আবার এই সুন্দরের বক্তব্য নিয়ে গানের ডালি সাজিয়ে নয়ন চলে যায় নানান্ জায়গায়।

চক্রবর্তীদের বাড়ীর বাইরের দিকে বাগানের ধারে ভদ্রলোক যুবকরা বসে বসে নানান গল্প করেন। জীবনের গত স্বর্ণযুগ হারানো মধ্যবিত্তদের স্বপ্নকাহিনী সব। জামাই আন্দু চক্কোত্তি অর্থাৎ আনন্দ চক্রবর্তী এ আসরের শ্রেষ্ঠ এবং বিশিষ্ট। বটগাছের এ উঁচু ঢিবির নাম হয়ে যায় তাই আনন্দ-বেদী।

বিধ্বস্ত সেনপাড়া। সেই বিরাট পরিবারের একটা শাখা এখনও এখানে বিরাজ করছে। বড় চাকুরে তারা। অন্যান্য পরিবারগুলি অনেকেই ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ও শিক্ষিত ছিল। তারা অনেকেই কলকাতা এলাহাবাদে নানান্ সরকারি দপ্তরে কাজ নিয়ে বিদেশী হয়েছে।

হায়, এখনো দোল দুর্গোৎসবের আয়োজন হয়। নেই শুধু সেই দানখয়রাতি। কে একদিন সেনেদের শানের পাড় ঘাটে কিছু কাঁসার বাসন পেয়েছিল। লোকে বলে, ওখানে গেলেই নাকি জল থেকে ঝকঝকে কাঁসার বাসন আপনি ওঠে। পুরনো কিংবদন্তী সব নতুন কথায়, ঢঙে ও সুরে ছড়ায়। বংশের বর্তমান পুরুষেরা সেসব শুনে গরিমায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। বিস্মিত হন।

অতীত দিনের এক ভাঙ্গা পুরনো রাজপ্রাসাদের মত সারা সেনপাড়া জগদ্দল বোধহীন, ক্ষমতাহীন, নির্বাক, বিহ্বল। অতীত আছে, ভবিষ্যৎ নেই যেন। কি আছে কেউ জানে না।

মাঝে মাঝে শ্রীনাথ কাঠুরে কুড়ুল কাঁধে আসে। কাঠ কাটতে

কেউ ডাকলে যায়। আর মাঝে মাঝে লখাইকে বলে, 'একালে কি মেয়ে মানুষের পেটে বস্তরে ছেলে হয়? শালা দুটো মাগীই বিইয়েছে।'

মুসলমান পাড়ার গণি মিয়ার জমি যেদিন শরাফৎ খাস করে নিল, সেদিন বোঁচকাবুঁচকি বেঁধে তৈরী হয়েছিল চলে যাবার জন্য। ওপারের হুগলীতে ব্যারাক তৈরী হচ্ছিল, এই সেনবাবুদের এক কর্তা তার কন্ট্রাক্টার ছিলেন। সেখানে মজুর খাটতে যাবে বলে স্থির করে সব নিয়ে থুয়ে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে দেখেছিল, বাইরে শরাফৎ খাঁ দাঁড়িয়ে দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে। হাওয়া উঠেছিল তার উঠোনের কুরচি ফুলের গাছে, ঘরের বাতায়, মনে হয়েছিল ঘর কাঁদছে।...আবার সকলের হাত ধরে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে পড়েছিল সে। আল্লা তার যে গতি খুসী করুন, ভিটে সে ছাড়বে না।

প্রথমে তার রোগা ছেলেটা মরে গেল। তার পরে মরল সে। আশ্চর্য! শরাফৎ খাঁও সেইদিনই মরেছিল এবং গোরস্থানে উভয়কে একই দিনে সমাহিত করা হয়েছিল।

গণির সুন্দরী বিবি লতিফা আজ ধান ভানে, শাকপাতা কুড়োয় জলা জংলায়। কৈশোরের সীমায় এসেও তার ছেলে গোলাম ন্যাংটা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তেস্থতিকলের সাহেবদের কাছে যায় কাজের আশায়। সাহেবরা বলেছে, সে কাপড় পরে এলে কাজ দেবে। সে আম্মার ছেঁড়া কাপড় পরে যেতে সাহেবরা কাজ দিয়েছে তাকে।

...লতিফা কিছুই বলতে পারে না। কেবল সন্ধ্যা হলে রোজ সে একবার গোরস্থানে যায়, বাতি দেয় কিন্তু কাঁদতে পারে না। একটু দূরে একবার আড়চোখে যেন বোরখার আড়াল থেকে দেখছে এমনি

ভাবে শরাফৎ খাঁয়ের গোরটার দিকে দেখে, তারপর গণির কবরের দিকে তাকিয়ে বলে, 'গোলাম গোলামি করে গোরার কলে। আমি কিছু জানি না।'

আর ওই গোলামের সঙ্গে ভারি ভাব হয়েছে তিন বছরের ছেলে হীরালালের। গোলামের সঙ্গে আসলে মধুর বন্ধুত্ব। উভয়ে এক হুঁকোর দোস্ত। যদিও বয়সের ফারাক তাদের অনেকখানি।

মধু মাঝে মাঝে বলে বসে, 'কলকারখানার কাজ ভারি মজার, ভারি মগজের দরকার। আমার শিখতে বড় মন চায়।'

কিন্তু কালী বলে অন্য কথা। বলে, 'হারামজাদা, অধরা খেমটির ছেলের বউয়ের মুখ বড় মিঠে লেগেছে তোর, তাই কলে কারখানায় কাম ধরতে মন চায়—না?'

মধু মুখ ঝামটা দেয়, 'বাজে বকিস্‌নে।' তারপরে কথায় না পারলে শেষে বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ তাই যা।'

গোলামের হাতে তৈরী একখানি পেয়ারা কাঠের ছেলেমানুষি হাতুড়ি সব সময়েই হীরালালের হাতে দেখা যায়। লখাই বিস্মিত বিরক্ত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ছেলেটা সারাদিন হাতুড়িটা দিয়ে এটা ঠুকছে, ওটা ঠুকছে। জিজ্ঞেস করলে বলে, 'আমি খুব বড় মিস্তিলী হব।' অর্থাৎ মিস্তিরি হবে। লখাইয়ের মাথায় যেন আগুন জ্বলে ওঠে। তার রাগ গিয়ে পড়ে মধুর উপর। মধুই এসব মাথায় ঢোকায় ছেলেটার।

একদিন তো লখাই ক্ষেপেই গেল হীরালালের কথা শুনে। সে জিজ্ঞেস করল হাতুড়িটা দেখিয়ে, 'ওটা কি রে?'

হীরালাল চোখ বড় বড় করে বলল, 'হাম্বল।' অর্থাৎ হাম্বর।

লখাই এক ধমকে তাকে একেবারে কুঁকড়ে দিয়ে হাতুড়িটা ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে আবার থেমে গেল। বলল, 'শুয়োটা, হাতুড়ি বলতে পারিস্‌নে?' বলে হীরালালের পায়ের কাছে ফেলে দিল সেটা। হীরালালের কাছেও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে লখাই।

মুরলীদাস মরেছে। লখাইয়ের দুঃখ দিনের সই সারদা যৌবনের শেষ সীমায় দাঁড়িয়েছে এসে, আখ্‌ড়া আজ তারই সম্পত্তি। মাঝে মাঝে বলে, 'বৃন্দাবন যাওয়া যায় না—রেলে করে?' তারপর লখাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যদি যাও তো যাই।'···লখাই নীরব, কোন উত্তর নেই তার।

২৯

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় লখাই দাওয়ায় বসে রয়েছে যেন গুহাভ্যন্তরে এক পাথরের মানব রাত্রি আসার অভিশাপে স্তব্ধ ও শঙ্কিত।

তিন বছরের হীরালাল উলঙ্গ হয়ে একলা আপন মনে খেলা করছে উঠোনে।

শ্যাম আর মধু গেছে ফরাসডাঙ্গায় বীজধান আনতে। কালী কাজে ব্যস্ত।

এমন সময় একটা মূর্তি উঠোনে এসে থমকে দাঁড়াল হীরালালের কাছে। হীরালাল হঠাৎ লোকটার হাত ধরে বলে উঠল, 'জ্যাঠা?' পরমুহূর্তেই হাত ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। জ্যাঠা তো নয়।

লোকটা নির্বাক, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হীরালালের দিকে।

লখাইয়ের হঠাৎ নজরে পড়তেই সে বলল, 'কে গো ওখেনে ?'

মূর্তি নীরব, নিশ্চল।

'কে ? কথা বলে না কেন ?' বলে লখাই উঠে দাওয়া থেকে নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'নারান্ !' ··· উভয়ে তারা চোখে চোখ রেখে দাঁড়াল। এক বিচিত্র উত্তেজনায় উভয়েই সটান হয়ে উঠল। দুজনেরই বয়স হয়েছে, পাক ধরেছে চুলে।

হীরালাল একবার লখাই ও নারানের দিকে অবাক হয়ে তাকাতে লাগল। লখাইয়ের মনে গাইছে নারান হীরালালকে কিছু করবে হয় তো। হয় তো গলা টিপে ধরবে এখুনি হীরালালের।

নারান একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার দেখল লখাইয়ের দিকে, তারপর হীরালালের দিকে। স্থির অপলক চোখ, ভাঙাচোরা মুখটা যেন একটা মাটির ড্যালা।

লখাই ডাকল, 'নারান !'

'বল।'

'এস।'

'না।'

'তুমি কলে কাজ কর ?'

'করি।'

'সে কাজ কি ভাল ? সে তো গোলামি।'

'গোলাম নয় কে ? কলের গোলাম সবাই হবে।'

'কেন ?'

'সারা দেশে কল বসবে ইংরেজের।'

'আমি ম'লেও সেকাজ করব না।

'তবু তুমি ইংরেজের পেরজা।'

এবার স্তব্ধ হয়ে গেল লখাই।

নারান একটু চুপ থেকে হঠাৎ বলল, 'সুখে আছ খুব?'

'সুখ?' সুখ আছে কিনা সেকথা স্মরণ করতে লখাই তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল অপলক চোখে।

নারান হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'তা'হলে মরে গেছে?'

লখাই চমকে উঠল। 'কে?'

দেখল নিরুত্তর নারান তোবরা মুখে ঘোলাটে চোখে ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। লখাই ফিরে দেখল সেখানে কেউ নেই। বলল, 'কাঞ্চীবউয়ের কথা বলছ?'

নারান তেমনি অপলক কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চমকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একবার হীরালালকে দেখে বেরিয়ে গেল। বিশেষ কোন ভাবান্তর হল না তার মুখের।

লখাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ডাকল, 'নারান, যেও না, এস।'

দূরে একটা ঝোপের আড়াল থেকে ভেসে এল হাওয়ায়—'না, আর লয়!'

পরদিন সকালবেলা সুদীর্ঘ বড় সড়কটার একটা ভাঙা জায়গা পাঁয়ের সুবিধার জন্যই লখাই গঙ্গার ধার থেকে মাটির কেটে এনে ভরাট করছিল। হীরালাল তার সঙ্গে তার ছোট ছোট হাতে মাটি ঘেঁটে মনের খেয়ালে গড়ছিল সব পুতুলের কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি।

এমন সময় দক্ষিণ দিক থেকে ধূলো উড়িয়ে ঘরঘর্ করে ছুটে আসতে লাগল একটা এক্কা। লখাই সরে যাওয়ার জন্য উঠতেই দেখতে পেল এক্কার সওয়ারী দুটো গোরা সাহেব।

হঠাৎ চোখজোড়া জ্বলে উঠল লখাইয়ের, চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল। সে সরল না। যেমন বসে মাটি দিচ্ছিল, তেমন উত্তর মুখে ফরে বসে রইল।

হীরালাল বাপকে যেতে না দেখে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল গাড়ীটার দিকে।

ঘোড়ার দ্রুত খুরাঘাতের শব্দ ক্রমাগত এগিয়ে এল। এগিয়ে আসতে লাগল চাকার ঘরঘরানি। তারপর একটা তীব্র চীৎকার ভেসে এল, 'এও, হট্ যাও, হট্ যাও।'

কিন্তু লখাই কি এক অন্ধ রাগে ও গ্লানিতে শক্ত হয়ে বসে রইল। সমস্ত রক্ত তার মাথায় উঠে এসেছে। মুঠি পাকানো হাতে পিষে যাচ্ছে মাটি। কিন্তু প্রাণ পণ করেছে, উঠবে না এ সড়ক থেকে।

হীরালালও অদ্ভুত ভাবে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

তীব্রবেগে থামতে গিয়ে একবার হোঁচট খেয়ে ঘোড়াটা খানিকটা পিছলে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, একেবারে হীরালালের একহাত সামনে। চাকাজোড়া খানিকটা মোড় বেঁকে আর্তনাদ করে থেমে গেল। একাকার হয়ে গেল ধূলোয় জায়গাটা।

মাথার উপরে চাবুকের শিষ্ তুলে গোরা দুটো চেঁচাতে চেঁচাতে নেমে এল, 'এও ব্লাডি সোয়াইন।'

'ব্ল্যাক বাফেলো! ক্যায়া করতা হায় টুম?'

'কাম হোতা হায়।' বলে লখাই ফিরতেই সাহেব দুটো এব

বিচিত্র শব্দ করে চম্‌কে উঠল। এ সেই গাড়ুলিয়ার আখড়ার দুই গোরা, তেলেনীপাড়ার রবার্টসন্ ও ওয়ালিক। তারা দেখল, এ সেই মন্দিরের ক্রুদ্ধ ধর্মান্ধ।

ওয়ালিক বিস্মিত হয়ে বলে উঠল, 'টুমার নাম লখাই আছে? গাড়ুলিয়াতে টুমি হামাডের—

'হ্যাঁ।'

হীরালালকে দেখিয়ে বলল, 'টুমার লেড়কা?'

কোন জবাব না দিয়ে হীরালালকে কোলে তুলে নিল লখাই।

রবার্টসন কি সব বিড়বিড় করছিল লখাইয়ের দিকে তাকিয়ে। তাকে থামিয়ে ওয়ালিক খুব নরম গলায় বলল লখাইকে, 'টুমি হামাডের কাম করিবে?'

'না।'

'বহুট্ টাকা মিলবে।'

লখাই জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলল, 'আপ্না টাকা লেকে তুম বিলাত চলা যাও।'

কথা শুনে রবার্টসন হাঁ হয়ে গেল, গোল হয়ে উঠল তার চোখ।

ওয়ালিক মোলায়েম হেসে বলল, 'না না না, হামার টাকা সারা ডুনিয়ায় খাটবে।'

লখাইয়ের মনে পড়ল কাল্লুকের নারানের কথা—তুমিও ইংরেজের পেরজা।

নিরন্তর অসহ্য যন্ত্রণায় ও ক্রোধে শাবল আর মাটি বওয়া চুপ্‌ড়িটা নিয়ে সরে গেল সে।

উত্তর দিকের পথ আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করে বলল, 'যাও, চলা যাও।'

ওয়ালিক যেন মুগ্ধ হয়েছে লখাইয়ের সাহসে এবং এও সে বুঝেছে ইচ্ছাকৃতভাবেই গাড়ী থামিয়েছে লখাই। বলল, 'হমারা কাম করনেসে বহুট ইনাম মিলেঁগা!'

লখাই লেলিহান শিখার মত খাড়া হয়ে আবার থেমে গেল। বলল, 'আপনা রাস্তা দেখো।'

ওয়ালিকের মুখ লাল হয়ে উঠল। তবু হাসার চেষ্টা করে রবার্টসনকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে চাবুকের শব্দ করল। গাড়ী চলে গেল।

লখাই আস্তে আস্তে তার কাঁচা মাটি দিয়ে বোজানো জায়গাটা দেখল। ঘোড়ার পায়ের ও চাকার দাগ বসে গেছে। আবার সে শাবলটা দিয়ে জায়গাটা পিটিয়ে সে দাগ নিশ্চিহ্ন করে দিল। তারপর উঠে দাঁড়াতেই তার ঠোঁট দুটো বেঁকে উঠে চোখের কোণে বড় বড় ফোঁটায় জল জমে উঠল। সে জল পড়ল টপ্ টপ্ করে সড়কের উপর। তার চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠল। হীরালাল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বাপের দিকে।

পরদিন একটু বেলায় সারদা এসেছে লখাইকে নিয়ে যেতে আখ্ড়ায়। শেষ সেবা করে সে বিদায় চায়, বেরিয়ে পড়তে চায় বৃন্দাবনের পথে। জীবনের বাকী কটা দিন সে সেখানেই কাটাতে চায়।

এমন সময় ডুম্ ডুম্ করে ঢোলক বেজে উঠল বিশেষ ঢোল সহরৎ! সড়কের উপর ভিড় করল এসে বহু নরনারী। লখাইও এসে দাঁড়াল।

ঢুলীর সঙ্গে পরগণার জমিদারের এক গোমস্তা, হাতে একখানি

কাগজ। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'হালিসহর পরগণার জমিদারের এইরূপ আদেশ হইতেছে যে, পরগণার গঙ্গার ধারের কোন জমি বিলি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবেক না এবং বর্তমান সমস্ত বাসস্থান ও বন্দোবোস্ত দেওয়া গঙ্গার ধারের জমি কোম্পানিকে বিক্রী করিতে সকলে বাধ্য থাকিবেক। এইখানে সমস্ত জমিতে চটকল বসিবেক, কোম্পানীর এইরূপ আদেশ আছেন।'

একটা হৈ চৈ হাহাকার পড়ে গেল। তাহলে এতদিনের গ্রাম জনপদ ভিটা মাটি সব ছেড়ে চলে যেতে হবে? নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এইসব প্রাচীন ইমারৎ, আগুরিপাড়া, দুলেপাড়া, বাগ্‌দীপাড়া, সমস্ত জগদ্দল? কেন কেন কেন?

মানুষগুলো যেন আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছেদ হয়ে গেছে এমনি এক অসহায় শঙ্কিত চোখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল।

লখাই বাড়ী এসে দাওয়ার বাঁশটা ধরে দাঁড়াল। হাতে শক্তি নেই, পায়ে শক্তি নেই, শক্তি নেই মাড়িতে। রক্ত যেন সব জল হয়ে গেছে।... জগৎ যেন অন্ধকার।

সারদা এসে তার হাত ধরে বলল, 'অমন পাগলের মত তাকিয়ে আছ কেন? কি হয়েছে?'

এক নিচিত্র অর্থহীন দৃষ্টিতে সে প্রৌঢ়া সারদার দিকে তাকাল। না, সে যৌবন নেই, সে দিন নেই, সে রং নেই। সব ভেঙ্গে যাচ্ছে, তাই মাটি কাঁপছে। তার কানে এসে বাজছে সেই ঘোড়ার পদধ্বনি, চাকার ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ। তার চোখের উপর ভেসে উঠল গ্রামছাড়া,

বহুদিনের ভিটাছাড়া দীর্ঘ এক বাস্তুহারা দল চলেছে ভিটার সন্ধানে। চীৎকার করছে, কাঁদছে, কলরব করছে।

আর সেই হাজার বছরের গড়ে তোলা ও পরিত্যক্ত জনপদ ভেঙে উঠছে মস্ত বড় বড় ইমারৎ। দীর্ঘ পাড় জুড়ে তার প্রাচীরে দুর্গের মত ব্যাপ্তি। তার মধ্যে যন্ত্রের গর্জন গুম্ গুম্ করে ধরিত্রীর অঙ্গ পীড়ন করছে। বিশাল কালো চিমনি দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে সগর্বে, সন্ধানী সতর্ক প্রহরীর মত। ফোট গেলাসটারের চিমনির মত গর্জন করে উঠছে গোঁ গোঁ করে। লোহা পাথর পাট ধূলো রেল ··· এক দানবীয় শব্দে হা হা করে ছুটে এসে গ্রাস করছে সেনপাড়া। জগদ্দল পাথরের মত দুলে বাগদী ডোমপাড়া পদদলিত করে এক বিচিত্র বিশাল যন্ত্র দাঁড়াচ্ছে মাথা তুলে। তারপর, আরও আরও ··· সমস্ত জগৎটাই যেন ছেয়ে ফেলছে কেবলি চটকল··· চটকল ··· চটকল। আর সব ছাপিয়ে সেই ইমারতের আকাশের উপরে চটকল দেবতার চাবুকের শিষ হিস্ হিস্ করে উঠছে ক্ষিপ্ত বিষাক্ত গোখরোর মত।

কেবল তার পায়ের কাছে হীরালাল তার সেই কাঠের হাতুড়িটা দিয়ে বহু কষ্টে সংগ্রহ-করা একটা পেরেক পুঁতছে মাটিতে আর লখাইয়ের পা'টা ঠেলতে ঠেলতে বলছে—'সল, সল ··· ছিলিন্দারতা খালা ক'লে দিই!'